ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪১০:১১

বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনে জঙ্গমতা : রামমোহন-রোকেয়া মেরুরেখা
বাংলায় জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাজনীতি ও ব্যারিস্টার আবদুর রসুল
ওয়াহাবি-ব্রিটিশ সম্পর্ক (১৯০৫-১৯২৫) : রাজশাহী জেলা
রাজশাহীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : নাটোরকেন্দ্রিক কর্মীব্যক্তিত্বের ভূমিকা
শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের বাংলা অনুবাদ : তুলনামূলক আলোচনা
আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' : দেশ-কাল
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা
মুরশিদি গানে গুরুবাদী দর্শন
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যাত্রাগানের প্রভাব
হিজড়া ও সন্তান জন্মদানে অক্ষম ব্যক্তির উত্তরাধিকার
সামাজিক পুঁজি হিসেবে জ্ঞাতিসম্পর্কের ব্যবহার : মুণ্ডা সম্প্রদায়ের উদাহরণ
সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় রাজশাহীর সাঁওতাল সম্প্রদায়
পাটিপাতা : একটি অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা
বার্ধক্য ও নিঃসঙ্গতা : নাটোর জেলার একটি থানার উদাহরণ
খুলনা নগরায়ণের বিকাশে ভূমি সমস্যার প্রকৃতি
বাংলাদেশে নগরায়ণ : সাম্প্রতিক প্রবণতা ও গতিপ্রকৃতি
'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বাংলার সমাজ-চেতনা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
একাদশ সংখ্যা ১৪১০

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
এম. জয়নুল আবেদীন

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
জাকির হোসেন

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০
প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৪১১ ॥ জুলাই ২০০৪

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক
জাইদুর রহমান
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
ফোন : (০৭২১) ৭৫০৭৫৩, ৭৫০৯৮৫ ॥ ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
E-mail : ibsru@yahoo.com

কভার ডিজাইন
ড. আবু তাহের বাবু

সম্পাদনা সহকারী
এস. এম. গোলাম নবী
সহকারী রেজিস্ট্রার, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
গ্রেটার রোড, রাজশাহী।

মূল্য
টাকা ৫০.০০

সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাহী সম্পাদক

এম. জয়নূল আবেদীন
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জাকির হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

সামাদ আবেদীন
প্রফেসর, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রীতি কুমার মিত্র
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবু দাউদ হাসান
প্রফেসর, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আনওয়ারুল হাসান সুফি
প্রফেসর, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আফরাউজ জামান খান চৌধুরী
প্রফেসর, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মু. আবু বকর সিদ্দিক ভূঁইয়া
প্রফেসর, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবু তাহের
প্রফেসর, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. মোস্তাফা কামাল
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

যোগাযোগের ঠিকানা

নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব কুড়ি হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার-ডিস্কেটসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলা "বিজয়" সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে" ফন্টে কম্পোজ করলে ভালো হয়। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা থাকতে হবে।

সূচিপত্র

প্রীতি কুমার মিত্র ॥	বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনে জঙ্গমতা : রামমোহন-রোকেয়া মেরুরেখা	৭
মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী ॥	বাংলায় জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাজনীতি ও ব্যারিস্টার আবদুর রসুল	২৩
কাজী সুফিউর রহমান ॥	ওয়াহাবি-ব্রিটিশ সম্পর্ক (১৯০৫-১৯২৫) : রাজশাহী জেলা	৩৫
এম. মকসুদুর রহমান ॥	রাজশাহীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : নাটোরকেন্দ্রিক কর্মীব্যক্তিত্বের ভূমিকা	৪৭
মো. আবু জাফর ॥	শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের বাংলা অনুবাদ : তুলনামূলক আলোচনা	৬৫
মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ ॥	আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' : দেশ-কাল	৭৭
সুজিত সরকার ॥	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা	৯১
প্রণবানন্দ সাহা ॥	মুরশিদি গানে গুরুবাদী দর্শন	১০৯
তপন বাগচী ॥	বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যাত্রাগানের প্রভাব	১২৭
খবির উদ্দীন অহম্মদ ॥	হিজড়া ও সন্তান জন্মদানে অক্ষম ব্যক্তির উত্তরাধিকার	১৩৫
মোঃ জাহাঙ্গীর কবির ॥	সামাজিক পুঁজি হিসেবে জ্ঞাতিসম্পর্কের ব্যবহার: মুণ্ডা সম্প্রদায়ের উদাহরণ	১৪৭
শাহানা কায়েস ॥	সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় রাজশাহীর সাঁওতাল সম্প্রদায়	১৬৭
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ॥	পাটিপাতা : একটি অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা	১৮১
শর্ম্মিষ্ঠা রায় ॥	বার্ধক্য ও নিঃসঙ্গতা : নাটোর জেলার একটি থানার উদাহরণ	১৯৩
শেখ মোঃ মুরছালীন মামুন ॥	খুলনা নগরায়ণের বিকাশে ভূমি সমস্যার প্রকৃতি	২০৩
ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু ॥	বাংলাদেশে নগরায়ণ : সাম্প্রতিক প্রবণতা ও গতিপ্রকৃতি	২১৭
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ॥	'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বাংলার সমাজ-চেতনা	২২৯

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনে জঙ্গমতা : রামমোহন-রোকেয়া মেরুরেখা

প্রীতি কুমার মিত্র*

Abstract :The aim of this paper is to demonstrate the straight line of historic connection between Rammohan Roy and Rokeya S. Hossain, century-apart leaders of women's emancipation in Bengal. The 'Woman Question' was effectively addressed by stalwarts of the 'Bengal Renaissance', but the all-male leadership would be hesitant at crucial issues. Despite the leaders' failings and other roadblocks, the movement for liberating women from age-old disabilities acquired a momentum of its own, took advantage of Hindu pluralism, and constantly fed on what is called here 'demonstration effect.' This last element is a historic phenomenon that directly links the age of Rammohan with that of Rokeya and also testifies to the impact of Bengal Renaissance on later history of the region.

১. সূচনা

১.১. উপক্রম

কোনো স্তিমিতবীর্য জাতির জীবনে রেনেসাঁসের ছোঁয়া লাগলে তার সর্বাঙ্গে এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য ও সৃষ্টিসুখের উল্লাস তরঙ্গায়িত হয় । ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে উনিশ শতকে বাংলায় প্রতীচ্য-সংস্পর্শজাত যে মানসিক পুনর্জাগরণ সমাজের অন্তত একটি অংশকে সৃজনশীল করে তুলেছিল, তার সীমাবদ্ধতা যা-ই থাক, তার সত্তা ও ফলবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ অসম্ভব। এই বহুপ্রসূ রেনেসাঁসের বিপুল সৃষ্টির অনেকাংশের মহার্ঘতা প্রশ্নাতীত না হলেও তার অন্তত একটি দিকের অভিনবত্ব ও গরিমা স্বতঃপ্রতীয়মান। সেটি হচ্ছে নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতির দিক। রামমোহন রায়, (১৭৭৪-১৮৩৩) থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) পর্যন্ত এই মুক্তি সংগ্রামের বিবর্তন ক্রমব্যাপক ও কেন্দ্রাতিগ হয়েছিল।

স্ত্রীস্বাধীনতার লীলাভূমি ব্রহ্মদেশ (বর্মা বা বর্তমান মিয়ানমার)-এর পাশেই বাংলাদেশে উনিশ শতকের শুরুতে নারীর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দু দর্শনে নারী দেবী, কিন্তু তখনকার হিন্দু সমাজে সে ছিল দাসী। নানা অভ্রংলিহ দার্শনিক তত্ত্ব বাস্তবায়নের আত্যন্তিক চেষ্টায় নারীকে করা হয়েছিল সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য, চিরবৈধব্য, উত্তরাধিকারচ্যুতি, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি অবিচারের শিকার। বৌদ্ধ ও ইসলামি চ্যালেঞ্জ-তাড়িত শতাব্দীসমূহের ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণতাশ্রয়ী সামাজিক বেড়াজাল রচনার ফলস্বরূপ মনুশাসিত হিন্দু সমাজে নারী হলো হৃতসর্বস্ব। মুসলিম সমাজে

---

*ড. প্রীতি কুমার মিত্র, প্রফেসর, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নারীর অবস্থা কথঞ্চিৎ মানবিক ছিল মাত্র। বাল্যবিবাহ সেখানে ছিল। বহুবিবাহ ছিল ব্যাপকতর, অবরোধ প্রথা কঠোরতর। কৌলীন্য প্রথা না থাকলেও বংশ-গরিমার দৌরাত্ম্য সেখানেও একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। আর 'আশরাফ' বা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উত্তরাধিকারে মেয়ে-পুরুষ বৈষম্য ছিল। নারীশিক্ষা ছিল না বললেই চলে।

১.২. পটভূমি

উনিশ শতকের আগে এদেশে নারীমুক্তির প্রচেষ্টা অতি নগণ্য। বস্তুত ব্যাপারটি উপমহাদেশীয় ইতিহাসেও একটি প্রান্তিক বিষয়ের বেশি কিছু নয়। ওই নগণ্য প্রচেষ্টাও সরাসরি সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথে না গিয়ে পরোক্ষ গতি অবলম্বন করায় কিম্ভূতকিমাকার চেহারা প্রাপ্ত হয়, তথা ব্যর্থ হয়। *দায়ভাগ* প্রণেতা জীমূতবাহন (১২শ শতক) অপুত্রক অবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর তার বিধবা স্ত্রীর নিঃসপত্ন অধিকার স্বীকার করে[১] মিতাক্ষরা-শাসিত ভারতবর্ষের অন্যান্য আইন-প্রণেতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তান্ত্রিক ও সহজিয়া সাধনপথে নারীর উচ্চ আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিয়ে তাকে সামাজিক নিগড়মুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। বৌদ্ধ-বৈষ্ণব-সহজিয়া সাধনের পথ বেয়ে এ ধারাটি আঠারো-উনিশ শতকের বাউল-কর্তাভজা-কিশোরীভজা পর্যন্ত সংসর্পিত হয়ে এসেছে। তবে এটি রহস্যাবৃত সাধনমার্গ বিশেষ হওয়ায়, এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত কোনো আন্দোলন সৃষ্টি না করায়, সর্বদাই কৃশতনু ও অন্তরালচারী থেকে গেছে। ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা, উন্মার্গগামিতা ও সমাজবিরোধিতার সহেতুক অভিযোগ উঠেছে ওই ধারার বিরুদ্ধে।

উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের চাঞ্চল্যকর ও বিসম্বাদসঙ্কুল সমাজসংস্কার আন্দোলন প্রধানত নারীমুক্তির প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। এই মানবিক প্রসঙ্গটি শতাব্দীর সমগ্র দৈর্ঘ্যেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিবর্তমান ছিল। রামমোহন, বীটন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তি, খ্রিস্টীয় মিশনারি, ইয়ং বেঙ্গল, ব্রাহ্মসমাজ প্রমুখ গোষ্ঠী এবং ব্রিটিশ সরকার, ধর্মসভা প্রমুখ সংস্থা নারীমুক্তি আন্দোলনে বিবিধ ভূমিকা গ্রহণ করে আন্দোলনটিকে অনুপম বৈচিত্র্য দান করেছিল। মানববাদ ও হিন্দুবাদ, খ্রিস্টবাদ আর জাতীয়তাবাদের টানাপোড়েনে উনিশ শতকীয় বাঙালি হিন্দু নারীর জীবনে যে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের পালাবদল চলেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব-নিকাশ বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২. ভূমিকা : বিচিত্রধা

২.১. রামমোহন রায়

রামমোহন থেকেই আমাদের কথা শুরু হতে পারে। নারী জাতি সম্বন্ধে রামমোহনের উচ্চ ধারণা, তাদের দুর্দশা সম্পর্কে তাঁর করুণার্দ্র সহানুভূতি এবং নারীমুক্তি প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের মূলে সম্ভবত তিনটি প্রেরণা-উৎস ছিল—তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব[২], পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রভাব, এবং ব্যক্তিগত

---

[১] আর.সি. মজুমদার, *হিস্ট্রি অফ অ্যান্শিএন্ট বেঙ্গল* [প্রাচীন বাংলার ইতিহাস] (কলকাতা :জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, ১৯৭১), পৃ. ৪৫৬।

[২] তান্ত্রিক সাধক হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত [১৭৬২-১৮৩২]-এর সাথে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবের কথা সুবিদিত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রামমোহন রায়* পরিব, ৪র্থ সং, *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা* ১৬ (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৩/১৯৪৬), পৃ. ১৩; রামমোহন রায়, *রামমোহন-রচনাবলী*, অজিতকুমার ঘোষ ও অন্যান্য সম্পাদিত (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩), পৃ. ৫৮৫-৮৬ [অতঃপর *রচনাবলী* রূপে উল্লিখিত)]।

অভিজ্ঞতা[৩]। শেষোক্ত দুটির সমন্বয়ফল মানবতাবাদ। আর 'লোকশ্রেয়'-বিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র হলেও তাতে মানুষের তথা নারীর স্থান অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের তুলনায় উচ্চে। *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯) শীর্ষক পুস্তিকার শেষ ছয় অনুচ্ছেদে নারীর প্রতি রামমোহনের মানবিক করুণার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে।[৪] মানবতাবাদ তথা নারীর প্রতি করুণাবোধ[৫] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও (১৮২০-৯১) অনুপ্রেরিত করেছিল। ইয়ং বেঙ্গলের প্রেরণাও মানবতাবাদ থেকেই উৎসারিত।

রামমোহন-রচনাবলীর নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা নারী সম্পর্কিত বক্তব্যসমূহ পড়লে দেখা যায় উনিশ শতকীয় নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রায় সব কথাই তাঁর চিন্তাপথে এসেছিল। যে-সব প্রথার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী চালনা করেছিলেন সেগুলি হচ্ছে: সতীদাহ,[৬] (রাজপুত জাতির অংশবিশেষের মধ্যে প্রচলিত) কন্যাবধ, কৌলীন্য, বহুবিবাহ,[৭] বাল্যবিবাহ,[৮] কন্যাপণ,[৯] পতিতা-রক্ষিতাবৃত্তি[১০], পুরুষের ব্যভিচার, গৃহবধূর দুর্দশা, একান্নবর্তী পরিবার[১১] (যা নারীর জীবনে বহু দুঃখের নিদান) এবং জাতিভেদ[১২] (যার ফলে মেয়েদের বিয়ের সম্ভাবনা ও উৎকর্ষ হ্রস্ব হতে বাধ্য)। আর নারীর যে-সব অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে তিনি লিখেছেন তা হচ্ছে সামাজিক[১৩] ও অর্থনৈতিক[১৪] অধিকার, শিক্ষা ও

---

[৩] নিতান্ত বাল্যবয়সে রামমোহন পিতা কর্তৃক তিনবার বিবাহিত হয়েছিলেন বলে জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*, দে'জ পুনর্মুদ্রণ, ২য় সং, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৩৮১/১৯৭৪-৭৫), পৃ. ১২। নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ অলকমণি দেবীর সহমরণে ব্যথিত হয়ে রামমোহন সতীদাহ নিবারণে বিশেষভাবে আগ্রহী হন। *তদেব*, পৃ. ১৭৮।

[৪] রায়, *রচনাবলী*, পৃ. ২০১-০৩।

[৫] এ ক্ষেত্রেও বাল্যসহচরীর বৈধব্যজনিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজ করেছিল। সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ* (কলিকাতা, ১৩৬৬/১৯৫৯-৬০), পৃ. ১৩৭।

[৬] রামমোহন এ বিষয়ে তিনটি পুস্তিকা লেখেন : (১) *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* (১৮১৮); (২) *ঐ দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯); (৩) *সহমরণ বিষয়* (১৮২৯)।

[৭] রায়, *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ*, *রচনাবলী*, পৃ. ১৯৮-০২। চট্টোপাধ্যায়, *জীবন চরিত*, পৃ. ৩৪৯, ৩৫২।

[৮] চট্টোপাধ্যায়, *জীবন চরিত*, পৃ. ৩৫২।

[৯] রায়, "ব্রীফ রিমার্কস রিগার্ডিং মডার্ন এনক্রোচমেন্টস অন দ্য অ্যানশিএন্ট রাইট্স অফ ফিমেল্স" [নারীর প্রাচীন অধিকারসমূহের উপর আধুনিক কালের অবৈধ হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য], *রচনাবলী*, পৃ. ৪৯৯-৫০০।

[১০] চট্টোপাধ্যায়, *জীবনচরিত*, পৃ. ৩৪৯।

[১১] রায়, *দ্বিতীয় সম্বাদ*, রচনাবলী, পৃ. ২০২-০৩।

[১২] রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়াচার্য কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত জাতিভেদ-বিরোধী মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ *বজ্রসূচীর* প্রথম 'নির্ণয়' বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করেন (১৮২৭)। এতে জন্মগত ব্রাহ্মণত্বকে নস্যাৎ করা হয়েছে। *রচনাবলী*, পৃ. ৩৩৫-৩৭, ৪২৪-২৫। জন ডিগ্‌বির কাছে লেখা রামমোহনের চিঠিতে জাতিভেদ প্রথার কঠোর সমালোচনা আছে। *রচনাবলী*, পৃ. ৪৬২। *ব্রাহ্মণ সেবধি* পাত্রকাতেও রামমোহন জাতিভেদকে "সর্ব্বপ্রকার অনৈতিকতার মূল" বলে নিন্দা করেছেন। *রচনাবলী*, পৃ. ২৩৩।

[১৩] রায়, *দ্বিতীয় সম্বাদ*, *রচনাবলী*, পৃ. ২০২।

[১৪] রায়, "অ্যানশিএন্ট রাইট্স অফ ফিমেল্স", রচনাবলী, পৃ. ৪৯৩-৫০১।

উচ্চ শিক্ষার অধিকার[১৫], সম্পত্তিতে অধিকার ও উত্তরাধিকার[১৬] এবং বিয়ের ব্যাপারে সামাজিক কড়াকড়ি হ্রাস তথা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার[১৭]।

২.২. দ্বৈত দ্বন্দ্ব

এসব সমস্যা নিয়েই নারীমুক্তির সংগ্রাম। শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে সমস্যাগুলির স্বাভাবিক সমাধান, এবং সরকারি হস্তক্ষেপের সাহায্যে আইনবলে সমাজের দুর্নীতি অপসারণ ও সুনীতি সঞ্চারণ—এই দু রকম পন্থাই অনুসৃত হয়েছিল। প্রথম পদ্ধতিটি বিবর্তনমূলক ও সময়সাপেক্ষ এবং তা একক ব্যক্তিত্বের সাধ্যায়ত্ত নয়, বহুর সাধনার বিষয়। দ্বিতীয় পন্থাটি বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে অনধিকার চর্চা, তথা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী; জনকল্যাণকামী জাতীয় সরকারই কেবল এ ধরনের হস্তক্ষেপের অধিকারী। সুতরাং পদ্ধতি সংক্রান্ত বিতর্ক গোটা শতাব্দী জুড়েই চলেছিল। ফলে আন্দোলনটির মধ্যে দুই প্রস্থ দ্বন্দ্ব সক্রিয় ছিল–পরিবর্তন-বিরোধী বনাম পরিবর্তনপন্থী, এবং পরিবর্তনপন্থীর ভেতর আবার বিবর্তনপন্থী বনাম প্রবর্তনপন্থী। প্রথম প্রস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিবর্তনপন্থীরা জয়লাভ করে; আর দ্বিতীয় জুটিতে বিবর্তনবাদীদেরই শেষ পর্যন্ত জয় হয়।

২.৩. সরকারি তৎপরতা

এ দেশে ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক চরিত্রের জন্য তার পক্ষে দেশের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে কোনো প্রকার সমাজসংস্কার সম্ভবপর বা সমীচীন ছিল না। নারী বিষয়ক চারটি প্রধান আইনের মধ্যে কোম্পানির আমলে (১৭৭২-১৮৫৮) তিন দশকের ব্যবধানে প্রণীত আইন দুটি অধিকতর উত্তেজনা সৃষ্টি করে পরবর্তী সাম্রাজ্যিক সরকারকে সাবধান করে দিয়েছিল। ফলে ধর্ম-সম্পর্কিত সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তনে ওই সরকার আর বিশেষ কোনো চেষ্টা করতে যায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৬০ -এর দশকে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ নিবারণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় তাতে ঔপনিবেশিক সরকার দায়সারা গোছের ভূমিকা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো নিবর্তনমূলক আইন পাশ করা থেকে বিরত থাকে।

যা হোক, আইন চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমটি ও শেষটি, অর্থাৎ সতীদাহ নিবারণ আইন (১৮২৯) এবং সহবাস সম্মতি আইন (১৮৯১), নিবর্তনমূলক ছিল, বাকি দুটি ছিল প্রবর্তনমূলক। সতীদাহ সুপ্রাচীন প্রথা হলেও উনিশ শতকের শুরুতে তা উচ্চ ও মধ্য বর্ণের অংশবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ এ প্রথার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না। নিম্ন বর্ণের সকলের ও উচ্চ বর্ণের একাংশের সমর্থন না থাকায় উচ্চ বর্ণের গোঁড়া অংশের প্রতি-আন্দোলন (counter-agitation) জোরদার হতে পারেনি এবং সরকারি আইন সাথে সাথেই কার্যকর হয়েছিল। এ দেশে ঔপনিবেশিক হলেও স্বদেশে গণতন্ত্রে অভ্যস্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বহু ভাবনা-চিন্তার পর শেষ পর্যন্ত সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ করে। এ থেকেই অনুমিত হয় যে, ভারতীয় জনমতের সম্ভাব্য অপ্রতিকূলতার বিষয়টি তারা অভ্রান্তভাবেই আঁচ করতে পেরেছিল।

---

[১৫] রায়, *দ্বিতীয় সম্বাদ*, *রচনাবলী*, পৃ. ২০২।

[১৬] রায়, "অ্যানশিএন্ট রাইট্স অফ ফিমেল্স", *রচনাবলী*, পৃ. ৪৯৩-৫০১।

[১৭] রামমোহন অসামাজিক ও অসবর্ণ 'শৈব বিবাহ' অনুমোদন করেছেন তাঁর *চারি প্রশ্নের উত্তর* পুস্তিকায়। *রচনাবলী*, পৃ. ২৫৮-৫৯।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের বিধবাবিবাহ আইন অনুমোদনমূলক হওয়ায় এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধতে পারেনি। এই আইনে বিধবার পুনর্বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল না, বরং বিবাহেচ্ছু বিধবা পাত্র সংগ্রহ করতে পারলে সরকারের দিক থেকে তাদের বিয়ে আইনসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়ার ব্যবস্থাই মাত্র হয়েছিল। সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে হৃত-স্বাতন্ত্র্য এবং সংস্কারাবদ্ধ বর্ণহিন্দু বিধবাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যে বাস্তবে পুনর্বিবাহের সুযোগ পাবে এমন সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি ছিল।

এরপর ১৮৭২ সালের 'নেটিব ম্যারেজ অ্যাক্ট' প্রকৃতপক্ষে 'আমি হিন্দু নই, খ্রিস্টান নই, মুসলমান নই' এই ঘোষণার বিধানেই বাস্তবে নিরর্থক হয়ে পড়েছিল। কারণ ওরকম ঘোষণা দেওয়ার মতো লোক এতোই মুষ্টিমেয় ছিল যে, দেশের জনসংখ্যার সাথে তাদের অনুপাতের কথা স্মরণ করলে এই আইন পাশের পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর বলে মনে হয়। ১৮৯১-এর 'সহবাস সম্মতি বিল' বিপুলভাবে সমালোচিত হয়েছিল এবং হিন্দু পুনরুত্থানের জ্বলমান আগুনে অতিরিক্ত ইন্ধন যুগিয়েছিল, অথচ এ আইন বৈপ্লবিক কিছু তো ছিলই না, বরং ফলত অকিঞ্চিৎকরই ছিল।

এই হলো ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের তরফ থেকে সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার খতিয়ান। সতীদাহ, চিরবৈধব্য, বাল্যবিবাহ ও অশিক্ষা ব্যতীত নারী সমাজের বাকি অসুবিধাগুলির ব্যাপারে উনিশ শতকে বিশেষ কোনো সরকারি প্রচেষ্টা হয়নি। নারীমুক্তির ক্ষেত্রে সরকারি শক্তির কার্যকর সহায়তার সম্ভাব্যতা অতএব কতো পরাহত ছিল তা বোঝা গেল।

২.৪. অসংগতি: গোঁড়া হিন্দুদের প্রতিক্রিয়ায়

নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতির ব্যাপারে হিন্দুইজমের তরফ থেকে কী ধরনের তৎপরতা ছিল তা অতঃপর পর্যালোচনা করা যাক। এ ব্যাপারে জাতীয়তাবোধের এবং রেনেসাঁস ব্যক্তিত্বে স্ববিরোধিতার ও ইতস্তত ভাবের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির সাধারণ নিয়মে প্রথম থেকেই রক্ষণশীল হিন্দুদের নারীমুক্তির বিরোধিতা করতে দেখা যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) প্রমুখ 'ধর্মসভা'র পুরোধাগণ সতীদাহের সপক্ষে এবং পরে সহমরণ নিষেধক আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুলেছিলেন।

কিন্তু এও ঐতিহাসিক সত্য যে, মানবতার প্রেরণায় সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও রামমোহন মূলত জাতীয় সংস্কৃতির পোষকতা করতেন এবং সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্যগুলিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করে জনসাধারণ্যে পরিবেশন করেছিলেন। মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরের পদ্ধতিও অনুরূপ ছিল।[১৮] হিন্দু শাস্ত্র মন্থন করে নিজের মতকে শাস্ত্রসম্মত বলে প্রতীয়মান করায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা দেখা গিয়েছিল। হিন্দুধর্মে অচলা ভক্তি সত্ত্বেও বৃহত্তর জনতার সতীদাহে অমনোযোগ ও অসহানুভূতির কথা আগেই বলা হয়েছে। তদুপরি রয়েছে রামমোহনেরও আগে রক্ষণশীল ভট্টাচার্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)-এর সতীদাহ-বিরোধী প্রতিবেদন (১৮১৭)[১৯]। বিধবাবিবাহের আইন পাশের ব্যাপারে সাধারণ শ্রেণীর মানুষের আপত্তির

---

[১৮] এদেশের মানুষের শাস্ত্রানুগত্য যুক্তিবাদিতার চেয়ে প্রবল ছিল বলে বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্ত্র থেকে বিধবা বিবাহের সমর্থন সন্ধান করেছিলেন। বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ১ম ওরিয়েন্ট লংম্যান সং. (৩ খ. একত্রে) (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩), পৃ. ২৪৬।

[১৯] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার*, ২য় সং, ৪র্থ মু., *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা*-৩ (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫২/১৯৪৬), পৃ. ৮-৯, ২৮-৩৫।

বাস্তব কারণ বিশেষ ছিল না—বরং তাদের সহর্ষ সমর্থন অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছিল।[২০] কিছু সংখ্যক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বহু গণ্যমান্য বর্ণহিন্দুও বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছিলেন। এর অনেক আগে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের অনুরোধে কতিপয় স্মার্ত পণ্ডিত বিধবা বিবাহের সপক্ষে রায় দিতে নীতিগত ভাবে রাজি হয়েও সমাজের ভয়ে পারেননি।[২১] বস্তুত সহমরণ নিবারণ ও বিধবা বিবাহের ব্যাপারে হিন্দু ধর্মের পক্ষ থেকে বিরোধিতা (শাস্ত্রীয় ও বাস্তব) আপাতদৃষ্টিতে তীব্র হলেও সর্বত্র সংগতিপূর্ণ ও নির্দ্বৈধ ছিল না।

স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্নে সমাজে তুমুল আলোড়ন উঠেছিল এবং এখানেও হিন্দু ধর্ম ও রক্ষণশীলতার পক্ষ থেকে যে বিরোধিতা এসেছিল তা নিতান্তই নিরুদ্যম ও সকুণ্ঠ। বস্তুত ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গোঁড়া হিন্দুদেরও বিদ্বেষ ছিল না, বরং আগ্রহই ছিল। তবে দুটি জিনিস তাঁরা চাইতেন না—এক, পাশ্চাত্য ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাথে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও আচার-আচরণের অনুপ্রবেশ; ও দুই, নারী জাতির জন্য পাশ্চাত্য প্রাচ্য কোনো প্রকার শিক্ষা। তবে এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকেরা হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদন প্রদর্শন করে স্ত্রীশিক্ষাকে জনগণগ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের *স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক*-এ স্ত্রীশিক্ষার শাস্ত্রীয়তা প্রদর্শন করা হয়েছিল। ড্রিংক্ওআটার বীটন (১৮০১-৫১) প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ির গায়ে বিদ্যাসাগর "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" [কন্যাকেও পুত্রের মতোই অত্যন্ত যত্নসহকারে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে]—*মহানির্বাণতন্ত্র* গ্রন্থের এই শ্লোকাংশ[২২] লিখিয়ে দিয়েছিলেন।

গৌরমোহনের উক্ত বইয়ের জন্য কিছু উপাত্ত সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন গোঁড়া দলের প্রধান ও সতীদাহ সমর্থক রাধাকান্ত দেব,[২৩] যিনি পরবর্তীকালে বীটন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মানবহিতৈষী, রামগোপাল-দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গল, এবং দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার প্রমুখ *তত্ত্ববোধিনী* ব্রাহ্মদের সাথে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন এবং নিজের বাড়িতেও মেয়ে স্কুল বসিয়েছিলেন।[২৪] বস্তুত গোঁড়া হিন্দুদের অনেকেই মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমর্থন করতেন। তবে হিন্দু ধর্ম ও বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষতির আশঙ্কায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [১৮১২-৫৯] স্ত্রীশিক্ষা পছন্দ করেননি, ব্যঙ্গ করে গান লিখেছিলেন।[২৫] যদিও গোঁড়া হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান 'ধর্মসভা' সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে ছিল, তবে বাস্তবে কোনো বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এমন জানা যায় না।

---

[২০] বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর* (কলকাতা: সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি, ১৮৯৫), পৃ. ২৫৬-৫৭।

[২১] কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, *ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত* (কলকাতা: নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১৯৩২ সংবৎ/১৮৭৪), পৃ. ২০৩।

[২২] *মহানির্বাণতন্ত্র* ৮.৪৭ (প্রথমার্ধ)

[২৩] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খ., ৩য় সং., ৪র্থ মু. (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৭৭/১৯৭১), পৃ. ৩৬২।

[২৪] *তদেব*, ৩৯৬।

[২৫] "যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে" ইত্যাদি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ*, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৩৭৬/১৯৬৯), পৃ. ১৭৭।

২.৫. ভূত! সরষের ভেতরেই ?

এর পরের পর্যায়ে দেখা যায় রেনেসাঁস ব্যক্তিত্বে দ্বিধা-সংকোচ, স্ববিরোধিতা ও পিছু হটবার প্রবণতা এবং তার ফলে নারীপ্রগতির বিশেষ ক্ষতি। এগুলিরও মূলে হিন্দু সংস্কার। স্ত্রীশিক্ষা সমর্থক গোঁড়া হিন্দুরা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রগতিপন্থীরাও অনেকে নারী জাতির উচ্চ শিক্ষা সমর্থন করেননি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) প্রমুখ আদি ব্রাহ্ম সমাজের যে নেতারা প্রথম দিকে স্ত্রীশিক্ষা (নিম্নশিক্ষা) সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাই আবার পরবর্তী পর্যায়ে মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ার মতো বা প্রতিভা বিকাশের উপযোগী উচ্চ শিক্ষা সমর্থন করতে পরাঙ্মুখ হলেন। ওই সমাজের মুখপত্র এবং দেবেন্দ্রনাথের নিজের সাময়িকী *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* ১৮৮০ সালে লেখা হলো :

> স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবতঃ হৃদয়-প্রধান এবং পুরুষ-প্রকৃতি প্রধানতঃ বুদ্ধি-প্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ., এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধি-প্রধান শিক্ষা, হৃদয়-প্রধান শিক্ষা নহে, অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।[১৬]

নারীজীবনের সুষ্ঠু বিকাশ ও নারীপ্রগতির একটি প্রবল অন্তরায় জাতিভেদ প্রথা। অথচ উনিশ শতকীয় সংস্কারবাদীদের কেউ এর বিরুদ্ধে বড় রকমের কোনো আন্দোলন তোলেননি। *বজ্রসূচী* পুস্তিকায় রামমোহন জাতিভেদ, বিশেষত ব্রাহ্মণত্বকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শতাব্দীর ষাটের দশকে ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যন্তরে যে-সব কারণে ভাঙন ধরেছিল তার একটি হচ্ছে জাতিভেদ তথা নারীমুক্তির প্রশ্ন। কেশবপন্থী তরুণেরা ১৮৬২ ও ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে দুটি অসবর্ণ বিবাহ সম্পন্ন করলে দেবেন্দ্রপন্থী প্রবীণদের সাথে তাদের মতভেদ চরমে ওঠে এবং অচিরেই সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় (১৮৬৬)।

কেশবপন্থীরা শুধু স্ত্রীশিক্ষাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, নারী জাতির সামগ্রিক মুক্তি তথা সামাজিক মর্যাদায় নারীপুরুষ সমকক্ষতাও তাঁদের *কাঙ্ক্ষিত* ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) ব্রাহ্ম আন্দোলন নারী প্রগতির লক্ষ্যে *বামাবোধিনী* পত্রিকা প্রকাশ ও 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' স্থাপন করে। অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে কেশবের সংগ্রাম ছিল অনুপম। নিজ পরিবারের মারমুখী ব্যূহ ভেদ করে পঞ্চদশী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যে দিন (১৩ই এপ্রিল ১৮৬২) তিনি দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে গেলেন সে দিনই হিন্দু সমাজে অবরোধ প্রথার মৃত্যু ঘণ্টা বাজলো। ১৮৬৫ সালে তিনি কতিপয় ব্রাহ্ম মহিলাকে নিয়ে ডক্টর রবার্টসের বাড়িতে যান। ব্রাহ্ম সমাজ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর কেশবের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ'-এর প্রার্থনা সভায় মেয়েরা পৃথগাসনে যোগ দিতে পারতেন। কেশব ১৮৭০ সালে স্ত্রীশিক্ষার জন্য 'ভিক্টোরিআ কলেজ' এবং ১৮৭২ সালে 'স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। নারীমুক্তির ব্যাপারে কেশবীয় সংগ্রামের চূড়ান্ত অগ্রবিন্দু সূচিত হয় ১৮৭২ সালে 'নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট-৩' পাশের মাধ্যমে, যার জন্য কেশব প্রবল আন্দোলন চালিয়েছিলেন। যারা আঠারো (ছেলে) ও চৌদ্দ (মেয়ে) বৎসরের কম বয়স্ক নয়, এবং না-হিন্দু, না-মুসলমান, না-খ্রিস্টান বলে নিজেদের পরিচয় দিতে ও এক বিবাহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে রাজি ছিল তাদের জন্যই এই আইন (আইনটি যে বাস্তবে কতো অকিঞ্চিৎকর ছিল তা আগেই বলা হয়েছে।)

সত্তরের দশকে এসে এই কেশবচন্দ্রেরও সীমাবদ্ধতা বেরিয়ে পড়লো। ১৮৭১ সালে সমাজের তরুণ সদস্যদের সস্ত্রীক ও সকন্যা সাধারণ প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়ার দাবি কেশব মেনে নিতে

---

[১৬] *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৫২ (চৈত্র ১৮০২ শক/মার্চ-এপ্রিল ১৮৮০) : ২২৮।

পারলেন না। তিনি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষারও বিরোধী ছিলেন, তাঁর মতে গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার কোনো প্রয়োজন মেয়েদের নেই।[২৭] ১৮৭৮ সাল নাগাদ বিখ্যাত 'কুচবিহার বিবাহ' একেবারে ভরাডুবি ঘটালো। পৌত্তলিকতা আর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী কেশবচন্দ্রের নীতিচ্যুতি সম্পূর্ণ হলো, সম্পূর্ণ হলো ব্রাহ্ম সমাজের শেষ ভাঙন। এর পর 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'-ভুক্ত আদর্শবাদী নেতারা নারীপ্রগতির জন্য অনেক কিছু করলেও তাকে আন্দোলন বলা চলে না।

২.৬. মিশনারির মিশন

এখন খ্রিস্টীয় মিশনারিদের প্রসঙ্গে আসা যাক। শিক্ষার ক্ষেত্রে এঁদের গরীয়ান অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' [যুব মহিলা সমাজ] থেকে শুরু করে শতাব্দী শেষের 'অন্তঃপুর শিক্ষা' পর্যন্ত মিশনারিদের স্ত্রীশিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা এক নিরলস সাধনার নজির। কিন্তু মিশনারিরা মিশনারি বই তো নয়। তাঁদের শিক্ষা-প্রচেষ্টা ছিল মিশনারি কর্মেরই অঙ্গবিশেষ মাত্র। সুতরাং খ্রিস্টধর্ম-ভীতি স্ত্রীশিক্ষার একটি বড়ো অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার কতিপয় মন্তব্য এ বিষয়ে আলোকপাত করে। দু-একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এ রকম ঃ "বিবি রবসন ভিন্ন আর সকল শিক্ষয়িত্রীই খৃস্টধর্ম পুস্তক পাঠ করা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং মিস ব্রিটন প্রভৃতি নিজেই বলেন, খৃস্টিয়ান করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য।" " এই দূষিত অন্তঃপুর শিক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে... কয়েকটী বিষময় ফল ফলিয়াছে... কতকগুলি কুলবধূ ও কুলকন্যাকেও গৃহ হইতে লইয়া গিয়া আপনাদের দলে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ...হিন্দু সংসারে এ প্রকার বিকৃত সংঘটন হইতে দেওয়া কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির উচিত নহে।" "এতন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের শিক্ষাদান... সম্পূর্ণ ফলোপধায়ী হইতেছে না।[২৮]

৩. সীমাবদ্ধতা

৩.১. বহুমুখী প্রতিবন্ধ

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা বিশদ হয়েছে যে, উনিশ শতকীয় নারীমুক্তি আন্দোলনে নানা গলদ ছিল। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই যে, আন্দোলনের প্রত্যেকটি পরিচালক গোষ্ঠীই সাবজেক্টিভ ভঙ্গিতে বিষয়টিকে দেখেছে। নারীমুক্তি অপেক্ষা তাদের নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়া বা কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত ছিল হওয়াই আসল লক্ষ্য। এ কারণে প্রত্যেকের চেষ্টাই ফলত অর্ধোদ্যমে পর্যবসিত হয়েছিল তথা অংশত স্ববিরোধী হয়ে পড়েছিল। সনাতন হিন্দুধর্ম নারীকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে নিমরাজি কিন্তু সামাজিক অধিকার দিতে নারাজ। সংস্কারবাদীরা নারীমুক্তি চান তবে নারীপ্রগতি নয়। সরকার প্রথম দিকে নারীমুক্তির অনুকূলে আইন পাশ করতে রাজি থাকলেও, ঔপনিবেশিক চরিত্রের জন্য সে এ কাজের পক্ষে পঙ্গু হয়েই ছিল। মিশনারিরা নারীমুক্তি বলতে বুঝতেন মেয়েদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ। শতাব্দীর শেষ পাদের আগে নারীর উচ্চ শিক্ষা সমর্থিত হয়নি, সর্বজনীন কিংবা ব্যাপক সমর্থন তো কখনোই মেলেনি।

---

[২৭] নিমাইসাধন বোস, *দ্য ইন্ডিআন অ্যাওএকেনিং অ্যান্ড বেঙ্গল* [ভারতীয় জাগৃতি ও বাংলা] (কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০), পৃ. ১০০।

[২৮] উদ্ধৃত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খ. (আধুনিক যুগ), ২য় সং. (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৩২৮-২৯।

আসলে উনিশ শতকের সকল সংস্কারবাদী আদৌ নারীমুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন কি না তা সন্দেহস্থল। নারীমুক্তির প্রকৃত সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা খুব স্বচ্ছ ছিল না। সমাজের নির্যাতিত ও শৃঙ্খলিত অংশ হিসেবে নারী জাতিকে মুক্ত করে পুরুষের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে প্রাপ্তব্য সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার দ্বারা মেয়েরাও জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে এবং নিজেদের প্রতিভার বিকাশ সাধন করে দেশ ও জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে—ঠিক এই ধারণার ভিত্তিতে উনিশ শতকীয় নারীমুক্তি আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

প্রায় সব রকম সংস্কারবাদীই যেন মনে করতেন যে, নারী তাঁদের কর্মোদ্যম প্রকাশের অচেতন ক্ষেত্র মাত্র, তাকে তাঁরা তাঁদের মনের সাধ অনুযায়ী গড়ে তুলবেন। সে নিজে গড়ে উঠবে এমন চিন্তা করতে তাঁরা যেন অপারগ বা অনিচ্ছুক ছিলেন। ফলে রক্ষণশীলদের থেকে সংস্কারবাদীদের মানসিক গঠনে বলতে গেলে কোনো মৌলিক পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য যা ছিল তা তারতম্যমূলক বা মাত্রাঘটিত, মূল তত্ত্বগত নয়। মেয়েদেরকে রেহাই দিতে কেউই রাজি ছিলেন না, সবাই চাইতেন পছন্দানুরূপ সীমা পর্যন্ত তাদেরকে বাড়তে দিতে, লাগাম নিজেদের মুষ্টিতে সংবদ্ধ রেখে। পুরুষের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে এবং মেয়েরা পুরুষদের স্বার্থানুকূল সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হবে। বন্ধন শিথিল করা হবে মাত্র, একেবারে মুক্ত করে দেওয়া হবে না কদাপি। নারীপ্রগতি পুরুষদের স্বার্থে, নারী জাতির নিজস্ব স্বার্থে নয়। আসলে ইংরেজি শিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্ত শহুরে সমাজের প্রয়োজনানুরূপ কথঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়ে মেয়েদেরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর মতো করে নেওয়াই এদের লক্ষ্য ছিল। মূলত গ্রামলগ্ন, অতএব রক্ষণশীল মানসিকতার, এই রেনেসাঁস ব্যক্তিত্ববর্গ প্রকৃত নারীপ্রগতির মতো ভারত-ঐতিহ্য-বহির্ভূত কোনো বৈপ্লবিক দীর্ঘলম্ফ দিতে প্রস্তুত ছিলেন বলে মনে হয় না।

রামমোহনের উৎসাহের মূলে ছিল অন্যান্য জাতির সাথে হিন্দু সমাজের তুলনাজনিত লজ্জাবোধ এবং নারী জাতির প্রতি অপরিসীম করুণা। বিদ্যাসাগরে মিলিত হয়েছিল করুণা ও সুরুচি অর্থাৎ সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখার ইচ্ছা। কিন্তু নারীমুক্তির আসল প্রশ্নটি এই সব ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ অপেক্ষা উচ্চতর ও ব্যাপকতর। ফলে নারীমুক্তি আন্দোলনের এই দুই মহত্তম নেতার মনোভঙ্গির স্বরূপটি ছিল প্রধানত নেতিবাচক—অর্থাৎ তাঁরা কিছু আবর্জনা দূর করতে চেয়েছিলেন মাত্র। আবর্জনা বিদূরণের পর নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতির এবং তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনানিচয়ের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রতিশ্রুতি তাঁদের মতাদর্শে সুস্পষ্ট ছিল না। নারীর অক্ষমতাগুলি দূর করেই সংস্কারবাদীরা ক্ষান্ত, এর পর তাদের ক্ষমতার সার্থক বিকাশের প্রশ্ন তাঁদের আশু বিবেচনার মধ্যে ছিল না। অপর দিকে নারীর শিক্ষা অপেক্ষা দীক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল খ্রিস্টীয় মিশনারির মুখ্য প্রেরণা। আবার অনুকরণপ্রিয়তা ও ফ্যাশন-সর্বস্বতা ইয়ং বেঙ্গলের উৎসাহকে অনেকটাই হালকা করে ফেলেছিল।

৩.২. প্রকৃত শূন্যতা

উল্লিখিত কারণনিচয় থেকেই উনিশ শতকীয় নারীপ্রগতি আন্দোলনের মুখ্য শূন্যতাটি প্রসূত। সেটি হচ্ছে আন্দোলনে এ দেশের মেয়েদের নিজস্ব অবদানের একান্ত অভাব। আন্দোলনের নেতৃত্ব আগাগোড়াই পুরুষদের হাতে থেকে গেছে। আপন প্রেরণায় পুরুষেরা সমাজসংস্কার বা স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু যাদের নিয়ে সমস্যা, খোদ তারা এসব কর্মকাণ্ডে প্রায় অনুপস্থিত। স্বজাতি উদ্ধারে মেয়েদের নিজস্ব মতামত,

উদ্যোগ বা উদ্যম প্রথম দিকে তো বিশেষ কিছুই দেখা যায়নি। আঠারো শতকের ও উনিশ শতকের প্রথম দিককার কয়েকজন বিদুষী মহিলার নাম জানা যায়, যাঁরা প্রাচীন ব্যবস্থার ভেতরে থেকেই বাড়িতে লেখাপড়া শিখেছিলেন।[২৯] কিন্তু স্বজাতির অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করার ব্যাপারে তাঁরা কোনো চিন্তা করতেন কিনা জানা যায় না। শৃঙ্খলিত, নিরক্ষর বাকি নারীসমাজ থেকে নেতৃত্ব বা প্রেরণা আসার কোনো সম্ভাবনা স্বভাবতই ছিল না। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে *সমাচারদর্পণে* প্রকাশিত 'কাচিৎ শান্তি পুরনিবাসিনী' ও 'চুচুঁড়া নিবাসি স্ত্রীগণস্য' প্রেরিত দুটি চিঠি এবং এরকম আরো অনেক চিঠি থেকে মেয়েদের আত্মসচেতনতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।[৩০] তবে এ চিঠিগুলি যে সত্যিই মহিলাদের লেখা তার নিশ্চয়তা নেই।

স্ত্রীশিক্ষার কথঞ্চিৎ অগ্রগতি হওয়ার পরে কিছু সংখ্যক মহিলা যখন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে নানা দিকে প্রতিভা বিকাশ করতে শুরু করেন, তখনও কিন্তু তাঁরা কেউ নারীপ্রগতি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি, যদিও নানাভাবে সহায়তা করেছেন নিঃসন্দেহে। সাহিত্যচর্চা, পত্রিকা সম্পাদনা, শিক্ষকতা, সভাসমিতি পরিচালনা, শিল্পচর্চা, সর্বোপরি জাতীয় জাগরণ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা গ্রহণ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দু নারীর আবির্ভাব ঘটেছে উনিশ শতক শেষ হবার আগেই। এতে নারীপ্রগতির বেগবর্ধনে সহায়তা হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রত্যক্ষভাবে পুরুষের হাতেই থেকে গেছে। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'ই এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল।

৩.৩. নারী নেতৃত্ব (?)

অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ, আভিজাত্য, খ্রিস্টধর্ম-ভীতি, পুরুষের ঔদাসীন্য ইত্যাদি নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতির সুপরিচিত প্রতিবন্ধকগুলির সাথে শিক্ষিতা নারীর আংশিক ঔদাসীন্যও যুক্ত হওয়া উচিত উপরে প্রদর্শিত যুক্তির ভিত্তিতে। শতাব্দীশেষের হিন্দু পুনরভ্যুত্থান, নব্য হিন্দুবাদ ও জাতীয়তাবাদের সাথে মেয়েদের সংশ্লিষ্টতা পুরুষদের মতো তাদের দৃষ্টিকেও সমাজ সংস্কার থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনেকটা দায়ী। তবুও বিশ শতকের প্রারম্ভে নারীমুক্তি আন্দোলনে হিন্দু সমাজ বহির্ভূত দুজন মহিলার ভাস্বর অবদান দেখে স্বতঃই মনে হয় আগের শতকে অধিকতর প্রয়োজন ও বিস্তৃততর ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও জাগ্রত নারীকুলের মধ্য থেকে এই ভূমিকার অভাব একটি মুখ্য ত্রুটি, যা নারীপ্রগতিকে মন্থরায়িত করতে সাহায্য করেছিল। ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) [মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল] ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বিশ শতকে স্বজাতি-উদ্ধার ব্রতে আত্মোৎসর্গ করলে নারীজাতির মুক্তি ও প্রগতি অভূতপূর্ব বেগ ও ব্যাপকতা লাভ করে এবং অনেক কম সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। এই সাফল্যের অন্যান্য কারণ থাকলেও আত্ম-উদ্ধারে নারীর নিজের এগিয়ে আসা যে একটি প্রকৃষ্ট কারণ তা অস্বীকার করা যায় না।

৪. জঙ্গমতার স্বরূপ

এতক্ষণের আলোচনা থেকে ধারণা জন্মানো স্বাভাবিক যে, উনিশ শতকীয় নারীপ্রগতি আন্দোলন বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতায় আগাগোড়াই অসুস্থ থেকেছে এবং আনুকূল্যের কোনো উপাদানই এর

---

[২৯] যথা, রাণী ভবানী (১৭১৪-৯৩), হটী বিদ্যালংকার (?-১৮১০), শ্যামাসুন্দরী, হরসুন্দরী, দ্রবময়ী প্রভৃতি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১:১৩-১৪, ৪১০-১৫।

[৩০] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ২য় খ., ৪র্থ সং (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৪), পৃ. ২৫৬-৫৮।

ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু বিবর্তমান আন্দোলনটির বিশ শতকীয় সমৃদ্ধি ও সুফল থেকে ধারণাটির অযাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। তাই এ ব্যাপারে একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার।

৪.১. তিনটি বিশেষ উপাদান

মন্থর গতিতে হলেও সারা উনিশ শতক ধরে নারীর মুক্তি ও প্রগতির প্রবাহটি অব্যাহত ও প্রবর্ধমান থেকেছে। এক দিকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং অপর দিকে সামাজিক অবিচার নিরসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা—এই দুই ধারায় আন্দোলনটি অগ্রসর হয়েছে। প্রথম ধারাটি ক্রমবর্ধমান থেকে ক্রমক্ষীয়মাণ দ্বিতীয় ধারাটিকে পর্যায়ক্রমে অবান্তরায়িত করে শেষ পর্যন্ত গ্রাসই করে ফেলেছে। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এই অগ্রগতির সাধারণ কারণসমূহ—পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, রামমোহন-বীটন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতীর ব্যক্তিগত অবদান, মিশনারি উৎসাহ, প্রাগ্রসর ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা প্রভৃতির সুপ্রাসঙ্গিক তালিকা প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু এর বাইরে আরো তিনটি ব্যাপার নারীমুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে কাজ করেছে বলে বর্তমান লেখকের উপলব্ধি।

৪.১.১. হিন্দু ধর্মের বহুত্বময়তা

তার *একটি* হচ্ছে হিন্দু ধর্মের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য ও সর্বাধারত্ব, যার ফলে বেদেতর শাস্ত্রসমূহের সুবিশাল অঙ্গে জমে উঠেছে অসমঞ্জস বহুরূপতা। স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাস-তন্ত্রের পৌরুষেয়তা, দেশকালের ব্যাপকতা ও বিস্ময়কর অসামঞ্জস্য আপাতকঠোর হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু মনোভঙ্গিকে এক ধরনের নমনীয়তা দান করেছিল, যা অজ্ঞতা ও দেশাচারের দরুন প্রচ্ছন্ন থাকলেও শিক্ষা, প্রচার, ও প্রচেষ্টা দ্বারা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব ছিল না। তৎকালীন হিন্দুত্বের কঠোরতম সমালোচক রামমোহন রায় বিষয়টি অঙ্গীকার করেছেন।[৩১]

কোনো প্রতিষ্ঠাতা-প্রফেট প্রদত্ত ধর্মের মতো অপৌরুষেয় গ্রন্থৈকবদ্ধ, অপরিবর্তনীয়, সুসমঞ্জস নীতিমালা দ্বারা হিন্দু সমাজ শাসিত হতো না। দেশাচার ও সমাজ সংস্কারকদের [বাঙলার ক্ষেত্রে স্মার্ত রঘুনন্দন (১৬শ শতক)] রচিত যুগোপযোগী শাস্ত্র দ্বারাই হিন্দু সমাজ নিয়ন্ত্রিত হতো এবং যুগপৎ চিরায়ত শাস্ত্রসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধও বজায় ছিল। হিন্দু ইতিহাসের আগের যুগগুলিতে যেমন সংস্কার সাধিত, শাস্ত্র রচিত এবং ব্যবস্থান্তর গৃহীত হয়েছে, তেমনি যুগপরিবর্তনের উনিশ শতকীয় ক্রান্তিকালে তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা হিন্দুধর্ম ও তার শাস্ত্রের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল। যুগধর্মের প্রতি হিন্দুদের আনুগত্যও ঐতিহাসিক সত্য। শাস্ত্র লঙ্ঘন না করে, এবং এমন কি শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, আমূল পরিবর্তন কেবল হিন্দু সমাজেই সম্ভবপর। নারীমুক্তিসহ উনিশ শতকীয় যাবতীয় সংস্কার আন্দোলনই এই সম্ভবপরতার সুবিধাটুকু ভোগ করেছিল। এ জন্যই সম্ভব হয়েছিল রামমোহন ও বিদ্যাসাগর কর্তক শাস্ত্র-ভিত্তিক তর্কবির্তক এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপনপূর্বক নারীমুক্তি সমর্থন, আর অপর পক্ষে রাধাকান্ত প্রমুখের স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন। 'নানা মুনির নানা মত'-সমৃদ্ধ হিন্দু শাস্ত্রে কোনো

---

[৩১] হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে রামমোহনের মতামত তাঁর লেখার মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। শাস্ত্রের বৈচিত্র্য ও স্ববিরোধিতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে তিনি অনেক জটিল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন, *ব্রাহ্মণ সেবধির* প্রথম দুই সংখ্যা। (*রচনাবলী*, পৃ. ২৩৩-২৪২)। বিতর্কমূলক পুস্তিকাগুলিতে রামমোহন হিন্দু শাস্ত্রের মতবৈচিত্র্য সার্থকভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিলেন। এভাবে তিনি বহুদেববাদ, প্রতিমা পূজা, মদ্যপান, মাংসভোজন, অসামাজিক বিবাহ ইত্যাদি অনেক কিছুরই অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করে। *ব্রাহ্মণ সেবধি* ছাড়াও *চারি প্রশ্নের উত্তর* ও ছয়খানি *বিচার* গ্রন্থে এর অজস্র দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

বিষয়েই একবাক্যতা নেই। ধর্মশাস্ত্রের এই নমনীয়তা হিন্দু মানসেও অনুস্যূত ছিল। ফলে পরিবর্তন যতোই অভিনব লাগুক, শেষ পর্যন্ত হিন্দুরা তা গলাধঃকরণ করতে অসমর্থ হয়নি।

৪.১.২. আন্দোলনের স্বগত গতি

দ্বিতীয়ত, যে-কোনো প্রগতিধর্মী আন্দোলনের মতো নারীমুক্তি আন্দোলনও একটি নিজস্ব গতি অর্জন করেছিল। এর পর্যায়-পরম্পরা কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা অব্যর্থভাবে গ্রথিত ছিল। প্রথম পদক্ষেপ পরবর্তী পদক্ষেপকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। দ্বিতীয় পদক্ষেপ তৃতীয়কে অপরিহার্য করেছিল, এবং চতুর্থের অনিবার্যতা তৃতীয়ের মধ্যেই নিহিত ছিল। সতীদাহ নিবারিত হলে বিধবার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিধবাবিবাহ আন্দোলন জরুরি হয়ে পড়ে। বিধবাবিবাহ স্বীকৃত হলে বাল্যবিবাহ, পতিতাবৃত্তি ও সবর্ণবিবাহের উপর তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

তবে সব কারণের আদি কারণ শিক্ষা, যা সাধন করে মানসিকতার পরিবর্তন, আত্মসমীক্ষা ও যুক্তিবাদ। এগুলি থেকেই ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসে সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপসমূহ। শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে এ সত্য স্বচ্ছতরভাবে উপলব্ধ হওয়ার ফলে আইনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে একেকটি সমস্যার ঝুঁটি ধরে সমাজচিকিৎসার মানসিকতা শতাব্দীর শেষ দিকে পরিত্যক্ত হয়। অথচ বিনা আইনেই বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অবরোধপ্রথা, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি বাঙালি হিন্দু সমাজ থেকে বিলুপ্তপ্রায়, নারীর উচ্চ শিক্ষার অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত, অর্থনৈতিক অধিকার নীতিগতভাবে স্বীকৃত এবং বাস্তবায়নের পথে অগ্রসরমাণ।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থনকারী রক্ষণশীলদের কৌতুককর ভ্রান্তি সহজেই নজরে পড়ে। রাধাকান্ত দেব বুঝতে পারেননি যে মেয়েদের শিক্ষা দিলে তাঁর প্রিয় অন্যান্য কুপ্রথাগুলিও আপনিই উঠে যেতে বাধ্য। দেবেন্দ্রনাথ বা কেশব সেনও হয়তো ভাবতে পারেননি যে তাঁদের সমর্থিত নারীমুক্তি তাঁদের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছেই থেমে থাকবে না, বরং তা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে চলবে, তাঁরা সঙ্গে থাকুন বা না থাকুন। আন্দোলনের এই স্বগত গতির জন্যই তা বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃগণকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। যাঁর কাছ থেকে যতোটুকু সম্ভব শক্তি ও সমর্থন সংগ্রহ করেছে, কিন্তু যখনই তিনি আন্দোলনের স্বাভাবিক পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে বাধা হয়েছেন, তখনই তাঁকে ফেলে রেখেই ক্রমবিস্তারশীল আন্দোলন সামনে এগিয়ে গেছে। এভাবে অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন বিভিন্ন পর্ববিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেছেন; অথচ নারীপ্রগতি তবু অব্যাহত থেকেছে এবং বিশ শতকে এসে তা সংস্কার-সংস্কার্য অভিন্নতা সাধন করে 'রিফর্ম ফ্রম উইদিন' প্রক্রিয়া দ্বারা নিজেকে দ্রুতায়িত করেছে, অর্থাৎ আন্দোলন মেয়েদের নিজ নিয়ন্ত্রণে পড়ে বিশাল ব্যাপকতা লাভ করেছে। ব্রিটিশ শাসনাধীনে দেশের যে বিরাট সামাজিক-অর্থনৈতিক-মানসিক পরিবর্তন হচ্ছিল তাও এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত স্বায়ত্ত গতিকে জোরদার করেছে এবং নারীমুক্তিকে অবশভাবে অগ্রসর হতে দিয়েছে।

এ কারণেই উনিশ শতকের শেষ পাদের হিন্দু পুনরুত্থান এবং 'নব্য হিন্দুবাদ'ও এর গতিরোধ করার প্রকৃত চেষ্টা করেনি, বরং সহায়তাই করেছে। কথাটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। হিন্দু পুনরুত্থানের মুখে সামাজিক অগ্রগতি ও নারীমুক্তি প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি, শিক্ষিত মেয়েদের প্রতি, ও সমাজ-সংস্কার তথা নারীপ্রগতি আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ-বিদ্রূপ করে, প্রাচীন হিন্দু ব্যবস্থাকে সমর্থন করে শতাব্দীর শেষ চার দশকে অনেক কিছু বলা ও লেখা হয়েছিল। ১৮৯১-এর সহবাস সম্মতি বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষাংশের শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর এই নব্য রক্ষণশীলতা উৎসারিত হয়েছিল যতোটা না ধর্মান্ধতা থেকে, তার চেয়ে বেশি জাতীয়তাবোধ তথা জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে। এই বুদ্ধিজীবী আক্রমণ মূলত ছিল বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ ব্যাপারটা আসলেই রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। জাতীয়তাবোধের এই ছত্রচ্ছায়ায় হিন্দু রক্ষণশীলতা পুনর্জীবিত হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা অবশ্য করেছিল। নারীপ্রগতি আন্দোলন এতো দিন ধরে লড়াই করে আসছিল ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত বিরোধিতার সঙ্গে এবং কালাতিক্রান্ত এক মোহের বিরুদ্ধে। এখন যেন মনে হলো সত্যি-সত্যিই এক অজেয় শত্রুর সম্মুখীন সে হয়েছে; জনগণমন অধিকারকারী এক যুগোচিত নতুন আদর্শবাদের বিপরীত স্রোতে সে হয়তো ভেসেই যাবে। কিন্তু তা হয়নি। জাতীয়তাবোধও উনিশ শতকীয় নবজাগরণেরই ফসল, এবং সেই সূত্রে নারীমুক্তির ধারণার সহোদর। এই জ্ঞাতিত্ব এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের নিজস্ব গতি দুই-এ মিলে বিপ্রতীপ আবহাওয়াতেও তার সজীবতাকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হলো।

স্বদেশ ও স্বসংস্কৃতির প্রতি সাময়িক উচ্ছ্বাসপূর্ণ বন্দনা নারীপ্রগতির গতিকে নিরুদ্ধ তো করেইনি বরং প্রবর্ধিত করেছিল। তাই এই নব্য রক্ষণশীলতার যুগেরই আহ্বান:

> না জাগিলে সব ভারত ললনা
> এ ভারত আর জাগে না জাগে না।[৩২]

উচ্চ শিক্ষিতা বাঙালি মহিলারা তৎকালীন জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে ও জাতীয় জাগরণের বাণী প্রচার করতে শুরু করলেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদ নিজের প্রয়োজনসীমা পর্যন্ত 'ভারত ললনা'-কে জাগিয়ে যদি দেবেন্দ্র-কেশবীয় ভঙ্গিতে থেমেও যেতো, তবু নারীপ্রগতি স্বকীয় শক্তিতে চলতেই থাকতো। কিন্তু তার আগেই হিন্দু পুনরুত্থানকে পেছনে ফেলে শতাব্দীসন্ধ্যায় আবির্ভূত হলো নারীপ্রগতির বিশ্বস্ত বান্ধব বিবেকানন্দীয় নব্য হিন্দুবাদ। ভগিনী নিবেদিতার অতুলনীয় অবদান এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

৪.১.৩. ডিমনস্ট্রেশন ইফেক্ট

প্রস্তাবিত তৃতীয় উপাদানটিও রেনেসাঁস অধ্যুষিত বাংলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর তা হচ্ছে 'ডিমনস্ট্রেশন ইফেক্ট' (Demonstration Effect) বা প্রদর্শন-প্রক্রিয়া। প্রথম প্রথম যতো দ্বিধা-সঙ্কোচই থাক না কেন, এক পা দু পা করে যখন কেউ কেউ এগিয়ে এলো এবং দেখা গেল ফল নেহাত মন্দ হচ্ছে না, তখন সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের উপর রক্ষণশীল প্রভাব অনিবার্যভাবেই শিথিল হতে শুরু করলো। একে দুয়ে অনেকেই নতুন পথে পা বাড়ালো। চোখের সামনে বিদেশিনী নারীর শিক্ষাঋদ্ধ স্বাবলম্বী মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রত্যক্ষ করে অনেকেই বুঝলো লেখাপড়া শিখলেই মেয়েরা বিধবা হয় না, প্রত্যুত দেশের সব বিধবাই নিরক্ষর। পূর্বোক্ত *স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক* (৩য় সং. ১৮২৪) বই-এ দুই মহিলার কথোপকথনের এক জায়গায় আছে : প্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখাপড়া জানে, তাহারা কেন বিধবা হয় না।[৩৩]

---

[৩২] উদ্ধৃত, মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩: ৩৩৬।

[৩৩] উদ্ধৃত, *তদেব*, পৃ. ৩: ৩২২।

পরের পর্যায়ে আর বিদেশিনী নয়, দেশী মেয়েদের দৃষ্টান্তই উৎসাহ বাড়িয়ে তুললো। রাণী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির উদাহরণ ছিল। তা ছাড়া নতুন স্কুলে পড়া মেয়েরাও লেখাপড়া শিখে বিধবা বা ভ্রষ্টাচারিণী তো হলোই না, বরং নানা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে নিজেদের ভাবমূর্তিকে এমন ভাস্বর করে তুললো যে, এ অভিনব অনুশীলন আরো লোকের কাছে আগ্রহজনক হয়ে উঠতে লাগলো। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিলের *সমাচারদর্পণে* লেখা হয়:

> এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ...কন্যারদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে যে বালিকারা শিক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসর কেহ দেড় বৎসর লিখাপড়া শিখিয়াছে। তাহারা যে ভাষা পুস্তক কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে স্ত্রীলোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতি শীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব ... [বালিকাদের] বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত।[৩৪]

প্রথম অভিযাত্রীদের উপনীত সীমা অতিক্রম করে নূতনতর ভূখণ্ডে পদার্পণেচ্ছু নবোৎসাহীদের সংখ্যা বেড়েই চললো। এই দেবেন্দ্র-কেশবাতিক্রমী ক্রমাভিসারী ইচ্ছার পরিণতিতে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে দুজন বাঙালি মেয়ে[৩৫] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রথম মহিলা স্নাতক' হওয়ার গৌরব অর্জন করে কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) ভুল ভাঙিয়েছিলেন:

> যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙ্গালীর মেয়ে"
> তারি মত সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে ॥
> ... ...
> কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে? .
> ... ...
> ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।[৩৬]

স্মর্তব্য, হেমচন্দ্র হিন্দু পুনরুত্থানের কবি ছিলেন। তাঁর মতো অনেকেই এই ডিমনস্ট্রেশন ইফেক্ট-এর প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েরা। তাঁদের থেকে প্রদর্শন-প্রক্রিয়া হিন্দুদের উপর অব্যর্থভাবে নিপতিত হয়েছিল।

প্রদর্শন-প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ মেলে বিশ শতকের মুসলিম নারী জাগরণের ইতিহাসে। আগেই বলা হয়েছে (উপরে অনুচ্ছেদ ৩.২ দ্রষ্টব্য) যে, উনিশ শতক শেষ হওয়ার পূর্বেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দু মহিলাদের দৃপ্ত পদচারণা শুরু হয়েছিল এবং বিশ শতকের প্রারম্ভে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অতঃপর অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ও কম সময়ে মুসলিম নারীর অবরোধমুক্তি ও প্রগতির মূলে যে দুটি প্রধান কারণ ছিল তা হচ্ছে: সংস্কার্য সমাজাংশের ভেতর

---

[৩৪] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১:১৫।

[৩৫] এঁরা হলেন: ১. চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪) এবং ২. কাদম্বিনী বসু (১৮৬১-১৯২৩)। পরে তাঁরা যথাক্রমে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ এবং বিলাতফেরত ডাক্তার হয়েছিলেন।

[৩৬] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *হেমচন্দ্র-রচনা-সম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৮/১৯৭১), পৃ. ৪২০। এর আগে হেমচন্দ্র "বাঙালীর মেয়ে" শীর্ষক কবিতায় অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ঝগড়াটেপনা, মিথ্যা অহংকার ইত্যাদি নানা দোষারোপ করে এদেশের মেয়েদের নিন্দাবাদ গেয়েছিলেন। (*তদেব*, পৃ. ৪৫০-৫৩)।

থেকেই সংস্কারকের আবির্ভাব (যথা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আন্দোলন), যার কথা উপরে বলা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩.৩ দ্রষ্টব্য), এবং উক্ত প্রদর্শন-প্রক্রিয়া। রোকেয়ার আন্দোলনের সাথে রামমোহনের আন্দোলনের কাঠামোগত মিল ছিল। শত বর্ষ পরে রামমোহনের মতোই রোকেয়াও লেখনী ও বিদ্যালয়কে অবলম্বন করেছিলেন লক্ষ্য অর্জনের সাধিত্র হিসেবে। সময়ের ব্যবধানে রামমোহনের তুলনায় রোকেয়া যেসব সুবিধা পেয়েছিলেন তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে বিদ্যমান উদাহরণ। গত এক শতাব্দীর অগ্রগতির ফলস্বরূপ আধুনিকায়িত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু মধ্যবিত্ত নারী সমাজের দ্যুতিমান চেহারাটি চোখের সামনে বিন্যস্ত থেকে রোকেয়াকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাঁর অনুসারীদের আস্থা উৎপাদনেও সহায়ক হয়েছিল। রোকেয়ার রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে:

> চারি দিকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা . . . সর্ববিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এবার মাদ্রাজের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদে একজন মহিলা নির্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রেংগুনে একজন ব্যারিস্টার ইয়াছেন। . ...কিন্তু মুসলিম নারীর কথা আর কি বলিব—তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে আছে।[৩৭]

তার পর মুসলিম সমাজের একাংশ প্রগতিশীল হয়ে উঠলে একই প্রদর্শন-প্রক্রিয়া অপরাংশকে অচিরে প্রভাবিত করে পরিবর্তনের সূচনা করে। ১৯২৬ সাল নাগাদ কলকাতার মুসলমান সমাজের এমনি অভ্যন্তরীণ বিক্রিয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছেন খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-৮১) :

> ...স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী-প্রগতি নিয়ে তরুণ দল যে শাণিত কলম চালাতে লাগলেন, রক্ষণশীলেরা তা চাপা দিতে গিয়ে তাঁদের শেষ অস্ত্র 'কাফের' ও 'বিবি তালাকের ফতোয়া' নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বাঁধভাংগা স্রোতের মতো তখন চলছে তরুণের অগ্রগতি। . . . পরে দেখা গেলো : যাঁরা ছিলেন এই অগ্রগতির ঘোর বিরোধী তাঁরাই চুপে চুপে স্ত্রী আর যুবতী কন্যা নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ইডেন গার্ডেন অথবা গড়ের মাঠের ধারে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন।[৩৮]

এভাবে সেই সুদূর ১৮২২ সাল থেকে বিশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত প্রদর্শন-প্রক্রিয়া নারীমুক্তি আন্দোলনে সতত গতিসঞ্চার করে এসেছে। এখনো এই প্রক্রিয়া সমগ্র উপমহাদেশে নারীপ্রগতির ক্ষেত্রে একটি প্রধান ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

৫. উপসংহার

উনিশ শতকের বাংলায় বিশাল সংস্কার প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল 'The Woman Question' তথা নারী প্রশ্ন। পুরুষের নেতৃত্বে পরিচালিত নানা পর্যায়-সংবলিত আন্দোলনের ফলে ওই মহাপ্রশ্নের

---

[৩৭] রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *রোকেয়া-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৮০/১৯৭৩), পৃ. ২৭৮।

[৩৮] খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, *যুগস্রষ্টা নজরুল*, সংশো. ২য় সং (ঢাকা: আলহামরা লাইব্রেরী, ১৯৬৮), পৃ. ৯২-৯৩।

আংশিক সমাধান মাত্র বেরিয়ে এসেছিল। এতেই আন্দোলন একটি স্বয়ংক্রিয় গতি লাভ করতে সমর্থ হয়। হিন্দু সমাজ ও ধর্মের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বৈচিত্র্য, বহুলতা ও বিরোধাভাস ওই গতিকে আরো স্বাচ্ছন্দ্য দেয়। তবে এই জঙ্গমতার সবচেয়ে কার্যকর উপাদানটি ছিল demonstration effect বা প্রদর্শন-প্রক্রিয়ার প্রভাব। এরই অব্যর্থ টানে একের পর এক অনিচ্ছুক গোষ্ঠীগুলো নারীপ্রগতির ধারায় সামিল হতে বাধ্য হয়। নারী নেতৃত্বের অভাবজনিত উনিশ শতকীয় দুর্বলতা কাটাতে বিশ শতের গোড়ায় ভগিনী নিবেদিতা ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এগিয়ে এলে এ দেশে নারী প্রগতি দ্রুততর বেগ অর্জন করে। এভাবে রামমোহনের যুগ থেকে রোকেয়ার কাল পর্যন্ত 'নারী প্রশ্ন' মোকাবেলার একটি অভগ্ন অক্ষরেখা লক্ষ করা যায়। পরবর্তী ইতিহাসে বাংলা রেনেসাঁসের নানামুখী প্রভাবের এটি একটি স্বচ্ছতর দৃষ্টান্ত।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

বাংলায় জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাজনীতি ও ব্যারিস্টার আবদুর রসুল

মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী*

Abstract: The contribution of the people those who are reckoned in Muslim politics in Bengal, especially during the first two decades of 20 century, Barrister Abdur Rasul occupies an unparalleled place The educated youths and middle-class Muslim nationalist leaders had profound influence on the polity of the period. Barrister Abdur Rasul was in the forefront of the leadership. His invaluable contribution towards Muslims welfare through politics and journalism is recognised with excellence.This article discusses how Abdur Rasul alongwith help and co-operation of his colleagues and contemporaries was able to inspire the educated Muslim youths and the middle class Muslim leadership towards nationalism taking them out of the clutches of British loyalists Ashraf Muslims.

ভূমিকা

বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে যে সমস্ত ব্যক্তির অবদান লক্ষ করা যায় তন্মধ্যে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল অনন্য স্থান অধিকার করে আছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকটি অনেকাংশে জাতীয়তাবাদী, শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, আবদুর রসুল তার পুরোভাগেই ছিলেন। রাজনীতি ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজের মঙ্গল সাধনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। নিজের দেশ ও জাতির হিত সাধনে রসুলের অবদানের কথা উল্লেখ করে তার সমসাময়িক মৌলানা আকরম খাঁ উল্লেখ করেছেন: "নিজের চরিত্র বলে ও সাধনার ফলে মানুষ দুনিয়ায় বড় হয়, আর নিজের দেশ ও জাতিকে বড় হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এই হিসাবে বাংলার যে সব খ্যাতিমান মুসলমান নিজেরা বড় হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতিকে বড় করিয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছেন মিঃ আবদুর রসুল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।"[১] ব্যারিস্টার আবদুর রসুল স্বল্পায়ু জীবনে তাঁর সতীর্থদের সহযোগে কিভাবে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় রাজভক্ত আশরাফ

---

* ড. মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী , সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] আবদুর রসুল, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *বার্ষিক মোহাম্মদী*, ১৩৩৫, পৃ. ১৫৮।

মুসলমানদের প্রভাব থেকে বাংলার শিক্ষিত যুব ও মধ্যবিত্ত মুসলমান নেতৃত্বকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন বর্তমান প্রবন্ধে তা আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আবদুর রসুলের পরিচয়

আবদুর রসুল ১৮৭২-৭৩ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাব-ডিভিশন শহরের গুনিয়াউক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মৌলভী গোলাম রসুলের জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। অল্প বয়সেই পিতৃহারা রসুল ১৬ বছর বয়সে ঢাকা সরকারি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বৎসরেই তিনি মিড্‌ল টেম্পল হতে গৌরবের সঙ্গে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বি.সি.এল (ব্যাচেলর অব সিভিল ল) ডিগ্রি উপাধি প্রাপ্ত হন। বাঙালি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রসুলই সর্ব প্রথম এই গৌরবজনক উপাধি লাভ করে স্বদেশের ও স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। ১৮৯৯ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন পেশায় যোগদান করেন। ১৮৯৯-১৯০২ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইংরেজি বিষয়ে (এন্ট্রান্স) প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ে পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সুপারিশে লেকচারার হিসাবে তাঁর যোগদানে সরকারি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। কিন্তু সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তার নিয়োগ বাস্তবায়িত হয়নি। মৌলানা মুজিবর রহমান সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন, "Under orders of the Government of India, as these gentlemen were 'Undesirables' from the Government point of view evidently on account of their radical political views".[২] তথাপি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে রসুল কখনো পিছ পা হননি।

আবদুর রসুলের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার মুসলিম রাজনীতি

রাজনীতির সাথে ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ করা যায় মূলত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ গঠনের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে। এর ধারাবাহিকতায় 'The Musalman' পত্রিকার সাথে যুক্ত থাকা থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিই তাঁর আমৃত্যু সংগ্রাম ছিল। রাজনীতিতে তার আবির্ভাবের পূর্বে বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রসাঙ্গিক বলে মনে করি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার মুসলমানরা সভা সমিতি গঠনে কিছুটা আগ্রহ প্রদর্শন করতে থাকেন। ১৮৫৫ সালে কলিকাতায় বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুসলমানের উদ্যোগে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম সংস্থা 'Mohammadan Association' বা 'আঞ্জুমান-ই- ইসলাম' গঠিত হয়।[৩] ১৮৬৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠা করেন 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি'[৪] ও ১৮৭৭

---

[২] *The Mussalman*, 21 Anniversary, 6 December 1927.

[৩] মৌলানা ফজলুর রহমান এর সভাপতি, কাজী আবদুল বারী (কাজী, কলিকাতা সদর আদালত) সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ মোজাহের ও মোহাম্মদ আবদুর রউফ (*দূরবীন* সম্পাদক) নির্বাচিত হন, *দূরবীণ*, ২১ মে ১৮৫৫।

[৪] মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, Enamul Hoq ed., *Nawab Bahadur Abdul Latif, Writings and Related Documents* (Dacca, 1963) দ্রষ্টব্য।

সালে সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠা করেন 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'।[৫] মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এর জন্য দাবি-দাওয়া ও আবেদন নিবেদনের মধ্যে উক্ত সোসাইটি গুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হতো। উত্তর-ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক আদর্শ ও 'রাজনীতিতে রাজভক্তি ও শিক্ষায় আধুনিকতা'[৬] নীতিই এই সময়কার মুসলিম রাজনীতির আদর্শ হয়ে ওঠে। এদেশে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭০ এর পর থেকেই শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিতে কিছু পরিবর্তন আনায় মুসলমানদের মনে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে কিছুটা আগ্রহ বাড়ে।[৭] নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলীর অনুরক্ত কিছু সম্ভ্রান্ত মুসলমান (আশরাফ মুসলমান) বাংলার বিভিন্ন এলাকায় মুসলমান সমাজের পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খান বাহাদুর আবদুল আজিজ (চট্টগ্রাম), মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (রাজশাহী), খান সাহেব মোহাম্মদ আশরাফ আলী চৌধুরী (নাটোরের জমিদার), মীর্জা সুজাত আলী বেগ, খানবাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী (রংপুর), খান বাহাদুর আলী নওয়াব চৌধুরী (ত্রিপুরা), নওশের আলী খান ইউসুফজাই, নওয়াব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।[৮]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক দশক ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা আদায়-এই ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলমান এমনকি নব্য শিক্ষিত মুসলমান নেতৃত্বের রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উনবংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশের জনগণের সাথে আধুনিক রাজনীতির কোনো পরিচয় ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদনই ছিল তখনকার সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ইউরোপ সহ পৃথিবীর আধুনিক রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে রাজনৈতিক কর্মকান্ড অনেক আগে শুরু হলেও ভারতে আধুনিক রাজনৈতিক সচেতনতার প্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায় ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[৯]

কংগ্রেসের প্রতি সম্ভ্রান্ত (আশরাফ) মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতার নেতৃত্বে ব্রিটিশ নাগরিকদের প্রাপ্ত রাজনৈতিক অধিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবাসীর জন্য রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে সচেষ্ট হন।[১০] জাতীয় কংগ্রেস আধুনিক ধরনের রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আহমদের অনুসারী সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা বাংলার

---

[৫] সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন, K.K. Aziz, *Amir Ali His Life and Work* (Lahore, 1960).

[৬] বিস্তারিত দেখার জন্য Shan Mohammed, *Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan* (Bombay, 1972) দ্রষ্টব্য।

[৭] *Report of the Moslem Education Advisory Committee* (Calcutta, 1932), p. 8.

[৮] *বাংলা সাময়িকী*, আহমদী ১৮৮৮, দেখুন আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই এর নিবন্ধ; এস,এম ছোবহান, *হিন্দু-মুসলমান* (ঢাকা, ১৮৮৯)।

[৯] Sitaramayya B.P. *The History of the National Congress*, Vol. 1 (Bombay, 1940), pp. 5-23

[১০] ১৮৮৫-১৮৯৫ পর্যন্ত কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড সম্পর্ক দেখুন: Sitaramayya *Ibiv;* W.S. Blunt, *India Under Repon* (Lahore, 1909), pp. 110-116.

মুসলমানদের কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়।[১১] ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান সম্পাদিত সমসাময়িক পত্রিকা 'হাফেজ' উল্লেখ করেছে। "প্রথমত কংগ্রেসের যেরূপভাবে গভর্ণমেন্টের কার্যাবলী সমালোচনা, প্রতিবাদ করিয়া থাকে তাহাতে বোধ হয় কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট বিরোধী; সুতরাং এহেন কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দিয়ে গভর্ণমেন্টের বিরাগভাজন হওয়া উচিত নহে।... দ্বিতীয়ত কংগ্রেস দ্বারা কোন লাভ হইলে হিন্দুরাই তাহা বণ্টন করিয়া লইবে, মুসলমানরা কিছুই পাইবে না। কংগ্রেস দ্বারা কোন রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করিলে এবং সরকারি চাকুরীতে সাফল্য লাভ করিলে তাহা শুধু হিন্দুদের লাভ হইবে, মুসলমানদের নহে।[১২]

এই পটভূমিতে শহরে বসবাসরত ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণকারী মুসলমান শিক্ষিত সমাজ কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়নি।[১৩] কংগ্রেস ভারতের উচ্চ পদসমূহে চাকুরিতে নিয়োগের নিমিত্ত জাতীয় কংগ্রেসে ভারতে এবং লন্ডনে একই সাথে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে।[১৪] উপরন্তু মুসলমানদের জনসংখ্যার প্রাধান্য অনুযায়ী ঐ সব নিয়োগে বিশেষ সুবিধা দাবি করতে থাকে। সরকারি চাকুরির প্রশ্নটি সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান নেতৃত্বের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ দ্রুতবর্ধনশীল শিক্ষিত চাকুরিপ্রার্থী যুবকদের তাদের প্রভাবে রেখে এবং তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাখা ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

মুসলমান সম্প্রদায়ের নামে ব্রিটিশ সরকারের কাছে 'বিশেষ সুবিধা' দাবি করার জন্য যে উদ্দেশ্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের উৎসাহিত করেছিল একই উদ্দেশ্যে তাদের এদেশে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের নীতিতেও তাঁরা বিরোধিতা করেছিল।[১৫] সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা লক্ষ করেছিল যে, যেসব স্থানে মুসলমান জনগণের প্রাধান্য ছিল সেখানকার স্থানীয় পরিষদগুলোতেও মুসলমানরা নির্বাচিত হতে সক্ষম হয়নি।[১৬] এই উপলব্ধি থেকে মুসলমান নেতৃত্ব তাদের পূর্বের চেতনা অনুযায়ী মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারেও "বিশেষ সুবিধা" অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 'পৃথক-প্রতিনিধিত্বের' দাবি করে। ব্রিটিশ সরকার ও মুসলমানদের এ আলাদা রাজনৈতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সম্ভ্রান্ত মুসলমান (আশরাফ) নেতৃত্বের দাবির প্রতি ব্রিটিশ প্রশাসনের সহানুভূতির প্রকাশ উল্লেখযোগ্য।[১৭] শিক্ষিত শহরবাসী সম্ভ্রান্ত মুসলমান নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক চেতনা ও বিশেষ সুবিধা আদায়ের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের নিকট সঞ্চারিত হওয়ার লক্ষণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। তবে মফস্বল এলাকায় কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে ঐ সময়ে কিছু সমিতি (আঞ্জুমান-ই-ইসলাম)[১৮] ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব সমিতি মুসলমানদের সামাজিক সমস্যা নিরূপণ করা থেকে শুরু করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুসলমানদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের

---

[১১] *ইসলাম প্রচারক*, ৫ম বর্ষ শ্রাবণ,কার্তিক ও পৌষ ১৩১০, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১।

[১২] *হাফেজ*, ১ম বর্ষ,২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯।

[১৩] এতৎসত্ত্বেও বাংলা থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশন সমূহে বাংলা থেকে যে সমস্ত মুসলমান প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন তার বিস্তারিত তালিকার জন্য দেখুন: Sufia Ahmed, *Muslim community in Bengal 1885-1912* (Dacca, 1974), Appendix C, পৃ. ৩৭৮-৩৯৮।

[১৪] Peter Hardy, *The Muslims of British India* (Cambridge, 1972), পৃ. ১২৫।

[১৫] W.S.Bhunt, *India Under Ripon* (London, 1909), পৃ. ৩৭৮-৮৯।

[১৬] *মিহির ও সুধাকর*, ২০শে জুন ১৮৯৬।

[১৭] Peter Hardy, *op.cit*, পৃ. ১২৫।

[১৮] অমলেন্দু দে, *ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলিম সমাজ*, চতুরঙ্গ, ১৯৯৪, পৃ. ৩১২।

স্বার্থে আলাদাভাবে নিজেদের পরিচয়ে অবস্থান নেওয়ার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে।[১৯] তাঁরা ব্রিটিশ সহযোগিতায় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের বিপরীতে মুসলমানদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় হিসেবে উপস্থাপন করে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান ধরে রাখতে চেষ্টা করেন।

মুসলমানদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যারিস্টার আবদুর রসুল

বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে কিছু সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই সক্রিয়তা কোনো একক লক্ষে বা পথে পরিচালিত হয়নি। স্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনায় বিশ্বাসী আরবি-ফারসি ভাষায় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান নেতৃত্ব 'ব্রিটিশ অনুগত' প্রজা হিসেবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে বাংলায় জন্মগ্রহণকারী ও আধুনিক শিক্ষিত কিছু সংখ্যক মুসলমান দেশের অন্য ধর্মাবলম্বী নেতৃত্বের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী ছিল। তাদের বিশ্বাস শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয়দের কোনো অধিকার আদায় করা সম্ভবপর হবে না। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে বাংলা প্রদেশের বিশাল আয়তনের প্রশ্নে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করে। ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ও পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের সৃষ্টি হয়। কিন্তু জনগণের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা একটি সাম্রাজ্যবাদ মূলক কারসাজি এবং এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে একটি স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের শাসন স্থায়ী ও দীর্ঘ করাই ছিল মূল লক্ষ।[২০] যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হউক না কেন এতে বাংলার হিন্দু-মুসলিম রাজনীতিতে একটি নুতন মেরুকরণের সৃষ্টি হয়।

বঙ্গভঙ্গ মুসলিম নেতৃত্ব ও আবদুর রসুল

'বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ায় পূর্ববঙ্গের অভিজাত মুসলমান নেতৃত্বের কাছে ব্রিটিশ প্রশাসন মুসলমান নেতৃত্বের কাছে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে নতুন পূর্ব বাংলা আসাম প্রদেশ গঠনকে একটি মুসলমান শক্তিকেন্দ্র হিসেবে আবির্ভাব এবং এ প্রদেশের মাধ্যমে মুসলমানদের পুরোনো ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে আনার আশ্বাস বাণী শুনানো হয়।[২১] মুসলমান সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ব্রিটিশ প্রশাসকদের অনুপ্রেরণায় বঙ্গভঙ্গের পক্ষে দ্রুত অবস্থান গ্রহণ করেন। কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টিতে তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়কে নুতন রজনৈতিক পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। মুসলমান সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে নবাব সলিম উল্লাহ, নবাব সৈয়দ আলী চৌধুরী, সৈয়দ আমির হোসেন প্রমুখ বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিলেন। তবে শুরুতে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের ১৯০৪ সালে অনুষ্ঠিত এক সভায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করা হয়।[২২] ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সমিতিও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। সমিতি উল্লেখ করে

---

[১৯] Rafiuddin Ahmed, *Bengal Muslim a quest for identity 8881-1906* (Delhi, 1981), পৃ-১৭০-১৭৬।

[২০] Surendra Nath Benerjee, *A Nation in Making* (London, 1925), পৃ-১৭০-১৭৬; Sumit Sarkar, *Swadeshi Movement in Bengal 1903-08* (New Delhi, 1933), পৃ. ৯-৩০।

[২১] Sumit Sarkar, pp. 9-30; অমলেন্দু দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।

[২২] ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী:চিন্তা ও কর্ম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), পৃ. ১৪০।

বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলে পুর্ব বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষার অসুবিধা হবে বলে মনে করে।[২৩] *মোসলেম ক্রনিকল*, ৫ আগস্ট-১৯০৫ সংখ্যায় লর্ড কার্জনের এই সিদ্ধান্তকে "Down right disregard of the wishes and feelings of a people" বলে মন্তব্য করে।[২৪] অবশ্য সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন ও *মোসলেম ক্রনিকল* তাদের পুর্বাবস্থায় ফিরে এসে বঙ্গভঙ্গের পক্ষাবলম্বন করে।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দু' তিন সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় গ্রিরিয়াব পার্ক (বর্তমান লেডিস পার্ক) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এক সভায় আবদুর রসুল বক্তব্য রাখেন।[২৫] তিনি চাইতেন দেশের মুক্তি, তাই হিন্দু মুসলমানকে একই সাধনা ক্ষেত্রে সমবেত করার জন্য নিজের সমস্ত কীর্তি ব্যয় করে গেছেন। তিনি মনে করতেন, "উদীয়মান বাঙালি জাতির রাজনৈতিক শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলার জন্যই গভর্নমেন্ট দুরভিসন্ধিমুলে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা আবশ্যক বলে মনে করেছেন, সুতরাং তার প্রতিবাদ করা উচিত"।[২৬] এই সময়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে আবদুর রসুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

দি মুসলমান ও আবদুর রসুল

দি মুসলমান সংবাদ পত্র প্রকাশে আবদুর রসুল অনন্য অবদান রাখেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান এবং অন্যান্যদের মধ্যে সমাজ ও দেশহিতকর বিষয়গুলোর প্রচার করার জন্য আবদুর রসুল, মৌলবী মুজিবর রহমান ও বর্ধমানের মৌলবী আবুল কাশেমকে নিয়ে সংবাদপত্রটি প্রকাশ শুরু করেন।[২৭] সংবাদপত্রটি প্রকাশের কিছু সময় পূর্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯০৬ সালের নভেম্বরে বরিশালে অনুষ্ঠিত) ব্যারিস্টার আবদুর রসুল সভাপতিত্ব করেন।[২৮] বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভা ও *দি মুসলমান* পত্রিকা প্রকাশ সম্পর্কে এই পত্রিকায় সম্পাদক মুজিবর রহমান নিজেই উল্লেখ করেছেন:

> In 1906 Abdur Rasul presided over the historic Bengal Provincial Conference held at Barisal – the Conference that was forcibly dispersed by the police when the presidentail address was being delivered. He was the first Muslim to be honoured with the presidentship of the Provincial Conference.
>
> About this time some Mussalmans of the Province holding advanced political views had been feeling the want of a newspaper that would educate Muslims on the duties and the needs of their community and on measures necessary for keeping abreast of the times. After a few months' deliberations it was decided to start an English weekly, the task of giving shape to the project developed upon Rasul along with Mr. A.H. Ghuznavi, Maulavi Abul Kasem and Maulavi Muzibur Rahman; and the first issue of the paper which was named *The Mussalman* appeared on the 6th

---

[২৩] মোঃ সেকান্দর চৌধুরী, "ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মিলন" *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস*, ১৫তম সংখ্যা, ১৯৯০, পৃ. ৬২-৭০।

[২৪] *The Moslem Chronicle*, 5 August, 1905, উদ্ধৃতি: Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal 1885-1902*, (Dacca: 1974), পৃ. ২৪৮।

[২৫] *The Musalman*, 21 Anniversary Number, December 6, 1927, p. 9.

[২৬] *বার্ষিক মোহাম্মদী*, ১৩৩৫ বাংলা, পৃ. ১৬২।

[২৭] *তদেব*।

[২৮] বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা মুসলমানদের মধ্যে ব্যারিস্টার আবদুর রসুলই প্রথম এই কৃতিত্বের অধিকারী, *The Musselman*,21 Anniversary Number, December 6, 1927.

December,1906. Rasul helped in various ways to conduct the paper up to the time of his sad death in 1917.[২৯]

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে *দি-মুসলমান* পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতেন মৌলবী আবুল কাশেম। স্বল্প সময়ের মধ্যে মৌলবী মুজিবর রহমান এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। কিন্তু ব্যারিস্টার আবদুর রসুল সার্বিকভাবে অর্থ যোগান ও বিভিন্ন সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখে, *দি মুসলমান* পত্রিকাকে আজীবন পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আবদুর রসুলের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় *দি মুসলমান* সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য *দি মুসলমান* পত্রিকার প্রতিষ্ঠা থেকে আরো ত্রিশ বৎসরব্যাপী বাংলার মুসলিম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছে।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও আবদুর রসুল

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার ফলে বাংলায় অধিকাংশ হিন্দু-নেতা-জনগণ ও কিছু সংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃত্ব এর বিরোধিতা করে এবং গড়ে উঠে স্বদেশী আন্দোলন। মুসলমানদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি জোর সমর্থন ছিল।[৩০] সামাজিক প্রতিপত্তি, পরিচিতি ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় এঁদের অনেকেই মুসলিম সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এঁদের মধ্যে ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মৌলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুজিবর রহমান, আবদুর রসুল, আবুল কাসেম, আবদুল হালীম গজনভী, খাজা আতিকুল্লাহ, আসাদুজ্জমান চৌধুরী, আবদুস সোবহান চৌধুরী, কাজেম আলী মাস্টার প্রমুখ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। উল্লেখিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল এই আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন এবং প্রথম কাতারের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি বাংলায় বিশেষ করে পুর্ব বাংলায় বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা সমাবেশে বক্তৃতার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রয়াস নেন।[৩১] এই সব সভা-সমাবেশে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং ব্রিটিশদের বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। বাঙালি নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন।[৩২] ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা জেলা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন:

> Now I must say a few words on the partition of Bengal. Mr. Morlay has told us that the partition is "settled fact" . We the people of United Bengal have made answer to Mr. Morlay that we have not accepted and shall never accept the practice as a "settled fact". We have shown him by the thousands of meeting all over Bengal that we have taken Solemn vow to unsettled and undo it ...[33]

---

[২৯] *The Mussalman,Op.cit*. p.9.

[৩০] Sumit Sarkar, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১২-৩৫।

[৩১] ইমরান হোসেন, *বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী: চিন্তা ও কর্ম*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ ১৪৬-১৪৫।

[৩২] Sumit Sarkar, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬।

[৩৩] *The Mussalman*, 18 May, 1907, উদ্ধৃত: ইমরান হোসেন, পৃ. ১৪৭।

স্বদেশি আন্দোনের সময়ে হিন্দু-মুসলমানদের বহু যৌথ সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও কোথাও হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিও লক্ষ করা যায়। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় আবদুর রসুল তাঁর ভাষণে মুসলমানদের প্রতি স্বদেশি আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানান।[৩৪] এক সভায় তিনি ঘোষণা করেন হিন্দু ও মুসলমান এক মায়ের সন্তানের মতো।[৩৫] স্বদেশি আন্দোলনে বাংলার কয়েকজন খ্যাতিমান মুসলমান আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, পীর মৌলানা আবু বকর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৩৬]

বিদেশি পণ্য বর্জন করে স্বদেশি হবার মানসে বাংলায় মুসলমান নেতারাও হিন্দুদের সহযোগে জাহাজ শিল্প ও কোম্পানি গড়ে তোলেন। ১৯০৫ সালে চট্টগ্রামে বেঙ্গল নেভিগেশন কোম্পানি ছিল এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। আবদুর রসুল, অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্যদের সমন্বয়ে কো-অপারেটিভ নেভিগেশন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৭] স্বদেশি আন্দোলনের কিছু ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃত্ব ছাড়া ব্যাপক ভিত্তিতে মুসলমানদের সাড়া পাওয়া যায়নি।

ব্রিটিশ-অনুগত ও বঙ্গভঙ্গ সমর্থিত মুসলমানদের উদ্যোগে ও নবাব সলিম উল্লাহর সভাপতিত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন "সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগ" গঠন করেন। এই সংগঠনের লক্ষ ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ সংরক্ষণ করা।[৩৮]

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে বাংলার কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ১৯০৭ সালে কলিকাতায় 'ইন্ডিয়ান মুসলমান এসোসিয়েশন' নামে মুসলিম লীগের পাল্টা একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যারিস্টার আবদুর রসুল এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অবশ্য বঙ্গ ভঙ্গ রদ হলে বাংলার মুসলিম নেতৃত্বে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতৃত্বকে কিছুটা শান্ত করার লক্ষে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেয় এবং বাংলা ভাষাভাষী এলাকা নিয়ে বাংলা প্রদেশ পুনগর্ঠন করে।[৩৯]

বঙ্গভঙ্গ রদ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলায় জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃত্ব কলিকাতায় একটি সভা আয়োজন করেন, এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আবদুর রসুল, মুজিবর রহমান, শেখ আবদুর রহিম, আবুল কাশেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ২৫টি জেলার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গভঙ্গ কার্যকর এবং রদে বাংলায় মুসলমাদের মধ্যে ব্রিটিশদের উপর আনুগত্যের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। উপরন্তু বলকান যুদ্ধ (১৯১২) ও ব্রিটেনের তুরস্ক বিরোধী নীতি তাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতাকে আরো প্রবল করে তোলে। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার

---

[৩৪] *The Mussalman*, 10 February, 1908.

[৩৫] ইমরান হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮।

[৩৬] ইমরান হোসেন, *প্রগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

[৩৭] Sumit Sarkar, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩।

[৩৮] Motiur Rahman, *From Consultation to Confrontation, A Study of Muslim League in British Indian Politics*, 1906-1912 (London: 1970), পৃ. ২৭৭।

[৩৯] *The Mussalman*, 4 January 1907.

ফলে বাংলার মুসলিম লীগের যুব নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তারা ব্রিটিশ সরকারের ছায়া থেকে বের হয়ে এসে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আগ্রহী ছিলেন।[৪৫] উপরন্তু দাবি আদায়ের লক্ষে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যথার্থতা তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় এবং বঙ্গভঙ্গ রদ এই নেতৃত্বকে তাদের ভবিষ্যত রাজনীতির ধারা পরিবর্তনে সহায়তা করে। এই যুব নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পেশাজীবী, সাংবাদিক ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ। 'সময়ের সাথে এগিয়ে যেতে হবে অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে' এই উপলব্ধি হওয়ার পর তাঁরা নবাব সলিম উল্লাহ এবং তাঁর অনুসারী সম্ভ্রান্ত মুসলমান (আশরাফ) নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। তাঁরা ব্রিটিশ ধারার পরিবর্তে স্ব-শাসন (Self–Govrnment) নামক আধুনিক ধারণায় উদ্বুদ্ধ হন।[৪১] আবদুল্লাহ, সোহরাওয়ার্দী, এ.কে. ফজলুল হক, আবদুর রসুল প্রমুখ নেতৃত্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ আদায়ের জন্য কংগ্রেস ধারার আন্দোলনকে অনুসরণের আহ্বান জানান এবং হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সহযোগিতার পক্ষে বক্তব্য রাখেন।[৪২] তাঁরা শীঘ্রই বাংলার মুসলিম লীগ সংগঠনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। বঙ্গভঙ্গ রদ ও সমকালীন অন্যান্য রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দ্বারা সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় যথা: *কমরেড*, *আল হেলাল* (উর্দু), *দি মুসলমান*[৪৩],-এর সহযোগিতায় ভারতের উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯১২ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে লীগের পুরোনা নীতি ও সংবিধান পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।[৪৪] একই বৎসরের ১৩ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যুব নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় স্ব-শাসন (Self–Govrnment) আদায় করা। এই সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয় যে, "জাতীয় ঐক্যকে উৎসাহিত করে ভারতীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতা করতে হবে।" সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, "...Self help should henceforth be their motto...Unity between sections of the Indian Community should also be our watch ward"[৪৫] এই সিদ্ধান্ত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালের উদ্দেশ্য থেকে একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে এবং মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্যের সমন্বয়ে দ্রুত জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিণত হতে থাকে।[৪৬] মুসলিম লীগ নীতির পরিবর্তনের কারণে সংগঠনটি কংগ্রেসের অনেক কাছাকাছি চলে আসে এবং হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়। উপরন্তু ১৯১২ সালে মুসলিম লীগ প্রস্তাবিত একটি কেন্দ্রীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নাকচ হয়ে যাওয়া, ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যারিস্টার আবদুর

---

[৪০] *তদেব*।

[৪১] *The Mussalman*, 19 January 1912.

[৪২] Motiur Rahman, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭।

[৪৩] *কমরেড* ,কলিকাতা থেকে মৌলানা মোহাম্মদ আলী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৯১২ সাল থেকে প্রকাশিত হয় । পরে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। *আল হেলাল*, মৌলানা আবুল আহাদ সম্পাদিত ও দি *মুসলমান*, মুজিবর রহমান সম্পাদিত, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

[৪৪] *The Bengalee*, March 11, 1912.

[৪৫] *The Mussalman*, January 3, 1912.

[৪৬] *The Mussalman*, January 19, 1912.

রসুল, ড. আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী ও কে.পি. জাসওয়ালের নিয়োগ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাতিল ঘোষণা প্রভৃতি কারণে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।[৪৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সময়ের আরো একটি ঘটনা মুসলমানদেরকে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রদর্শনে বাধ্য করে। এ সময়ে উত্তর ভারতের কানপুরের পৌরসভা কর্তৃপক্ষ একটি মসজিদের অংশবিশেষ ধ্বংস করার ফলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও চেতনা প্রকট রূপ ধারণ করে।[৪৭] কানপুর মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া বাংলায় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাংলার যুব মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও প্যান-ইসলামী ভাবধারার পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে এবং বিষয়টি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। *দি মুসলমান, মোহাম্মদী, নামাই মুকাদ্দেস হাবলুল মতিন* ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা কানপুর মসজিদের ঘটনাকে ১৯১৩ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রচার করতে থাকে। জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত *অমৃতবাজার, বেঙ্গলী* ও অন্যান্য পত্রিকাগুলো এই ঘটনাকে ব্রিটিশ সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রচার করে এর তীব্র নিন্দা করে।[৪৮] কানপুর মসজিদ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলি বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী যুব মুসলিম নেতৃত্বের হাতকে শক্তিশালী করে এবং ব্রিটিশ অনুগত সম্ভ্রান্ত মুসলমান নেতৃত্ব পিছিয়ে পড়ে। এই সময়ে, বাংলার ব্রিটিশ অনুগত রাজনীতির মূল প্রবক্তা নবাব সলিম উল্লাহ ১৯১৫ সালে মৃত্যু বরণ করেন। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ব্রিটিশ দমন নীতি, নবাব সলিম উল্লাহর মৃত্যুতে বাংলায় উদার ও যুব মুসলিম নেতৃত্বে প্রভাব প্রভৃতি কারণ ও অভিজ্ঞতা থেকে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে জাতীয় রাজনীতির বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন তাঁদের কাছে বিকল্প পথ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই সময়ে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা মুসলমানদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে প্রচার চালিয়ে যায়।[৪৯]

হিন্দু-মুসলিম (লক্ষ্ণৌ চুক্তি) ১৯১৬ : আবদুর রসুল

বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব কানপুর মসজিদ ঘটনার পর মুসলমানদের বিভিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলনে নিজেদেরকে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত করে, ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে পথ তৈরি করেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, ফজলুল হক, আবুল কাশেম প্রমুখ। ঐক্য প্রয়াসী বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে যুক্ত হয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তাদের মতের বিশ্বাসী মুসলমান নেতৃত্বের সহযোগিতায় মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে কংগ্রেসের কাছাকাছি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য ছিল তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ইস্যুগুলোতে কংগ্রেসের সমর্থন আদায় করার সাথে সাথে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও সাংবিধান সংস্কার ও তাদের দাবির প্রতি কংগ্রেসকে একাত্ম করা। এই উদ্যোগ সফল হয় ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির (১৯১৬) মাধ্যমে। এই চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম লীগের দীর্ঘ দিনের দাবি পৃথক নির্বাচন প্রথা, আলাদা প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করা হয় এবং সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠায়

---

[৪৬] A.R. Desai, *Social Bac ground of Indian Nationalism* (Bombay, 1966), পৃ. ৪০৩।

[৪৭] J.H. Broomfield, *Elite Conflict in Plural Society*, পৃ. ৭৮।

[৪৮] *আল হেলাল*, আগষ্ট-নভেম্বর, ১৯১৩, পৃ. ৭৮।

[৪৯] *The Mussalman, মোহাম্মদী, নামাই মুকাদ্দেস হাবলুল মতিন, আল-হেলাল*, আগস্ট-নভেম্বর, ১৯১৩ বিভিন্ন সংখ্যা, Bengalee, *Amirta Bazar Patrika*, August-November, 1913, বিভিন্ন সংখ্যা, *Bengal Native News Report*, 1913.

অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করে C. H. Philips লিখেছেন: "The most important feature of the Pact was that it demanded from the British Government that a definite step should be taken towards self-government."[51]

লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট-এর জন্ম দেয়। যার মাধ্যমে একদিকে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আন্দোলনে উভয় সংগঠন একসাথে আন্দোলন করতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়। হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক মতপার্থক্য আপোসে সমাধানের পথ-প্রদর্শক হিসেবেও বিবেচিত হয়। *দি মুসলমান* পত্রিকা উল্লেখ করে যে, "সকলের ঐক্যবদ্ধ দাবি হচ্ছে স্ব-শাসন এবং পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যা এই ঐক্যবদ্ধ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে।"[৫২] এই চুক্তি সম্পাদনের এক বৎসরের মধ্যে ১৯১৭ সালে ৩ আগস্ট তিনি মৃত্যু বরণ করেন। লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সেতুবন্ধন স্থাপিত হয় তা আরো একদশক অর্থাৎ 'চিত্তরঞ্জন দাসের বঙ্গীয় চুক্তি ১৯২৩' খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। খেলাফত-অসহযোগের ব্যর্থতার পর বাংলা ও ভারতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর পরিলক্ষিত হয়নি। বরং সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর দিন দিন উঁচু হয়েছে। এর অপরিহার্য পরিণতি ছিল হিন্দু-মুসলিম ধর্ম ভিত্তিতে আলাদা পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম।

ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টকে সমর্থন করে জুন ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম হলো। মাত্র দশ বছরের মধ্যে মুসলিম লীগ সম্পূর্ণভাবে একটি উন্নয়নশীল দলের করায়ত্ত হয়ে গেল। বৃহত্তর জাতীয়তাবাদের ব্রত নিয়ে কংগ্রেস লীগ চুক্তি সম্পাদন করলো। বলা বাহুল্য, এই ধরনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্রত নিয়ে পুরোভাগে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল। কিন্তু বাংলায় মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে এই জাতীয়তাবাদী নেতা মৃত্যু বরণ করেন। তৎকালীন বাংলার সমসাময়িক মুসলিম নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক অনন্য জাতীয়তাবাদী নেতা। তাঁর সতীর্থ *দিমুসলমান* পত্রিকার সম্পাদক উল্লেখ করেছেন:

> "Rausul was a sincere and ardent nationalist. He was second to none and far superior to many who are regarded as nationalists, in this country." রসুল নিজেই উল্লেখ করেছিলেন : "For good and evil we (Hindus and Mussalmans) are indissoluble bound together. We are the sons of the same motherland. Our Political interests are identical with those of the Hindus."[53]

উপসংহার

ব্যারিস্টার আবদুর রসুল ও তাঁর অনুসারীদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারেনি অর্থাৎ বিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে তাঁরা আর শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি।

---

[৫১] *The Mussalman*, বিভিন্ন সংখ্যা, ১৯১৩-১৯১৬; *মোহাম্মদী*, বিভিন্ন সংখ্যা, ১৯১৫-১৯১৬।

[৫২] C.H. Philips, *The Evolution of India and Pakistan (1859-1947)*, Selected Documents, (London, 1964), পৃ. ১৭১-১৭৩; কংগ্রেস লীগ বিভিন্ন কার্যক্রম এবং লক্ষ্ণৌ চুক্তির স্বাক্ষর পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Sarifuddin Perzada, *Foundation of Pakistan*, Vol. 1, পৃ. ৩৭৮-৭৯।

[৫৩] *The Mussalman*, 26 January 1926.

তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি হতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শক্তিশালী হতে থাকে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্নভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে থাকে। অন্যদিকে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী শক্তির দুর্বলতার কারণে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। স্বল্প সময়ে বাংলার মুসলমান সর্বভারতীয় মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী হন। পরিশেষে বলা যায়, বাংলা ও ভারতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও জাতীয়তাবাদী শক্তি কিছু দিনের জন্য সম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা করেছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল ও তাঁর সতীর্থরা।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

ওয়াহাবি-ব্রিটিশ সম্পর্ক (১৯০৫-১৯২৫) : রাজশাহী জেলা

কাজী সুফিউর রহমান*

Abstract: This article is an attempt to study thje Wahabi Movement on a micro scale. This Wahabi Movement was organised in British India with the aim of regenerating Islam. It spread among the Muslims throught the breadth and length of India. Rajshahi is one of the Bengal districts of British India. The article shows how the Muslim people of even the *mufassil* area of Bengal enthusiastically took part in the movement. Through basically of religious character the Wahabis also served as the workers of the *swadeshi* and *khilafat* movement in first quater of the 20th century.

পটভূমি

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত কমবেশি এই একশত বছর ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক ইতিহাসে 'ওয়াহাবি আন্দোলন' এক বেপরোয়া সংগ্রামমুখী অথচ বিতর্কিত ধারার সূচনা করেছিল। ওয়াহাবি আন্দোলন এদেশে আমদানিকৃত আন্দোলন কি না সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক-মতভেদ আছে। আন্দোলনের উৎসমুখ যাই হোক না কেন, এর আন্তর্জাতিক তাপ-উত্তাপ এবং জেহাদি ধর্মীয় আবেগ এদেশে এই আন্দোলনকে কালান্তরে সক্রিয় করে তোলে। আরবের নেজাদ প্রদেশের দরয়ার অধিবাসী মুহাম্মদ-বিন-আবদুল ওয়াহাব-এর নামানুসারে পরবর্তী কালে ওয়াহাবি আন্দোলনের নামকরণ করা হয় বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। আরব এবং এদেশে আবদুল ওয়াহাবের অনুসারীরা প্রখর ব্রিটিশ-বিরোধী ছিলেন বলে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এরূপ শ্রেণী সম্প্রদায়ভিত্তিক নামকরণ করে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য ও প্রয়াসকে লঘু করার চেষ্টা করেছিলেন বলে অনেক মনে করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক সময়ে ওয়াহাবি আন্দোলন সমগ্র আরব জগতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং সেই সূত্র ধরে ভারতসহ মুসলমান বসবাসকারী অন্যান্য দেশেও ওয়াহাবি ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে। মুহাম্মদ বিন-আবদুল ওয়াহাব এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য পরিচালিত আরব জগতে এই আন্দোলনের উৎস ও প্রেক্ষাপট ছিল যেমন জটিল তেমনি আলোচনা সাপেক্ষ। তবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, আরব জগতে ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল মক্কা-মদিনা-তায়েফ প্রভৃতি পবিত্র স্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারী অর্থাৎ আরবের সুলতান, তুরস্কের সুলতান অথবা মক্কার শরিফের সঙ্গে সহিংস

* সিনিয়র লেকচারার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংগ্রাম। 'জজিরাতুল আরব' বা 'আমিরুল মুমেনীন' প্রশ্নে আরব দুনিয়ার ওয়াহাবি ও চিরাচরিত শাসকপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ভারতে অনুরূপ ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা করেন রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ। হজ পালনকালে তিনি আবদুল ওয়াহাবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং দেশে ফিরে এসে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। কিন্তু এদেশে এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন সৈয়দ আহমদের চার জ্ঞানদীপ্ত ভাবশিষ্য। এঁরা হলেন মৌলভী ইসমাইল, মৌলভী মাসুদ আলি; মৌলভী বিলায়েত আলি এবং মৌলভী এনায়েত আলি। প্রথম জন দিল্লির এবং পরের তিনজনই ছিলেন পাটনার সাদেক মহল্লার অধিবাসী। মূলত এই চারজন এবং এদের ভাবশিষ্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতের নানা প্রান্তে ওয়াহাবি জনমত গড়ে ওঠে। ওয়াহাবিরা ছিলেন মুওয়াহহেদুন বা খাঁটি একেশ্বরবাদী এবং ওয়াহাবি যেহেতু ইসলামের মধ্যে একটি জনমত তাই তারা ইসলামের অন্য জনমতগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ও হায়দরাবাদের নিজাম ওয়াহাবি ধারায় দীক্ষিত হলে এদেশের ওয়াহাবি জনমত মৌলভী-মাওলানার-গণ্ডী ছেড়ে রাজন্যবর্গের কৌলীন্যকৃপা লাভ করতে সমর্থ হয়। যাই হোক এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, ভারতের নানা প্রান্তে ওয়াহাবি জনমত সঞ্চালিত হলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, উত্তর ভারত এবং পূর্ব ভারতের বিহার ও বাংলাদেশে এই জনমতের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বিহার ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে ওয়াহাবি জনমত গড়ে ওঠার পেছনে পাটনার সাদেক মহল্লার মৌলভী ত্রয়ের এবং তাদের উত্তরাধিকারগণের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক।[১]

আরবদেশের অনুকরণে এদেশের ওয়াহাবি আন্দোলন হয়ত গড়ে ওঠেছিল। কিন্তু এদেশের ওয়াহাবিআন্দোলনের প্রেক্ষাপট কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। মক্কা-মদিনা-তায়েফ অর্থাৎ এই সকল পবিত্র স্থানগুলির হেফাজতের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এদেশীয় মুসলমানদের ছিল না বটে কিন্তু এই সকল স্থান বা আমিরুল মুমেনিন বা জজিরাতুল আরব প্রশ্নে কোনো জটিলতা বা হস্তক্ষেপ দেখা দিলে এদেশীয় ওয়াহাবিরা সরব হয়েছেন। বার বার জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তাদের ধারণা ছিল যে ব্রিটিশ শাসকেরা নেজাদের আফমরের বিরুদ্ধে তুর্কি সুলতান ও মক্কার শরিফকে সাহায্য করছেন। ফলে ওয়াহাবিদের কাছে এরা সবাই শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হন। উপরন্তু এদেশীয় ওয়াহাবিরা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বা নাসারাদের শাসনাধীনে ছিলেন এবং মনে করতেন নাসারা শাসনের জন্যই তাদের ধর্ম, ঐতিহ্য কলুষিত হতে চলেছে। ফলে ঘরে-বাইরের কারণ মিলিয়ে ব্রিটিশরা ভারতীয় ওয়াহাবিদের প্রবল শত্রুতে পরিণত হয়।

ভারতে ওয়াহাবি ধারার সূত্রপাত ঘটে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। এই সময়কার ভারতীয় ওয়াহাবিরা জেহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে হিন্দুকুশ পর্বতের সওয়াট উপত্যকার নিচে *মালকা* এবং *সিতানা* নামক স্থানে দুটি উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশ দুটি কার্যকর করে তুলতে বাংলাদেশের জনবল ও ধন-সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ওয়াহাবি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জেহাদ আবেশে আপ্লুত হয়ে কাফেলা সংগঠিত করেছিল মালকা ও সিতানার উদ্দেশ্যে।[২] এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে নিজেদের সক্রিয় সংগঠনের মাধ্যমে মুষ্টিচাল, জাকাত, ফিতরা, কোরবানির পশুর চামড়ার মূল্য, উস্‌র, কাফফরা প্রভৃতি খাত থেকে সংগৃহীত আদায়ী উক্ত উপনিবেশ দুটিতে পাঠানো হতো। তার জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কালেক্টিং

---

১ IB Report, File 6/1906, *Movement among the Wahabis*, p. 13.
২ *Ibid.*, p. 17.

এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই দুটি উপনিবেশের ওয়াহাবিরা শক্তি সঞ্চয় করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কখনও ব্রিটিশ বিরোধী কখনও শিখ বিরোধী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ওয়াহাবিরা বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হলেও ঐ অঞ্চলে দীর্ঘদিন আধিপত্য ধরে রাখতে পারেনি। কারণ শিখ-ব্রিটিশ যৌথ আক্রমণে এবং নেতৃত্বের অন্তঃকলহে ওয়াহাবিরা শেষ পর্যন্ত ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে সিতানার সংগ্রামে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। সওয়াট এবং সিতানার পর পর দুটি সংঘর্ষে মালকা ও সিতানার উপনিবেশ দুটির মোট দশ হাজার ওয়াহাবির তিন-চতুর্থাংশ ওয়াহাবি শহীদ হন বলে সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে।[৩] ব্রিটিশ মেজর পারসনস্ তিনজন বাঙালি আহত ওয়াহাবি মুজাহিদ সনাক্ত করে বিবৃতি দেন যে, ওয়াহাবি যোদ্ধাদের মধ্যে এক-পঞ্চামাংশ ছিল বাঙালি।[৪] কিন্তু মেজর পারসনস্ এর এই বিবৃতি বাংলাদেশের তদানীন্তন ইন্সেপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ কর্নেল পুগে (Pughe) বাংলার জেলাস্থ পুলিশ সুপারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পাল্টা বিবৃতি দেন যে বাংলার কোনো লোকই হিজরত করে মালকা-সিতানার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, তার মতে বাংলার মুসলমানরা ওয়াহাবি কিংবা জেহাদ শব্দটির সঙ্গেও পরিচিত ছিল না।[৫] কর্নেল পুগে ও মেজর পারসনস-এর বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির জেরে জে.এইচ.রিলির (J. H. Reily) নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং গোয়েন্দা দপ্তরের সহযোগিতায় কমিটি পেশ করে যে মালকা-সিতানার যুদ্ধে বাঙালিরা জড়িত ছিলেন এবং আহত তিন যোদ্ধা হলেন নদীয়া জেলার কুমারখালীর কাজী মুরাদ, পাবনার লাল মুহাম্মদ এবং মালদা জেলার মর্তুজা। এছাড়াও আরও প্রমাণিত হয় যে নদীয় জেলার কুমারখালীর কাজী মিজান, মালদহের মৌলভী আমীরউদ্দিন, দিনাজপুরের পীর মুহাম্মদ ও তবারক আলি এবং বাংলার অনেক লোকই ওয়াহাবিদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।[৬]

তথ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায় যে, চিরাচিরত হানাফি মতে বিশ্বাসী বাংলাদেশের অনেক মানুষ উনবিংশ শতাব্দীতে এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও ওয়াহাবি মতে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং এদের মধ্যে একটি অংশ জেহাদি মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশ থেকে হিজরত করেছিলেন।[৭] দিনাজপুর-রাজশাহী জেলার তদানীন্তন পুলিশ সুপার মন্তব্য করেন যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান ছিলেন ওয়াহাবিমতে বিশ্বাসী।[৮] এই পরিসংখ্যান যথাযথ বলে মনে হয় না।

মালকা এবং সিতানা উপনিবেশ দুটিতে শিখ-ব্রিটিশ জোটের কাছে ওয়াহাবিরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হলে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের ওপর ওয়াহাবিদের সন্ত্রাসমূলক আচরণ বৃদ্ধি পায়। ওয়াহাবি নেতা আমীর খানের প্রহসনকে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতি স্যার নর্মান এবং লর্ড মেয়ো যথাক্রমে আবদুল্লাহ ও শের আলি নামক ওয়াহাবিদের হাতে নিধন হন। বিচারে দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড হয়। এ

---

৩ *Ibid.*, p. 13.

৪ *Ibid.*, p. 17.

৫ *Ibid.*, p. 19.

৬ *Ibid.*

৭ সৈয়দ শাহেদুল্লাহ তাঁর 'বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত অধ্যায়' (নতুন চিঠি প্রকাশনা, বর্ধমান, ১৯৯০) পুস্তকে উল্লেখ করেন যে তাঁর নিকট আত্মীয়ের একটি অংশ ওয়াহাবি মতবাদে দীক্ষিত হয়ে মদিনাতে হিজরত করেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বিশিষ্ট কৃষক নেতা আবুদল্লাহ্ রসুল বলেন যে বর্ধমান জেলার মেমারীর কেজাগ্রামের তাঁর নানা হানাফী পীর ছিলেন। কিন্তু তাঁর মামা ওয়াহাবি হয়ে যান এবং পিতার মাজার ভেঙে ফেলেন। এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান প্রাবন্ধিককে বক্তা এ কথা বলেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা যায় আকরম খাঁ-এর নেতৃত্বে ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানার হাকিমপুরে গ্রামের এক বিশাল সংখ্যক জনসংখ্যা ওয়াহাবি দীক্ষায় দীক্ষিত হন। vide, *IB file 34/22, Weekly Confidential Report*, dt. 24.06.22.

৮ *IB File, 6/1906, op. cit.* p. 21

সময়ে ওয়াহাবিদের প্রতি জুলুম, নির্যাতন, দীপান্তর প্রভৃতি কঠোরভাবে আরোপিত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিপাহি বিদ্রোহে ওয়াহাবিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক ওয়াহাবিদের ব্রিটিশ বিরোধিতা তেমনভাবে নজরে পড়ে না। এর অন্যতম কারণ হলো স্যার সৈয়দ আহমদ, ভূপালের বেগম এবং অন্যান্য ব্রিটিশ অনুরক্ত মুসলমান নেতৃবৃন্দ ওয়াহাবিদের জেহাদি সন্ত্রাসী আচরণ নিষ্ক্রিয় করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ওয়াহাবি আন্দোলন জাতীয় সমস্যার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে নবরূপ ধারণ করে। মৌলভী বিলায়েত আলির পুত্র মৌলভী আবদুল্লাহ মালকা-সিতানা থেকে সরে এসে বাংলাদেশে ওয়াহাবি সংগঠনের ওপর নজরদারি শুরু করেন। একই সাথে আরবের, আপ-কান্ট্রির এবং বিশেষ করে খোরাশানি ওয়াহাবি মৌলভীরা বাংলাদেশের ওয়াহাবি আন্দোলনের জাগরণ ঘটায়।[৯] এই খোরাশানি মৌলভীদের অনেকেই এদেশে বিয়ে করে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন।[১০] বাংলাদেশের নানা স্থানে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক ঘাঁটি স্থাপন করে, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ওয়াহাবি আদর্শকে জনপ্রিয় করে তোলেন। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ওয়াহাবি অধ্যুষিত স্থানগুলি হলো ময়মনসিং জেলার আতিয়া-কাগমারি, পাবনার সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর ও বংশীহারি, রংপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া, মালদহ ও রাজশাহী জেলা, মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘির সন্নিকট হরহরি প্রভৃতি। এছাড়া বীরভূম, বর্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ঢাকা জেলাতেও ওয়াহাবিদের সক্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হলো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনে ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের কোনো ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভূমিকা লক্ষ করা যায়নি। তবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলাদেশের ওয়াহাবিরা গোপনে বিভিন্ন অঞ্চলে লিফলেট বিলি করে কঠোর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং একই সাথে ইসলামের গৌরব ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি কাজে লাগিয়ে জেহাদের পথে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সময়ে বাংলার ওয়াহাবিরা বাংলা, উর্দু, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষায় জেহাদপত্র ছাপিয়ে গোপনে বিলি অথবা প্রয়োজনীয় জায়গায় প্রেরণ করেন। ঐসব জেহাদপত্রের মমার্থ প্রায় একই ধরনের ছিল। একটি জেহাদ পত্রের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো, 'ভাই মোসলেম চিরকাল নিদ্রিত থাকিবে? শত্রু তোমার ঘরে ঢুকিয়া তোমার মান-ইজ্জত, ধন দৌলত লুটিয়া লইয়াছে, বিশ্বাসঘতকতা করিয়া ভারতের সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছে। নবাবের জাত বলিয়া যাহারা একদিন আদবসে ঝুক্‌কে তোমাকে কুর্নিশ করিত, সে আজ তোমাকে কোচমান, সহিস, বাবুর্চি, খানসামা বানাইয়াছে। পদে পদে লাথি-জুতা মারিতেছে আর তোমারা তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিতেছ। ধিক তোমাদের নীচাশয়তায়, ধিক তোমাদের সহ্য গুণের! এতেও তোমাদের আক্কেল হয় না? তোমরা না হজরত রসুলের পদানত। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত না তোমাদের প্রাণ? তোমরা না

---

৯ *Ibid.*, p. 29. একটি তালিকায় প্রকাশিত যে ২২ জন ওয়াহাবি পেশোয়ার খোরশান, রাওয়ালপিণ্ডি, দেওবন্দ, সওয়াট, দিল্লি, বেনারস, লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী ছিলেন কিন্তু তারা বাংলায় ওয়াহাবিবাদকে শক্তিশালী করার জন্য নিয়মিতভাবে বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাবলিগ করতেন।

১০.মৌলভী আবু বাকির মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তিনি বিয়ে করে পাকাপাকিভাবে রাজশাহী শহরে বসবাস শুরু করেন। এরকম অনেক বিদেশি মৌলভী বাংলাদেশে অবস্থানের কথা জানা যায়। সৈয়দ মুস্তাফা আহমদ নামে জনৈক মদিনাবাসী বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিন-চার বছর অন্তর বাংলাদেশে আসতেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁর অসংখ্য মুরিদ ছিল। খেলাফত আন্দোলনের সময় তিনি জনপ্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। vide, *IB File 34/22, Bengal Police Abstract*, dt. 01.04.1922.

১১ *op. cit. Movement among the Wahabis*. p. 23.

আলহামদো লিল্লাহ বলিয়াছ ? তবে কোন প্রাণে আজ রুমের দুশমন ইংরাজের সহিত মোহব্বতে বাস করিতেছ? তোমরা না বলিয়াছ মিনাশ শয়তানের রাজিম? তবে শয়তানের পয়দা হারামখোরদিগকে সেলাম দাও কি করিয়া?...ইত্যাদি।'[১২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের ওয়াহাবিদের মধ্যে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। জাতীয় রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো রাওলাট বিল, জালিওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, ১৯১৯ সালের শান্তি উৎসব (Peace Celebration), খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রগুলো হলো গ্রিস কর্তৃক তুরস্ক আক্রমণ, গ্রিসের বিরুদ্ধে তুরস্কের সামরিক জয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় ও ব্রিটেন কর্তৃক সেভার্স এর অবমাননাকর চুক্তির মাধ্যমে খলিফার মর্যাদাহানি, তুরস্কের কামাল পাশার উত্থান, খলিফাতন্ত্রের পরিণতি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এসব ঘটনা বাংলাদেশের ওয়াহাবি সমাজকে বিচলিত, বিব্রত, জেহাদি ও রাজনৈতিক তৎপর করে তুলেছিল। বাংলাদেশের ওয়াহাবিদের এহেন রাজনৈতিক সচেতনতা এদশের ইতিহাসে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

রাজশাহী জেলা ছিল বাংলাদেশের ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান। উপরোক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলির পক্ষে-বিপক্ষে রাজশাহী জেলার ওয়াহাবিদের মন-মানসকিতার প্রতিফলন কি ছিল এবং তাদের আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়কে কতখানি নৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে স্পর্শ করতে পেরেছিল তা যথা পরিসরে আলোচিত হলো।

রাজশাহী জেলায় ওয়াহাবি আন্দোলন

রাজশাহী জেলার ওয়াহাবি নেতাদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক ব্রিটিশ বিরোধী নানা ঘটনাপ্রবাহে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন পবা থানার দুয়ারী মাদ্রাসার মৌলভী আকরম আলি। সেদিনের তাঁর প্রয়াস ছিল ইতিহাসসমৃদ্ধ। এছাড়া পবা থানার মৌলভী মুহাম্মদ ইউসুফ, মৌলভী আবদুল মজীদ, মৌলভী মুহাম্মদ ময়েজউদ্দিন (সকলেই সপুরা গ্রামের) হাজী লাল মুহাম্মদ (কাজিরগঞ্জ), নাজির মির্জা (হরিয়ান) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। মৌলভী মুহাম্মদ জাকারিয়া এবং মৌলভী মুহাম্মদ ছিলেন পুঠিয়া থানার জামিরা গ্রামের অধিবাসী। গোদাগাড়ি থানায় সবিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন মৌলভী মুহাম্মদ আলি সরকার (২৪ নগর), হাজী আবদুল জব্বার (পাঁচগাছি), মৌলভী মুহাম্মদ ফায়েজউদ্দিন ও মৌলভী সদরউদ্দিন (শীতলাই), মৌলভী মুহাম্মদ সিদ্দিক, মৌলভী আবদুল আজীম, মৌলভী আবদুস সামাদ, ও মৌলভী ইদ্রিস আলি (সকলেই বাসুদেবপুর) এবং পাকরি গ্রামের মৌলভী নাজির হোসেন। বাগমারা থানার জুগিপাড়া গ্রামের মৌলভী মুজাফফর আহমদের প্রভাব ছিল সুবিদত। এছাড়া, আকবর হোসেন (মাসিন্দা), মৌলভী আবদুর রাজ্জাক (নওগাঁ), মৌলভী ইয়াকুব আলি (চারঘাট), পবা থানার কুপকন্দি গ্রামের মৌলভী জিন্নাতউল্লাহ, মোহনপুর থানার সাঁকোয়া গ্রামের মৌলভী মুহাম্মদ নয়াতুল্লা, মৌলভী মফিজউদ্দিন (নারায়ণপুর), মৌলভী আবদুর রউফ (সরদা), মৌলভী কলিমুদ্দিন (তালাইমারী), মৌলভী আবদুল মান্নান, মৌলভী আবদুল লতিফ, মৌলভী সাজ্জাদ আলি (সকলেই রাজশাহী শহর), মৌলভী আমিনউদ্দিন (রাজশাহী মাদ্রাসা) মৌলভী আবু বাকির (মক্কা, পরে স্থায়ীভাবে রাজশাহী শহরে বসবাস করেন) প্রভৃতিরা সক্রিয় উদ্দীপ্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন।

---

১২ Leaflet, Jehed.

পবা থানার দুয়ারী অধিবাসী মৌলভী আকরম আলি শুধু রাজশাহী জেলাতেই নয়, সমগ্র বাংলাদেশের ওয়াহাবি সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন প্রখর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ওয়াহাবি সরদার। তিনি 'নাসারাতুল ইসলাম' বা ইসলামের বিজয় নামে বাংলায় একটি নাতি দীর্ঘ বই লেখেন। বইটি পয়ার ছন্দে লিখিত। নাসারা বা খ্রিস্টান শাসক কিভাবে এদেশের ইসলামের ধর্ম ও ঐতিহ্যকে কলুষিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার বিবরণ বইটির ছত্রে ছত্রে তুলে ধরা হয়েছে।[১৩] তিনি এই বই ছাপিয়ে গোপনে ওয়াহাবিদের মধ্যে বিতরণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য ওয়াহাবি অধ্যুষিত বীরভূম জেলার নলহাটিতে ছাপানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সরকারের নজরদারি ও প্রেস আইনের কোপানলে পড়তে কেউ রাজি হননি। ১৯২২ সাল পর্যন্ত বইটি প্রকাশিত হয়নি।[১৪] নাসারাদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি ছত্র পেশ করলে সহজেই বোঝা যাবে। তাঁর কাছে জেহাদ হলো 'আল-জেহাদো মাহুননো' অর্থাৎ জেহাদের কখনও পরিসমাপ্তি ঘটে না। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নিরন্তর জেহাদ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, সকল প্রকার সহযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার নির্দেশ দেন। বাড়ির দুজন লোক থাকলে একজনকে জেহাদের পথে নামার নির্দেশ দেন। এবং এজন্য মৌলভী-মাওলানাদের এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। তিনি বলে, নাসারা যখন তোমার কোরআন মানে না তখন কেন তুমি তাদের হুকুম মানবে? যদি কোরআন পড়ে জেহাদের সঙ্গি হওয়া যায় তাহলে হজরত মুহাম্মদও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তরবারির সাহায্যেই ইসলামকে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। জেহাদের পথে ধনদান ও জীবনদান করলে আখেরাতে নিরন্তর সুখ পাওয়া যাবে, ইত্যাদি।' অর্থাৎ তাঁর মূল বক্তব্য ছিল স্বদেশ ও স্বধর্মের জন্য নাসারাদের বিরুদ্ধে জাগো, ওঠো, তরবারি ধরো।[১৫] মৌলভী আলি আবুল কালাম আজাদের 'জেহাদ ও ইসলাম' এবং 'খুদবা-ই-সদারত', 'আল-উলেমা-ফতোয়া' প্রভৃতি বই উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করে বিলি করার ব্যবস্থা করেন।[১৬] তিনি দুয়ারী মাদ্রাসার দুজন ছাত্র ইব্রাহিম মুন্সি ও গরিবউল্লাহ মুন্সিকে ওয়াহাবি মতের সংবাদপত্র আকরম খাঁ পরিচালিত 'সেবক' কাগজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কলকাতায় পাঠান।[১৭] এতে থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে মৌলভী আলি প্রকাশনা জগতের সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত ছিলেন। মৌলভী আকরম আলির প্রচেষ্টায় দুয়ারী মাদ্রাসা ওয়াহাবি আখড়াতে পরিণত হয়। তিনি মৌলভী বিলায়েত আলির পুত্র মৌলভী আবদুল্লাহর একান্ত শিষ্য ছিলেন। গুরু-শিষ্যের তৎপরতায় রাজশাহী জেলায় জঙ্গি ওয়াহাবিবাদ গড়ে ওঠে। ওয়াহাবি নেতাদের সরদার বলা হতো। মৌলভী আলি জনৈক রহিম বক্সের পর বাংলায় সরদার নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সর্বভারতীয় ওয়াহাবি নেতা নেয়ামত উল্লা জাতীয়তাবাদী নেতা আবুল কালাম আজাদ, হাজী আফজল খান, হসরত মোহানী প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাজশাহী জেলার ওয়াহাবিদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী ছিল এবং এদের মধ্যে অল্প বিস্তর মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল। ওয়াহাবিদের একদিকে নেতৃত্ব দিতেন মৌলভী আকরম আলি, অন্যদিকে জামিরা গ্রামের মৌলভী জাকারিয়া। নাটোর মহকুমাতে মৌলভী জাকারিয়ার প্রভাব

---

১৩ *IB File, 54/22,* Nasaratul Islam.

১৪ *Ibid.*

১৫ *Ibid.*

১৬ *IB File, 34/22, DIB Report Rajshahi & Dinajpur Dist.* dt. 05.08.1922.

১৭ *Ibid., BPA,* dt. 22.04.22.

ছিল লক্ষণীয়; পক্ষান্তরে মৌলভী আকরম আলির প্রাধান্য ছিল রাজশাহী জেলার বাইরে ও ভিতরে । জাকারিয়া তাঁর শিষ্যদের বলতেন যে, খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে প্রকাশ্যে জেহাদি মনোভাব নিয়ে যোগ দেওয়ার দরকার নেই, বরং পাঁচ বার নামাজ কায়েম করার পর খলিফার মুক্তি কামনা করো। অন্যদিকে আকরম আলি প্রকাশ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতা করার জন্য খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য উদাত্ত আহ্বান করেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় পার্থক্য হলো যে মৌলভী আকরম আলি ও তাঁর অনুসারীরা মনে করতেন যে, মৌলভী সৈয়দ আহমদ যুদ্ধে মারা যাননি। বরং তিনি খোরাশান অঞ্চলে আত্মগোপন অবস্থায় মুজাহিদদের ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং একদিন পৃথিবীতে ইমাম মেহদী হিসাবে অবতীর্ণ হয়ে নাসারাদের হারিয়ে পৃথিবী জয় করবেন। মৌলভী জাকারিয়া বিশ্বাস করতেন যে, সৈয়দ আহমদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আকরম আলিরা বলতেন যে সৈয়দ আহমদ ও তাঁর সমর্থিত সরদারদের যারা বিশ্বাস করেন না তারা সত্যিকারের মুসলমান নন। এই সংশয় নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়শই বাহাস হতো। কিন্তু একবার বীরকুৎসা গ্রামে বাহাসে হেরে গিয়ে আকরম আলির দল স্বীকার করে নেয় যে সত্যিকারের মুসলমান হতে গেলে 'সৈয়দ আহমদ মিথ' এবং তাঁর অনুগত সরদারদের মেনে নেওয়া জরুরি অনুষঙ্গ নয়। যাই হোক, এ সকল কারণে জাকারিয়া পন্থীরা খোরাশানি মনোভাবসম্পন্ন আকরমপন্থীদের কৌতুক করে 'পাহাড়িয়া' উপনাম দিয়েছিল।[১৮] উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজশাহী জেলার গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মকর্তারা এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে জাকারিয়া গোষ্ঠীকে আকরম গোষ্ঠী অপেক্ষা অনেক বেশি 'টেকনিকাল ও স্রুড' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।[১৯]

মিত্রশক্তির অন্যতম শরিক ইংল্যান্ড প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জয়ী হয় এবং বিজিত তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে অবমাননাকর চুক্তি সম্পাদন করে। এতে ভারতের মুসলমানরা মর্মাহত হয় কারণ ঐ যুদ্ধে ইংল্যান্ডের সপক্ষে ভারতীয় মুসলমানরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল। হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৫০ হাজার বাঙালি মুসলমান প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ইংল্যান্ডের হয়ে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ-ফেরত সৈন্যরা লক্ষ করলো যে তুরস্কের সুলতান ও খলিফাকে অবমাননা করে ইংরেজরা এদেশে বিজয় দিবস বা শান্তি উৎসব পালন করার জন্য ১৯১৯ সালের ১৩-১৭ নভেম্বর দিন ঘোষণা করে। ঐ চারদিন বিভিন্ন ধরনের আনন্দ-উৎসবের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্বভাবতই বিজয়ী উৎসব পালন করার উদ্যোগ নিলে মুসলমানরা নিজেদের উপহাসের পাত্র বলে ধারণা করলো। তারা ঠিক করল যে, এই উৎসবে তারা সামিল তো হবেই না ররং অ্যান্টি পিস সেলিব্রেশন কমিটি গঠন করে এর বিরোধিতা করবে। এ বিষয়ে তারা অনেক রকমের পুস্তিকা ছাপিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণকে করণীয় কর্তব্য বলে মনে করল। বাংলাদেশের নানা স্থানে পোস্টার মারা হলো। তাতে লেখা হলো, 'মাওলানা আবদুর বারির ফৎওয়া/বিজয় উৎসবে যোগ দান হারাম/মহাত্মা গান্ধীর আদেশ, বিজয় উৎসবে যোগদান মহাপাপ।'[২০] হিন্দুদের সমর্থন পাওয়ার আশায় একটি আবেদনপত্রে বলা হলো 'খলিফাকে রক্ষা করা যেমন মোসলেমের কর্তব্য, তেমনি হিন্দুরও স্বার্থ। উভয়ের স্বার্থ উভয় ধর্মালম্বীকে সম্মিলিত রাখবে।'[২১] ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ হিন্দু নেতা যৌথভাবে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে

---

১৮ *IB File, 34/22, op. cit.*

১৯ *Ibid., BPA,.* dt. 18.02.22.

২০ *IB File*, 472/19 (Postar).

২১ *Ibid.*, রেয়াজউদ্দিন আহমদ ও মোহাম্মদ কাজিম আলি কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট।

বিজয় উৎসবে যোগ না দেওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন।[২২] কিন্তু তা খুব কার্যকর হয়নি। যাই হোক বাংলার মুসলমানরা এই উৎসবকে কিভাবে উপেক্ষা বা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তা ছোট দু-একটি ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা যাবে। নোয়াখালি জেলার হরিশচর রোশনপুর গ্রামের জনৈক অশিক্ষিত আবদুস সামাদ 'জয় সম্রাটের জয়' ধ্বনিরত মিছিলকারী বালকদের হাত থেকে বিজয় উৎসবের ফ্লাগ কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে এবং উপহাস করে বলে 'জয় পাছা মারার জয়' এতে সামাদ অভিযুক্ত হয় এবং বিচারে সামাদকে পাঁচ টাকা জরিমানা দিতে হয় বালকদের।[২৩] একই জেলার সমদমপুর স্কুলের মুসলিম ছাত্ররা হিন্দু ছাত্রদের হাত থেকে বিজয় উৎসবের ফ্লাগ কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে।[২৪] ঐ জেলার চটখিল স্কুলের ছাত্র মুহাম্মদ আলম সহপাঠী মুসলমান ছাত্রদের হাত থেকে উৎসবে দেওয়া মিষ্টান্ন জোর করে ফেলে দিতে বাধ্য করলে তাকে ২৫ টাকা জরিমানা করা হয়।[২৫] বলা বাহুল্য, রাজশাহী জেলাতে মহাত্মা গান্ধীর লিফলেট ও হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত আবেদন লিফলেট হিসাবে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। শান্তি উৎসবে রাজশাহীর ওয়াহাবিরা সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করেছিল তবে কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না।[২৬]

গ্রিস তুরস্ক আক্রমণ করলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ওয়াহাবিদের ন্যায় রাজশাহী জেলার ওয়াহাবিরা তুরস্কের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এ সময়ে দুটি উপায়ে তুরস্ককে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথমত, আঙ্কারা ফান্ড গঠন করা হয়। এতে বায়তুল মাল হিসাবে জেলার নানা স্থানে এজেন্ট মারফত ফিৎরা, মুষ্টিচাল, উশুর, কোরবানির চামড়া, কাফফরা ইত্যাদি খাত থেকে টাকা সংগ্রহ করে তুরস্কে পাঠানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আকরম আলির কালেক্টিং এজেন্টরা যথা পাঁচগাছির আবদুল জব্বার, সাঁকোয়ার নয়াতুল্লা প্রভৃতিরা বিভিন্ন সময়ে টাকা তুলতেন। দুটি পৃথক ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যাবে আঙ্কারা ফান্ড কতটা হৃদয়ে স্পর্শ করেছিল। ২৪ পরগনার বারুইপুরের বাবর আলি শুধু বাড়ি বাড়ি মুষ্টিচাল সংগ্রহ করে চড়া দামে বিক্রি করে দিল্লির আঙ্কায়া ফান্ডে জমা দিতেন।[২৭] ঢাকার ঢোলেশ্বরের জনৈক ইট-সুরকির ব্যবসায়ী হাজার ইট প্রতি চার আনা বেশি সংগ্রহ করে বায়তুল মাল হিসাবে আঙ্কারা ফান্ডে জমা দিতেন।[২৮]

দ্বিতীয়ত, আফগানিস্তানের আসমাস নামক স্থানে ঐ দেশের আমিরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এক জঙ্গি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদরা তুরস্কের সপক্ষে যুদ্ধ করবে। বাংলার ওয়াহাবিরা বিশ্বাস করত যে জেহাদ আসন্ন এবং তাতে ইংরেজরা পরাজিত হয়ে মুসলমানরা ক্ষমতায় আসবে। তারা আরও মনে করত মুজাহিদিন, বলশেভিক এবং আফগানিস্তানের আমীর মিলে যৌথ আক্রমণ ইংরেজদের পতনকে সুনিশ্চিত করবে।[২৯] ওয়াহাবি আদর্শে উদ্দীপ্ত বাংলাদেশের

---

২২ *Ibid.*, (Leaflet).

২৩ *Ibid.*, extract from S. P. Noakhali, confidential report. dt. 17.01.1920.

২৪ *Ibid.*, dt. 03.01.1922.

২৫ *Ibid.*

২৬ রাজশাহী জেলা থেকে অসংখ্য প্রতিবাদী টেলিগ্রাম শান্তি উৎসবের বিরোধিতা করে ডাকযোগে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে ও এদেশে ভাইসরয়কে পাঠানো হয়।

২৭ *IB File 34/22, Weekly Confidential Report, 24 Pgs.* dt. 15.07.1922.

২৮ *Ibid., BPA.* dt. 13.05.1922.

২৯ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার গোপালপুর গ্রামের আকবর আলি ফকিরের ত্রিশ বছর বয়স্ক পুত্র ফরিদউদ্দিন মুন্সি ধৃত অবস্থায় পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে বলেন যে, কাবুল থেকে পাঞ্জাব নিবাসী আবদুর রহমান একটি উর্দু ছাপা পুস্তিকা নিয়ে আসেন যাতে বলা হয় বলশেভিক, আফগান বিদ্রোহী এবং আসমাসের মুজাহিদিন

অসংখ্য যুবক মুজাহিদ হিসাবে আসমাসে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে দুয়ারী মাদ্রাসা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ইচ্ছায় কিংবা এজেন্টের মাধ্যমে আসমাসে প্রশিক্ষণ নেওয়ার একাধিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। গোদাগাড়ি থানার বাসুদেবপুরের গ্রামবাসী নিজেরাই ঠিক করে যে তারা মৌলভী মুহাম্মদ সিদ্দিকিকে আসমাসে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাবে এবং তাঁর সকল খরচাদি বহন করবে।[৩০] মৌলভী আকরম আলির নির্দেশে তানোর থানার সিন্দুরী গ্রামের সারজুতুল্লাহকে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার আখেরিগঞ্জের সাতজনকে আসমাসে পাঠানো হয়। জেলা গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, আসমাসের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য মৌলভী আলি খুবই চিন্তিত ছিলেন। তিনি আসমাসে রিভলভার-পিস্তল সরবরাহের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।[৩১] মৌলভী আলির শিষ্য আবদুল হান্নান গোয়েন্দা দপ্তরের এক প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন যে আসন্ন জেহাদ উপলক্ষে রাজশাহী জেলাতে প্রচুর পরিমাণে বোমা, ছোরা, তরবারি উৎপাদন ও মোতায়েন করা হয়েছে। লালগোলার আবুল কাশেম আসমাসের কঠোর জীবন সহ্য করতে না পেরে পলাতক হিসাবে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। উল্লেখ্য, আসমাস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিচিত্র কর্মকাণ্ড জানা যায় পুলিশের হাতে ধৃত ত্রিপুরার দাউদ কান্দি থানার গোপালপুর গ্রামের আসমাস থেকে পলাতক ফয়েজউদ্দিন মুন্সির জবানবন্দিতে।[৩২]

যে ঘটনায় এদেশের মুসলমান সমাজ সবচেয়ে উদ্বিগ্ন, শোকাহত এবং শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন তা হলো তুরস্কের খলিফা সংক্রান্ত সমস্যা। রাজশাহীর ওয়াহাবি সম্প্রদায়ও তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। এর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন যুক্ত হলে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের যৌথ রাজনীতি অন্য মাত্রা পায়। এই সর্বপ্রথম এদেশের তথা রাজশাহী জেলার ওয়াহাবিরা হিন্দুদের সঙ্গে যৌথভাবে ব্রিটিশ বিরুদ্ধ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। বাংলার ওয়াহাবিদের সঙ্গে রাজশাহীর ওয়াহাবিরাও এই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী এবং স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অজেহাদি অথচ অহিংস রাজনীতিতে আস্থা রেখে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মঞ্চ গড়ে তোলে। জাতীয় স্কুল, খাদিভাণ্ডার, গ্রামপঞ্চায়েত, ন্যায়বিচারালয় প্রভৃতি গঠনে রাজশাহী জেলার ওয়াহাবিরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। আকরম আলি তাঁর মাদ্রাসায় ছাত্র ও শিক্ষকদের বিশেষ খদ্দর টুপি পরিধান বাধ্যতামূলক করেন। এই নিয়ম তিনি তাঁর জেলার ও বাইরের শিষ্যদের মধ্যে চালু করেন।[৩৩] বেনারস থেকে আগত মৌলভী আবদুল গফ্‌ফার ১৯২২ সালের ২০ জুলাই জেলার নিম্নোক্ত ওয়াহাবি নেতাদের নিয়ে যথা জিননতুল্লাহ, ইদ্রিশ আলি, আবদুস সোবহান, আবদুল জব্বার, সদরউদ্দিন, আবদুল মজীদ প্রভৃতি আকরম আলির বাড়িতে একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হন। সেই বৈঠকে পঞ্চায়েতি আদালত

মিলে শীঘ্রই ভারত আক্রমণ করবে। এ ব্যাপারে আফগানিস্তানের আমীরের পূর্ণ সমর্থন ছিল বলে তিনি ব্যক্ত করেন। Vide. *IB File, 34/22* , p. 200.

৩০ *IB File, 34/22, BPA*, dt. 13.05.1922.

৩১ *Ibid., WCR from ASP, Rajshahi & Dinajpur*, dt. 25.02.1922.

৩২ ফয়েজউদ্দিন মুন্সি পলাকত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়লে আসমাস প্রশিক্ষণকেন্দ্রের বেশ কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, তিনি বলেন যে মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে এভাবে বিভ্রান্ত করে এজেন্টদের মাধ্যমে তিনি আসমাসে পৌছান। পথে এবং স্থানের বিস্তারিত বিবরণ তিনি দেন। তার মতে, আসমাস প্রশিক্ষণ শিবিরের ৬০০/৭০০ মুজাহিদিনের মধ্যে ৪০/৫০ জন হিন্দু এবং ১৬ থেকে ২৬ জন শিখ ছিলেন। সেখানে সবাইকে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে ড্রিল, প্যারেড, বন্দুক-রাইফেল চালানো শিক্ষা দেওয়া হত। তার মতে, কাবুল থেকে ৭০০টি বন্দুক আনা হয়েছিল যা জার্মানি থেকে রপ্তানি করা হয়েছিল। সেখানে তিনটি কামান ছিল বলে তিনি ব্যক্ত করেন। তার মতে, ১৫০ জন হিন্দু-মুসলমান বাঙালি আসমাস শিবিরে ছিলেন। Vide, *IB File 34/22*.

৩৩ *Ibid., BPA*, dt. 20.05.1922.

গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বলা হয় কোনো প্রকার ধর্মীয় হস্তক্ষেপ না ঘটিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বজায় রাখতে হবে। লক্ষণীয় বিষয় যে জেলার ওয়াহাবিরা ধর্মীয় প্রাধান্য না দিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতি গঠনে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ওপর জোর দেয়।[৩৪] এই সর্বপ্রথম ওয়াহাবিরা অ-ওয়াহাবিদের সঙ্গে এবং বিধর্মীদের সঙ্গে এক মঞ্চে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত মিল দেখিয়ে গণ-আন্দোলনের সামিল হয়। ১৯২২ সালের ২৪ এপ্রিল শীতলাইয়ের মৌলভী মুহাম্মদ ফয়েজউদ্দিন দর্শনাপাড়ার মসজিদে পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, মুসলমান অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবে না সে সত্যিকারের মুসলমান নয়।[৩৫] ঐ বছরের ১লা মে কাজিরগঞ্জের হাজী লাল মুহাম্মদের বাড়িতে এক জলসায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শ্রমিক-মজদুরদের এবং দোকানদারদের এই বলে প্ররোচিত করা হবে, যারা অসহযোগ আন্দোলনের শরিক হবে না তাদের সর্বৈবভাবে এক ঘরে করতে হবে।[৩৬]

বৈশাখ মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত চারঘাট থানার গোপালপুর গ্রামে কালু পীরের মেলায় মিষ্টান্ন বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এলাকার ওয়াহাবিরা ইংল্যান্ড থেকে আনা চিনিতে প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।[৩৭] স্থানীয় ওয়াহাবিরা বিদেশি দ্রব্য সর্বতোভাবে বর্জন করেছিল বলে সরকারি নথি থেকে জানা যায়। বাসুদেবপুরের ওয়াহাবি পীর আবদুস সামাদ ঐ গ্রামের জনৈক ওসমান পণ্ডিতের ছেলের বিয়েতে কাজী হতে রাজি হননি, কারণ তারা বিয়ের ব্যবহারের জন্য ইংল্যান্ডজাত কাপড় কিনেছিলেন। ঐ কাপড় বদল করে স্বদেশি কাপড়াদি ধারণ করলে বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করা হয়।[৩৮] স্বদেশিয়ানার হিড়িকে বাসুদেবপুরের মাদ্রাসা রাতারাতি ন্যাশনাল স্কুলে পরিবর্তিত হয় এবং এ ব্যাপারে আড়াই হাজার টাকা ঐ গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হয়।[৩৯] জনৈক আবদুর রাজ্জাক নওগাঁতে গ্রামবাসীর উষ্ণ সমর্থনে একটি ন্যাশনাল স্কুল স্থাপন করেন।[৪০] গোদাগাড়ির ২৪ নগরের মুহাম্মদ আলি সরকার স্থানীয় ওয়াহাবিদের বিতরণের জন্য সাতটি চরকা কেনেন এবং সুতা কাটা শেখানোর জন্য মুর্শিদাবাদের শাহপুর নিবাসী কুপকান্দি মাদ্রাসার জনৈক আজহার উদ্দিন খানকে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।[৪১] স্মর্তব্য যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে মুসলমান সম্প্রদায় অর্থনৈতিক কারণ দেখিয়ে এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু মাত্র ১৫ বছরের মধ্যেই বাংলার মুসলমানরা স্বদেশিয়ানাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করে।

সরকারি গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে হাজী লাল মুহাম্মদ (কাজিরগঞ্জ), হাজী ইউসুফ (সপুরা), কলিমুদ্দিন (তালাইমারী), মুহাম্মদ ইয়াকুব (খেরেরবোদা,চারঘাট), আসগর হোসেন (মাসিন্দা), নাজির হোসেন (পাকড়ি), মোফিজউদ্দিন (নারায়ণপুর), জিননতুল্লা (কুপকান্দি), আকরম আলি ও ফয়েজউদ্দিন (দুয়ারী), নাজির মির্জা (হরিয়ান) প্রভৃতিরা খিলাফত ও অসহযোগী আন্দোলনের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এদের কাজ ছিল স্বীয় সম্প্রদায়কে খিলাফত ও অসহযোগ সম্বন্ধে ধারণা ও নির্দেশ দেওয়া। নাজির মির্জা স্বদেশিয়ানার কঠোর সমর্থক ছিলেন

---

৩৪ *Ibid.*, dt. 29.07.1922.
৩৫ *Ibid.*, dt. 20.05.1922.
৩৬ *Ibid.*
৩৭ *Ibid.*
৩৮ *Ibid.*, dt. 27.05.1922.
৩৯ *Ibid.*
৪০ *Ibid.*, dt. 05.08.1922.
৪১ *Ibid.*

এবং তার হরিয়ান গ্রামের এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী খদ্দর পরিধান করতেন।[৪২] কোনো বিধিবদ্ধ মিটিং না করে মৌলভী মোয়েজউদ্দিন পবা থানার বাড়িপাতা, দেওপাড়া, বাংলাকান্দর, কদমা, কালীদাসপুর, বানপুর, মহাদেবপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে ঘুরে খিলাফত-অসহযোগের কথা শুনিয়ে বায়তুলমাল স্বরূপ ২৪ মণ ধান চাষীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[৪৩] নারায়ণপুর শেরপাড়া মসজিদে জুম্মার নামাজের পর মৌলভী মোফেজউদ্দিন চরকার প্রবর্তন, বিদেশি দ্রব্য বর্জন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।[৪৪] মাসিন্দার আসগর হোসেন এবং মৌলভী জাকারিয়া জুম্মার সভায় বলেন যে, এখন মুসলমানদের পক্ষে বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার হারাম। আকরম আলি মৌলভী সাজ্জাদ আলিকে দিয়ে রাজশাহী শহরে ঘর ভাড়া করে একটি স্বদেশি কাপড়ের দোকান খুলে দেন।[৪৫] খেলাফত উপলক্ষে তানোর থানার ইসুগোলা গ্রামের ১৫ মার্চ ১৯২২ অনুষ্ঠিত বিশাল জলসা উপলক্ষে স্থানীয়ভাবে ৭০ মণ চাল সংগ্রহ করা হয় জলসা মজলিসের লোকদের খাওয়ানোর জন্য। এ থেকে অনুমান করা যায় ওইদিন কত লোক হাজির করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাকড়ির নাজির হোসেন মুসলমানদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বদেশি ধারণ, বিদেশি বর্জন ও সরকারি অফিস, কোর্ট-কাছারি প্রভৃতি বর্জনের জন্য অনুরোধ করেন।

গ্রিসের বিরুদ্ধে কামাল পাশার নাটকীয় জয় এবং মিত্র শক্তির কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে গিয়ে তুরস্কের সুলতানের অবমাননাকর সেভরেস চুক্তি সম্পাদন মুসলিম জগতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এতদিন এদেশের ওয়াহাবি কামাল পাশাকে নেজাদের আমিরের শত্রু বলে গণ্য করতেন। কিন্তু গ্রিসের বিরুদ্ধে তাঁর জয় লাভের পর সেই ধারণা রাতারাতি পাল্টে যায়। বারহারোয়ায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ওয়াহাবি সম্মেলনে রাজশাহী জেলা থেকে মৌলভী ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় (২১-১১-২২) স্থির হয় যে কামাল পাশা যেহেতু নিজ ধর্মের জন্য নাসারাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং ওয়াহাবিদের প্রয়োজন মতো সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সুতরাং তাঁকে সমর্থন না করার কোনো প্রশ্ন নেই। কিছুদিনের মধ্যে কামাল পাশা ও তুরস্কের সুলতানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ওয়াহাবিরা দুশ্চিন্তা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ এই সময় পদচ্যুত সুলতান ব্রিটিশদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। কাকে তারা সমর্থন করবেন? কামাল পাশাকে না তুরস্কের সুলতানকে? প্রথমে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও আস্তে আস্তে লক্ষ করা গেল তুরস্কের সুলতান ওয়াহাবিদের জনসমর্থন হারিয়েছিলেন এবং কামাল পাশা অভূতপূর্ব গণ সমর্থন লাভ করেছিলেন। ওয়াহাবিরা অনুধাবন করেছিলেন ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম পাশার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। ফলে মসজিদে মসজিদে খুৎবার সময়ে সুলতানের পরিবর্তে পাশার নাম উচ্চারিত হয়। রাজশাহীর ওয়াহাবি সরদার আকরম আলি স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন 'পাশার পাশে সবাই আছে, সুলতানের পাশে কেউ নেই।' তিনি পাশার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অফ আঙ্কারার সাহায্যে সুলতানের পদচ্যুতি ঘটানোর ঘটনাকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৪৬] আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা প্রমাণিত হয় যে এদেশীয় ওয়াহাবিরা কঠোর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব বজায় রাখতে ব্রিটিশদের মিত্রদের বিরুদ্ধে সর্বদা আস্থা হারিয়ে ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানের রূপান্তর ঘটিয়ে ছিল।

---

৪২ *Ibid.*

৪৩ *Ibid.*, dt. 18.02.1922.

৪৪ *Ibid.*, dt. 08.03.1922.

৪৫ *Ibid.*, dt. 13.03.1922.

৪৬ *IB File*, 362/22, *Attitude of Bengal Moslems in Regard to the Deposition of the Sultan of Turkey*, *WCR*, dt. 11.11.1922.

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে রাজশাহী জেলার মুসলমান জনসংখ্যা ৭০ শতাংশের বেশি ছিল। তার মধ্যে ওয়াহাবিদের সংখ্যা কত ছিল তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও জেলার সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণে তাদের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রথমত, ওয়াহাবিরা কঠোর ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা পোষণ করতো। ফলে তারা সর্বদাই ব্রিটিশ বিরোধী দলে অবস্থান করতো। দ্বিতীয়ত, তারা যতটা আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে বিচলিত ছিল, জাতীয় সমস্যা ততটা তাদেরকে বিচলিত করতে পারেনি। তৃতীয়ত, ওয়াহাবিদের মধ্যে যতটা ধর্মীয়-রাজনৈতিক চেতনা লক্ষ করা যায়, আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তারা বিমুখ ছিল। চতুর্থত, বাংলাদেশে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগ সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল থাকলেও এদেশের জনমানসে ওয়াহাবি ফারায়েজি বা হঠাৎ সংঘটিত খেলাফত কমিটি বা নিদেনপক্ষে বিভিন্ন ধরনের আঞ্জুমান যে রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সামাজিক তৎপরতা দেখাতে পেরেছিল মুসলিম পরিচালিত কোনো বিশুদ্ধ রাজনৈতিক দল তা দেখাতে সক্ষম হয়নি। শেষত, ১৯২৫ সালের পর বাংলাদেশের ওয়াহাবিরা নানাবিধ কারণে ক্রমশ সক্রিয়তা হারাতে শুরু করে। অনেক আশা জাগিয়ে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সিদ্ধান্ত অকার্যকর এবং চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল মৃত্যু ঘটলে, নিজেদের ভাঙা হাল ধরতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে নানা প্রকারের রাজনৈতিক দল ও মঞ্চ গড়েন। সেই ভাঙা-গড়ার স্রোতে ভারতীয় মুসলিম লীগ নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলীয়ান হতে থাকে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

রাজশাহীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : নাটোরকেন্দ্রিক কর্মীব্যক্তিত্বের ভূমিকা

এম. মকসুদুর রহমান*

Abstract: At the inception the district headquarters of Rajshahi was at Natore. The foundation stone of Rajshahi was laid in 1825. After the foundation of *Rajbari* at Natore in 1706 it gained utmost importance and almost all the landed gentries and other dignitaries started to inhabit at Natore. After the transfer of district headquarters from Natore to Rajshahi the *Rajas, Zamindars* and other important people used to go to Rajshahi for administrative and other purposes. Rajshahi was created as a modern city by them. In this article the author explores the contribution of the people of Natore to build up educational institutions, roads, bridges, museum, charitable dispensaries and hospitals, libraries, parks, local overnments, cultural institutions, etc. at Rajshahi.

ভূমিকা

সমগ্র সুবে বাংলার মধ্যে রাজশাহী ছিল একটি উল্লেখযোগ্য জেলা। বর্তমান রাজশাহী মাত্র ৮৪৯ বর্গমাইলের ক্ষুদ্র একটি জেলা হলেও পূর্বে এর আয়তন ছিল ১২,৯৯৯ বর্গমাইল। ১৮২৫ সালের পূর্বে রাজশাহীর সদর দপ্তর ছিল নাটোরে।[১] রাজশাহী জেলার ব্যাপক আয়তনের কারণে একে 'রাজশাহী রাজ্য'ও বলা হতো। এই বিশাল আয়তনের রাজশাহীর স্বনামখ্যাত জমিদার ছিলেন নাটোরের রাজন্যবর্গ। নাটোর রাজের মধ্যে মহারানী ভবানীর নাম আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী থেকে ভূভাগকে বিচ্ছিন্ন করে গঠন করা হয়েছে অন্য সব জেলা। ১৭৭৬ সালে রাজশাহীর আয়তন ছিল ১২,৯৯৯ বর্গমাইল, ১৭৮৬ সালে-১২,৯০৯, ১৮৯১ সালে-২,৩৩০, ১৮৯৭ সালে ২৪৯৮, ১৯৮১ সালে ৩৬৫৩ এবং ১৯৮৩ সালে এর আয়তন ছিল ৮৪৯ বর্গমাইল। ব্যাপক আয়তন বিশিষ্ট প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না বলে সরকার রাজশাহী জেলাকে ভেঙে নতুন নতুন জেলার জন্ম দেয়। ১৭৯৩ সালে 'নিজ চাকলা রাজশাহী'র পদ্মার পশ্চিমভাগের অংশের মধ্যে থেকে সৃষ্টি করা হয় মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ও বীরভূম জেলা। ১৮১৩ সালে রহনপুর ও চাঁপাই থানাকে রাজশাহী জেলা থেকে পৃথক করে পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে মালদহ জেলা গঠন

---

* ড. এম. মকসুদুর রহমান: প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] K.C. Mitra, "Rajas of Rajshahi", *The Calcutta Review 1873* (Calcutta: W.H. Corry and Co., 1873), Vol. 56, p.24.) কে.সি. মিত্র নব্য সৃষ্ট নাটোর মহকুমার ১৮৫০ সালে এস.ডি.ও. ছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালি মহকুমা প্রশাসক। তিনি 'আলালের ঘরে দুলাল'-এর লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের ছোট ভাই। দীঘাপতিয়া রাজা স্কুলে (১৮৫২) উদ্বোধনী ভাষণ দেন। রাজশাহীর পি.এন. গার্লস স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলকাতায় গড়ে ওঠে সুহৃদ সমিতি। এতদঞ্চলের রাজাদের সম্পর্কে তিনি প্রথম তথ্যপূর্ণ লেখা লেখেন এবং তা ক্যালকাটা গেজেটে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

করা হয়। ১৮২১ সালে আদমদীঘি, নঘিলা, শেরপুর এবং বগুড়া থানা রাজশাহী থেকে পৃথক করে রংপুর জেলার দুটি এবং দিনাজপুরের ৩টি থানার সমন্বয়ে গঠন করা হয় বগুড়া জেলা। এমনিভাবে ১৮৩২ সালে শাহজাদপুর, ঘেতুরপাড়া, রায়গঞ্জ, মাথুরা ও পাবনা রাজশাহী থেকে পৃথক করে যশোর জেলার ৪টির থানার সাথে যুক্ত করে গঠন করা হয় পাবনা জেলা।[২] ১৯৪৭ সালে রাজশাহী ও যশোরের অংশ নিয়ে গঠিত হয় কুষ্টিয়া। এরশাদ সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করার পর ১৯৮২ সালে জেলার আয়তন বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং এখনও একই আয়তন বহাল আছে। নাটোরে হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হলেও জেলাটি রাজশাহী নামেই পরিচিত ছিল। ১৮২৫ সালে নাটোর থেকে রামপুর বোয়ালিয়াতে স্থানান্তর করা হয় এবং তখন থেকে সদর দপ্তর এখানেই আছে। নাটোর থেকে সদর দপ্তর রাজশাহীতে স্থানান্তরের প্রধান কারণ, নাটোর ছিল একটি বিলময় অঞ্চল। বিলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইতিহাসখ্যাত চলন বিল, হালতির বিল, মানতির বিল, হিয়ালা বিল ও তেলির বিল। নাটোরের চারিদিকে সবসময়ে জলাবদ্ধতা লেগে থাকতো। এক সময়ে নারোদ নদের মুখ বন্ধ হয়ে গেলে অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়ে ওঠে। শহরের অন্যতম সমস্যা ছিল বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব। ভালো ড্রেন ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশনের কোনো সহজ পথ না থাকায় স্থানটি দূষিত হয়ে ওঠে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নাটোরে অবস্থিত জেলা প্রশাসক মি. প্রিংগল জেলা সদর স্থানান্তরের জন্য ১৮২২ সালের ২৩ এপ্রিল রিপোর্ট প্রদান করেন এবং সে অনুসারে ১৯২৫ সালে রামপুর বোয়ালিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। অন্য কারণগুলো হলো, রামপুর বোয়ালিয়া ছিল পদ্মা নদীর কূলে অবস্থিত যা ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ছিল অনুকূল। সে কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ডাসগণ এখানে কুঠি স্থাপন করেন। কুঠিটি বড়কুঠি নামে খ্যাত এবং বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীন। ১৮২৫ সালের পর রাজশাহীতে গড়ে ওঠে স্কুল, কলেজ-জেলখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। ক্রমে ক্রমে স্থানটি শহরে পরিণত হতে থাকে এবং সরকারের নজরে পড়ে। সে কারণে ১৮৭৬ সালে পৌরসভা ঘোষণা করা হয়। এমনিভাবে রাজশাহীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।[৩] 'রাজশাহী' নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন কথা ছড়িয়ে আছে। কেউ কেউ বলেছেন, বহু রাজা মহারাজার স্থান ছিল জন্য এটি রাজশাহী নামে পরিচিত। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, রাজা ছিলেন শাহ বংশীয়, তাই এর নাম হয় রাজশাহী। এইচ.বেভারেজ এই মত সমর্থন করেন।[৪] এতদঞ্চলের মধ্যে রাজশাহী একটি উল্লেখযোগ্য জেলা এবং বিভাগীয় শহর। রাজশাহীতে আছে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী কলেজ, বরেন্দ্র জাদুঘর, সেরিকালচার, মেডিক্যাল কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো বরেন্দ্র অঞ্চল তথা সমগ্র দেশের গৌরবের বিষয়। সময়ে সময়ে বহু মনীষী রাজশাহীর গৌরব বর্ধন করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে মূল আলোচনার বিষয় হলো রাজশাহীর উন্নয়নে নাটোরবাসীর ভূমিকা কি তা পর্যালোচনা করা। এক সময়ে আজকের নাটোর জেলা বৃহত্তর রাজশাহী জেলার একটি মহকুমা ছিল। সে কারণে এর ইতিহাস-ঐতিহ্যের মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক। এ সকল দিকের প্রতি নজর রেখে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে।

---

[২] W.W. Hunter, *Statistical Accounts of Bengal* (London: Trubner and Co. Ltd., 1873), Vol. III, pp.20-21.

[৩] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, M.K.U. Molla, "The Growth and Development of Rajshahi Municipal Town", in S.A. Akanda ed., *The District of Rajshahi: Its Past and Present* (Rajshahi: IBS, 1983), pp.137-140.

[৪] H. Vereridge, "The Original Rajah of Rajshahyei: A Forgotten Episode in the History"

শিক্ষা : রাজশাহীকে বলা হয় শিক্ষা নগরী। বক্তব্যটি যথার্থ, কেননা এখানে অবস্থিত সমগ্র দেশের গৌরব–রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। এতদঞ্চলের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল অন্যতম। ১৮২৫ সালে নাটোর থেকে রামপুর বোয়ালিয়াতে সদর দপ্তর উঠে আসাতে রাজশাহীর খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। অত্র অঞ্চলের সকল রাজা- মহারাজা-জমিদার রাজশাহী বসবাস করতে আরম্ভ করেন। সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্তই তারা রাজশাহী আগমন করেন। নিজেদের সন্তানদের লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি উন্নত মানের স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং এর সূত্র ধরে ১৮২৮ সালে স্থাপিত হয় 'বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল'।[৫] উল্লেখ থাকে যে, ১৮২৮ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর নানা কারণে ২ বছরের মাথায় বন্ধ হয়ে যায়। ঋণ শোধ করার জন্য আসবাবপত্র ও স্কুল ঘর বন্ধক রাখা হয়।[৬] কিন্তু ১৮৩৫ সালে অ্যাডাম্সের শিক্ষা কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর ১৮৩৬ সালে তা আবার সরকারি উদ্যোগে চালু করা হয়। অ্যাডাম্স প্রতিবেদন তৈরির জন্য ১৮৩৫ সালে রাজশাহী আসেন। রাজশাহী থেকে তিনি সরাসরি নাটোর ও কলম গ্রামে গমন করেন। তখন নাটোর ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত স্থান। তিনি রানী ভবানী (১৭১৫-১৮০২) কর্তৃক স্থাপিত টোলের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৭] উক্ত রিপোর্টে স্কুলটি চালু করার জন্য জোর সুপারিশ করা হয়।[৮] দিঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামের (১৬৮০-১৭৬০) পৌত্র (প্রাণনাথের ছেলে) প্রসন্ননাথ রায় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো ডিগ্রি লাভ করতে পারেননি।[৯] ধারণা করা যায়, তিনি ১৮৩৬-৪০ সালের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৫৮ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, ১৮৪৯ সালে যে পাকা দালান নির্মিত হয় তার অধিকাংশ দান ছিল স্থানীয় রাজা-জমিদারদের। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ রায় (১৮২৬-১৮৬১) ১০০০ টাকা এবং নাটোরের রাজা আনন্দনাথ রায় (মৃত্যু ১৮৬৬) ৫০০ টাকা দান করেন। স্কুল ভবনটি পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হলে ১৮৬২ সালে তা বর্তমান স্থানে নির্মাণ করা হয়। ভবনটি নির্মাণেও নাটোর ও দিঘাপতিয়ার রাজারা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।[১০] অধিকাংশ দান করেন পুঠিয়ার রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় ও তাঁর স্ত্রী রানী শরৎ সুন্দরী দেবী। রাজা প্রমথনাথ রায় (১৮৪৯-১৮৮৩) স্কুল পরিচালনা কমিটির সাথে বহু দিন পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। তিনি স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে প্রাইজ প্রদানের পরিকল্পনা নেন এবং সে অনুসারে বৎসরে ১০০ টাকা প্রদান করতেন। তাঁর

---

[৫] Md. Nurun Nabi, "Growth and Development of English Education in Rajshahi-1828-1917", in S.A. Akanda (ed.), *The District of Rajshahi–Its Past and Present*, p.377.

General Report on Public Instruction in the Lower Provice of Bengal Presidency for the Year 1936 (Calcutta: Baptist Mission Press, 1873), p.149. (It was known as the D.P.I. Report.)

[৭] *The First Report on the State of Education in Bengal–1835(Adam's Report)* (Calcutta: Bengal Military Orphan Press, 1835), pp.116-118.

[৮] Nurun Nabi, p.377.

[৯] কালিনাথ চৌধুরী, *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (কলিকাতা: ইস্কুল বুক প্রেস, ১৩০৮), পৃ. ২০৫। (কালিনাথ চৌধুরী রাজশাহীর একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। পেশায় ছিলেন স্কুল পরিদর্শক। রাজা-মহারাজাদের সাথে তার ছিল অবাধ ওঠাবসা। ১৮৮৬ সালের রাজশাহী জেলা বোর্ডের তিনি ছিলেন একজন নির্বাচিত সদস্য।)

[১০] Md. Nurun Nabi, "Beginning of English Education in Rajshahi Town: A Case of Boalia School (1828-1872)", *Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, 1981, Vol.V, p.22.

দেয় পুরস্কারটির নাম ছিল 'রাজা প্রমথনাথ রায় প্রাইজ'।[১১] ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিতে লেখাপড়া করেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ। স্কুলটির গৌরব বর্ধনে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে রাজা প্রসন্ননাথ, রাজকুমার সরকার, যদুনাথ সরকার, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, চয়েন উদ্দিন আহমদ, আশরাফ আলী খান চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁরা নাটোরের গৌরব। নাটোরের সিংড়া থানার করচমারিয়া গ্রামের জমিদার রাজকুমার সরকার (১৮৩৯-১৯১৪) ১৮৫৭ সালে এই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন। রাজশাহীর রানী বাজারে ২ বিঘা জমির উপর নির্মিত 'সরকার ভবনে' থেকে তিনি লেখাপড়া করতেন। রাজকুমার সরকারের পুত্র প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারও (১৮৭০-১৯৫৮) 'সরকার ভবনে' থেকে কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া করতেন। আট বছর বয়সে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করান হয়। পরে তিনি কলিকাতায় গমন করেন এবং ২ বছর অবস্থান করার পর পুনরায় কলেজিয়েট স্কুলে ফিরে আসেন। তিনি ১৮৮৭ সালে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস এবং প্রথম গ্রেডের বৃত্তি লাভ করেন। সে বছর সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনি ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেন। তাঁর খাতাগুলো কলকাতা জাদুঘরে এখনও সংরক্ষিত আছে।[১২] নাটোরের আর একজন কৃতি সন্তান জনাব চয়েন উদ্দিন (চিফ সেক্রেটারি অফ বেঙ্গল) এই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮-১৯২৬) ছিলেন একজন সাহিত্য প্রেমিক। তিনি ১৮৭৯ সালে এই স্কুলে ভর্তি হন। মহারাজা অধ্যয়নকালে নিজস্ব দ্বিতল বাসভবনের থাকতেন। পরবর্তী কালে বাসভবনটি কমিশনার অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বর্তমানে উক্ত জমির ওপর নির্মিত হয়েছে বরেন্দ্র কলেজ। স্কুলের স্বনামখ্যাত শিক্ষক লোকনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীনাথ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি লেখাপড়া করতেন। তিনি ১৮৮৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন।[১৩] আশরাফ আলী খান চৌধুরী (১৮৭৮-১৯৪১) (বাংলার ডেপুটি স্পিকার), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) প্রমুখ এই স্কুলে অধ্যয়ন করেছেন। নাটোরের আশরাফ আলী খান চৌধুরী কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময়ে হেতেম খাঁ মহল্লার 'চৌধুরী বাড়ীতে' থাকতেন।[১৪]

কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম নাম ছিল 'বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল' এবং ১৮৭৩ সালে নামকরণ হয় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল। এর দুটি অংশ ছিল যথা: স্কুল শাখা ও কলেজ শাখা। পরে 'রাজশাহী কলেজ' হলে ফাস্ট আর্টস্ সেখানে পড়ানো হতো। এই স্কুলটি ১৮৭৩ সালে দ্বিতীয় এবং ১৮৭৮ সালে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করে।

রাজশাহী কলেজের ছাত্র সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে আছেন। স্থানীয় জমিদারদের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠাতেই প্রথমে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমে যাঁদের আর্থিক সহায়তায় কলেজটি ১৮৭৩ সালে স্থাপিত হয় তাঁদের মধ্যে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১,৫০,০০০.০০ টাকা দান করেন। তাঁর দানেই মূল ভবন নির্মিত হয়। ভবনটির উপরে গ্রিসের জ্ঞানদেবী মিনার্ভার মূর্তি স্থাপিত ছিল। এটা বহুকাল যাবৎ প্রশাসনিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তিনি এম.এ. পাঠরত ছাত্রদের মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি ধার্য করেছিলেন। রাজা হিন্দু ছাত্রদের

---

[১১] *Ibid.* pp.32-33.

[১২] কাজী মোহাম্মদ মেছের, *রাজশাহীর ইতিহাস* (ঢাকা: আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৬৫), পৃ. ১১০। (কাজী মোহাম্মদ মেছের রাজশাহী লোকনাথ হাই স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাজশাহী ও বগুড়ার ইতিহাস রচনা করে এতদঞ্চলের জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন)।

[১৩] মোঃ আতাউর রহমান,'মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায়', মোঃ মকসুদুর রহমান (সম্পাদিত), *নাটোরের গৌরব* (রাজশাহী: জিশা প্রিন্টার্স, ১৯৮৯) পৃ. ৪৯।

[১৪] কামরুন রহমান, "ব্যারিস্টার আশরাফ আলী খান চৌধুরীর জীবন ও কর্ম", মোঃ মকসুদুর রহমান (সম্পাদিত), *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ১২৪ (সে সময়ে ধনবারিয়ার নবাব নওয়াব আলী খান চৌধুরীও তাঁর সাথে কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া করতেন)।

জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ করে দেন। নাটোরের মহারাজাও বহু আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন।[১৫] কলেজের উন্নতি সাধনে রাজকুমার সরকারের অবদানও কম নয়।[১৬] রাজশাহী কলেজে কৃষি ইন্সটিউট স্থাপনের জন্য দিঘাপতিয়ার রাজা বসন্তকুমার রায় সরকারকে ১৯৩৩ সালে ৪,৫৩,০০০.০০ টাকা দান করেন। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দান করার জন্য প্রতিষ্ঠানটির নাম দেয়া হয় 'বসন্তকুমার কৃষি ইন্সটিটিউট'। রাজশাহী কলেজের আর্টস বিল্ডিং নির্মাণে তিনি কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। হলটির নাম ছিল 'প্রসন্ননাথ হল'। নাটোরের কাজী আব্দুল মসউদ ১৯৪৩ সালে রাজশাহী কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য মনোনীত হন।

কলেজের সে সময়কালের স্বনামখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে স্যার যদুনাথ সরকার, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, জনাব চয়েন উদ্দিন প্রমুখ প্রধান। জগদিন্দ্রনাথ রায় ১৮৮৭ সালে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। যদুনাথ সরকার সম্মিলিত মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করে এফ.এ. পাস করেন।[১৭] ১৮৯৫ সালে সর্বপ্রথম কলেজ থেকে ২ জন ছাত্রকে এম.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে একজন ছিলেন নাটোরের চয়েন উদ্দিন আহমেদ। তিনি সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে কলেজকে ধন্য করেছেন।[১৮] উপমহাদেশের স্বনামখ্যাত সুসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী ১৯২৭ সালে শান্তিনিকেতন ছেড়ে এসে রাজশাহী কলেজে ইংরেজি সাহিত্য অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন। তিনি কলেজ হোস্টেলে থাকতেন।[১৯]

আদর্শ ও উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য সে সময়ে কোনো প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৮৬৫ সালে বালক পাঠশালায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য একটি ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয় কিন্তু বালিকা স্কুলের শিক্ষকদের এ রকম কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৮৬৯ সালে নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের (মৃত্যু ১২৮২ বাংলা) আর্থিক সহায়তায় বালিকা পাঠশালার শিক্ষয়িত্রীদের জন্য স্থাপিত হয় 'ফিমেল নরম্যাল স্কুল'। কলেজিয়েট স্কুলের পর যে দুটি হাই স্কুল নামকরা ছিল সেগুলো হলো 'ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর হিন্দু একাডেমী' (১৮৯৮) এবং লোকনাথ উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৪৭)। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোনো বিদ্যালয় ছিল না। ১৯২৮ সালে স্থাপিত হয় পি.এন. উচ্চ বিদ্যালয়। স্কুলটির জয়যাত্রা আরম্ভ হয় ১৮৬৮ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে। এর পূর্ব নাম ছিল প্রসন্ননাথ একাডেমী। স্কুলটি উদ্বোধন করার সময়ে নাটোরের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক স্বয়ং রাজশাহী আসেন। সে সময়ে তিনি সুন্দর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।[২০] ঐ বছর দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ রায় (পি.এন.রায়) স্কুলটি পরিচালনার জন্য জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ৬,৩০০.০০ টাকা দান করেন। তৎকালে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন জেলা প্রশাসক মিঃ ই.এইচ. রডক। ১৯২৮ সালে এটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং নামকরণ করা হয় রাজা বাহাদুরের নামানুসারে 'পি.এন. গার্লস স্কুল'। দিঘাপতিয়ার ছোট তরফের রাজা বসন্তকুমার রায় বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ১০,২০০.০০ টাকা দান করেন। রাজা প্রমদানাথও (১৮৭৬-১৯২৫) বহু অর্থ দান করেন। তাঁর ছোট ভাই কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়ও ১০,০০০.০০ টাকা দান করেন। বর্তমানে যে স্থানে স্কুলটি অবস্থিত সে জমি দান করেন দিঘাপতিয়ার রাজাগণ।[২১]

---

[১৫] L.S.S. O'Malley, *District Gazetteer–Rajshahi* (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1916), pp.140-150.

[১৬] মাহবুবর রহমান, "যদুনাথ জীবনকথা" *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ৭৮।

[১৭] এবনে গোলাম সামাদ, *রাজশাহীর ইতিবৃত্ত* (রাজশাহী: দি বেঙ্গল প্রেস, ১৯৯৯), পৃ. ৪৮।

[১৮] কাজী মোহাম্মদ মেছের, পৃ. ১১৫।

[১৯] সুরেশ চন্দ্র মৈত্র, "প্রথমনাথ বিশী : বরেন্দ্রভূমির অনন্য সাহিত্য সাধক" *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ১৫০।

[২০] কালিনাথ চৌধুরী, পৃ. ৮২।

[২১] K.C. Mitra, p. 11.

রাজশাহীর রেশমের নাম সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। ১৭৫৯ সালে হলওয়েল সাহেব এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, সে সময়ে নাটোর থেকে রেশমের কাপড় ইউরোপের বাজারেও রপ্তানি হতো। তখন রাজশাহী বলতে নাটোরকেই বুঝানো হতো। কিন্তু রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৮৯৬ সালে ডায়্যামন্ড জুবিলি ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। স্কুলটি জেলা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হতো। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের তহবিলে নাটোরের মহারাজা ৫০০০.০০ টাকা ও সিংড়া থানার চৌগ্রামের রাজা রমণীকান্ত রায় বাহাদুর ৫০০.০০ টাকা দান করেন। সিংড়ার কলম গ্রামের সন্তান ভুবন মোহন মৈত্র এর জন্য ৩০০০.০০ টাকা দান করেন। তিনি রাজশাহী জজের উকিল ছিলেন।[২২] ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাবিত্রী শিক্ষা বিদ্যালয়। স্কুলের উন্নয়নের জন্য দিঘাপতিয়ার রাজা হেমন্তকুমার রায় এগিয়ে আসেন এবং তাঁর সহায়তায় এটি উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি ভবনটি নিজ টাকায় ক্রয় করার পর স্কুলকে দান করেন। তিনি বিদ্যালয়ের নাম রাখেন 'সাবিত্রী শিক্ষা বিদ্যালয়'।

হাসপাতাল: বরেন্দ্র জাদুঘরের পূর্ব পার্শ্বে যে হাসপাতাল অবস্থিত তার নাম রাজশাহী সদর হাসপাতাল। সেটি নির্মিত হয় নাটোর ও দিঘাপতিয়ার রাজার দানে। ১৮৬৩ সালের পূর্বে রাজশাহীতে তেমন কোনো স্বাস্থ্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না। যেখানে রাজা-জমিদারগণ বাস করতেন সেখানে দাতব্য-চিকিৎসালয় ছিল। রাজশাহীতে তদ্রূপ একটি দাতব্য-চিকিৎসালয়ের অস্তিত্ব ছিল। ১৮৫২ সালে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ রায় হাসপাতাল নির্মাণের নিমিত্ত একখণ্ড জমি ক্রয় এবং সেখানে একতলা বিশিষ্ট একটি দালান নির্মাণ করেন। পরবর্তী সময়ে রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটি ও সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হাসপাতাল স্থাপিত হয়। তারপর রাজা বাহাদুর ১ লক্ষ টাকা দান করেন। সে সময়ে দিঘাপতিয়ায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এ কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাজা বাহাদুর খেতাব প্রদান করে। ১৮৫২ সালের ১৬ই জুলাই তারিখের চিঠিতে গভর্নর জেনারেলের পক্ষে সেক্রেটারি "মহামান্য স্যার" বলে সম্বোধন করে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন। সাথে সাথে অবগত করানো হয় যে, তাঁকে গভর্নর জেনারেল স্বয়ং কলিকাতায় গভর্নর হাউজে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবেন। ১৮৫৪ সালের ২০শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নাটোরের মহকুমা প্রশাসক কে.সি মিত্র ও *নব নারীর* লেখক নীলমণি বসাক উপস্থিত ছিলেন। গভর্নর জেনারেল ডালহৌসি যখন দরবার হলে প্রবেশ করেন তখন সমগ্র পরিবেশ ভাবগাম্ভীর্যে পরিণত হয়।[২৩]

প্রসন্ননাথের পুত্র প্রমথনাথ রায় দশ হাজার টাকা দান করেন।[২৪] রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় রাজশাহীতে একটি কৃষি ফার্ম চালু করা হয়। কৃষি ফার্মের ৮০ বিঘা জমি দান করেন প্রমথনাথের সন্তান রাজা প্রমদানাথ রায়। উক্ত জমিতে পরবর্তীতে স্থাপিত হয় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। সুতরাং বলা যায়, দুটি হাসপাতালেই তাঁদের অবদান বর্তমান।[২৫]

---

[২২] কালীনাথ, পৃ. ৯৪।

[২৩] K.C. Mitra, p.38.

[২৪] কালিনাথ, পৃ. ২১১ (তৎকালীন দাতব্য চিকিৎসালয়ের তালিকায় দেখা যায় যে, নাটোর (১৮৫১), করচমারিয়া (১৮৬৯), লালপুর (১৮৬৭) এবং পুঠিয়া (১৮৬০) প্রধান। এর মধ্যে রাজা প্রসন্ননাথের আর্থিক সহায়তায় সর্বপ্রথম নাটোরে চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। সময়কাল অনুসারে রাজশাহী হলো দ্বিতীয় এবং তাও রাজা প্রসন্ননাথের আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত হয়, W.W. Hunter, *Statistical Accounts of Bengal—the Rajshahi District* (London: Trubner and Co. Ltd., 1873), Vol.III, p.176.

[২৫] সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ (সম্পাদিত), *সংসদ বাঙ্গালা চরিতাভিধান* (কলিকাতা: ১৯৭৬),

রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন: রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। মূলত এটা ছিল রাজা-মহারাজাদের সমিতি। রাজশাহীতে তাঁরা এ সভার মাধ্যমে নানা কার্যক্রম পরিচালিত করতেন। বাংলা ১১৭৯ সালে এর জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। তৎকালে রাজশাহী কলেজসহ অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী সভার মাধ্যমে আর্থিক অনুদান লাভ করতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যে, দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১,৫০,০০০.০০ টাকা দান করেন। রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন পরিচালনার জন্য রাজা প্রমথনাথ রায় এক খণ্ড জমি ক্রয় করে সেখানে এক দালান নির্মাণ করেন। উক্ত ভবনের নাম ছিল 'রাজা প্রমথনাথ রায় টাউন হল'।[২৬] তিনি হলটি রাজশাহী সভাকে দান করেন এবং সেখান থেকে যে আয় হতো তা দিয়ে সমিতিটি পরিচালিত হতো। রাজা প্রমথনাথ রায় এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তিনি মোট ৩ বার সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পুত্র রাজা প্রমদানাথ সভাপতি হন একবার। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ২ বার সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রথম প্রতিনিধি সভাপতি ছিলেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যদুনাথ সরকারের পিতা রাজকুমার সরকার।[২৭] এখন যেখানে রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় স্থাপিত সেটি মহারাজা প্রমথনাথের দানকৃত সম্পত্তি। এর আয় থেকে রাজশাহীতে বহু কল্যাণকর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।[২৮]

লাইব্রেরি : ১৮৫০ সালের পূর্বে দেশে সে রকমভাবে কোনো লাইব্রেরি গড়ে ওঠেনি। যাত্রা আরম্ভ হয় ১৮৫০ সালের পর। নাটোরের মহারাজা আনন্দনাথ রায়; ধারণা করা যায়, ১৮৬৬ সালের পূর্বে রাজশাহীতে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। এর সঠিক তারিখ না পাওয়া গেলেও তিনি যে ১৮৬৬ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন সেটা সত্য। লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ১০,০০০.০০ টাকা দান করেন। পরবর্তীকালেও অনেক টাকা দান করেছেন। উক্ত লাইব্রেরির নাম ছিল 'রাজা আনন্দনাথ লাইব্রেরি'। এ কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' খেতাবসহ সি.এস.আই. উপাধি প্রদান করে। মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা চন্দ্রনাথ রায় পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরির জন্য বার্ষিক ২০ পাউন্ড বরাদ্দ দেন।[২৯] এটি একটি অস্থায়ী লাইব্রেরি ছিল, কেননা এর জন্য কোনো স্থায়ী ঘর ছিল না। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ বাড়ি নির্মাণের জন্য মিঞা পাড়ায় একখণ্ড জমি দান করেন। এখনও লাইব্রেরিটি উক্ত ভূমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পিতা প্রমথনাথও লাইব্রেরির উন্নতির জন্য অনেক আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। অনেকের ধারণা ১৮৮৪ সালে লাইব্রেরি ভবন নির্মিত হলে এর নতুন নাম হয় 'রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরি'। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন প্রমদানাথ রায় বাহাদুর

---

[২৬] পরে এর নাম হয় রাজা প্রমদানাথ টাউন হল, তার পরে 'অলকা হল' এবং বর্তমানে 'স্মৃতি সিনেমা'। বর্তমানে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম এখান থেকেই পরিচালিত হচ্ছে।

[২৭] কালিনাথ চৌধুরী, পৃ. ৩৪২-৩৪৩।

[২৮] মাঝে সমিতির কার্যক্রম প্রায় বন্ধই হয়ে যায় কিন্তু অনেক সমাজ দরদি লোকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৮৫ সালে তা আবার পুনর্গঠিত হয়। এর পিছনে যার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল তিনি হলেন নাটোরের দয়ারামপুরের সন্তান জনাব এস.এম. আব্দুল লতিফ (প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। তাঁর প্রচেষ্টায় ঐ বছর রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনের নামে একটি পত্রিকা বের হয়। তাতে আমি 'পুণ্য কর্মে রানী ভবানী' নামক একটি প্রবন্ধ লিখি। অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ জনাব আব্দুল লতিফের অবদানের কথা সামনে রেখে ২০০৩ সালের ১৯শে এপ্রিল তাকে সংবর্ধনা দেন। সে সময় ওস্তাদ বাদলকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন ডঃ তসিকুল ইসলাম রাজা। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিফোন, মাননীয় সিটি মেয়র মোঃ মিজানুর রহমান এম.পি. ও আরও সুধীজন।

[২৯] W.W. Hunter, Statistical Accounts of Bengal. Vol.II. p.91. and Loke Nath Ghose, *Modern History of Indian Chief Rajas and Zamindars* (Calcutta: J.N. Ghose and Co., Press, 1881), p.357.

নিজে। তিনি ১৯২৫ সাল পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তদীয় ছোট ভাই কুমার শরৎকুমার রায় ১৯৪২ সাল পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। কোনো এক সময়ে জগদিন্দ্রনাথের পুত্র মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ (১৮৯০-১৯৮১) সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালে সভাপতি ছিলেন নাটোরের রাজা প্রতিভানাথ রায় বাহাদুর।[৩০] মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সব সময়ে লাইব্রেরিতে আসা-যাওয়া করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজশাহীতে এলে লাইব্রেরিতে যেতেন এবং সে সময়ে মহারাজার উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। রাজকুমার সরকারের একটি লাইব্রেরি ছিল। সারা বাংলায় সে সময়ে এ রকম কম লাইব্রেরিই দেখা যেত।[৩১] আরও যে সব লাইব্রেরি ছিল তার মধ্যে কুমার শরৎকুমারের লাইব্রেরি, দিঘাপতিয়ার 'রাজ লাইব্রেরি' প্রভৃতি প্রধান।

পত্র-পত্রিকা: পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে রাজশাহী কোনো সময়ে পিছিয়ে ছিল না। 'হিন্দু রঞ্জিকা' নামে ১৮৬৬ সালে রাজশাহী থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শ্রী দীনাথ সিংহ রায় ছিলেন সম্পাদক। প্রথমে মাসিক এবং তারপর সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ সালে উৎসাহ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এসব প্রকাশের পিছনে নাটোরের মহারাজা, দিঘাপতিয়ার মহারাজা প্রমুখ অকাতরে দান করতেন। রাজশাহী সমাচার প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। এর প্রকাশক ছিলেন করচমারিয়া গ্রামের বেণীমাধব নন্দী। রাজকুমার সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় 'রাজশাহী বাণী'।[৩২] তৎকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি-সকল বিষয়ের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় ঐ সব পত্র-পত্রিকায়। সেগুলো ছিল তৎকালীন সমাজের দর্পণ স্বরূপ। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় 'মানসী' পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'মর্মবাণী' নামক পত্রিকারও যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। দুটি এক সময়ে 'মানসী ও মর্মবাণী' নাম ধারণ করলে মহারাজা এর সম্পাদক হন। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও এটি মহারাজার কারণে বরেন্দ্র অঞ্চলের পত্রিকা হিসেবে পরিচিতি পায়। এতে লিখতেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন ও অনেকে।[৩৩]

সাহিত্য: সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চায় রাজশাহী কোনো সময়ে পিছিয়ে ছিল না। রাজশাহীর ঐতিহাসিকের মধ্যে স্যার যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও অন্যদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্যার যদুনাথ সরকার হলেন রাজশাহীর ঐতিহাসিক কুলশিরোমণি। তিনি শেষদিন পর্যন্ত কলিকাতায় বসবাস করলেও আমরা রাজশাহীবাসী তাকে নিয়ে গর্ব করি। রাজশাহীর সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে প্রথমেই যার নাম আসে তিনি হলেন দীনেন্দ্র কুমার রায় ও কবি রজনীকান্ত সেন। এদের পরে যার নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। মহারাজা হয়েও তিনি ছিলেন একজন সাহিত্য প্রেমিক। তিনি সব সময়ে রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরিতে আসতেন। তাঁর কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এখানে আসতেন। ১৮৯২ সালের ২রা ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রাজশাহী আসেন। উক্ত দিনে রাজশাহী কলেজে রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'শিক্ষার হেরফের' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন।[৩৪] রাজশাহীর পাবলিক লাইব্রেরিতে বসে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূতের ডাইরি' নামক বইয়ের কিছু

---

[৩০] তসিকুল ইসলাম (সম্পা.), *শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি* (রাজশাহী: উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ২০০০), পৃ. ১০-১১।

[৩১] ইবনে গোলাম সামাদ, পৃ. ৫০।

[৩২] এম.ওয়াজেদ আলী, "নাটোরে সংস্কৃতি চর্চা", *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ২৩৭।

[৩৩] ইবনে গোলাম সামাদ, পৃ. ৪৮।

[৩৪] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব বাংলার কিছু কথা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৫১।

অংশ লিখেন। পরবর্তীতে বইটি জগদিন্দ্রনাথকে তিনি উৎসর্গ করেন।[৩৫] তাঁর পঞ্চভূতের একজন ছিলেন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কুমার শরৎকুমার রায়ও সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় নাটোর, রাজশাহী, মুন্সিগঞ্জ, পাবনা, রংপুর প্রভৃতি স্থানে সাহিত্য সম্মিলনীতে যোগদান করেন। রাজশাহী কলেজের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যোগ দেন। সে সভায় মহারাজ সভাপতির দায়িত্ব পালনসহ সকল প্রকার কর্তব্য সম্পাদন করেন।[৩৬] রাজশাহী আগমন করলেই কবি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধু লোকেন পালিতের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। সে সময়ে তাঁর বাসায় সাহিত্যের আড্ডা বসত এবং সেখানে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও জগদিন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল অনিবার্য।[৩৭] ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজশাহী শহরে পুঠিয়া রাজার পাঁচ আনি প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন-এর দ্বিতীয় অধিবেশন। সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন কুমার শরৎকুমার রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। স্থানটিতে এখন নির্মিত হয়েছে শাহমখদুম ডিগ্রি কলেজ।[৩৮] পরের বছর ১৯১০ সালে অধিবেশন হয় ভাগলপুরে এবং সে অধিবেশনে এ.কে.মৈত্রেয় ও শরৎকুমার যোগ দেন।

পার্ক : রাজশাহীর ভুবন মোহন পার্ক একটি ঐতিহাসিক মিলন ক্ষেত্র। পূর্বে সভা-সমিতি এখানে অনুষ্ঠিত হতো। ভুবন মোহন ছিলেন রাজশাহীর একজন নামকরা উকিল। তার দুই পুত্র সুরেন্দ্র মোহন ও সত্যেন্দ্র মোহনও রাজশাহীর নামকরা উকিল ছিলেন। ভুবন মোহন পার্কের জায়গাটি তিনি রাজশাহীর সর্বসাধারণের মিলনের জন্য দান করেন। ভুবন মোহন মৈত্রেয় রাজশাহীর সকল প্রকার উন্নয়নকর কার্যাদিতে অংশ নিতেন। তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তির সাথে তার সখ্যতা ছিল। তিনি হলেন নাটোরের কলমগ্রামের বাসিন্দা।[৩৯] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, কুমার শরৎকুমার রায় প্রমুখের সাথে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে তিনি রাজশাহীর উন্নয়নে অংশ নিতেন।

গ্রন্থ রচনা: শরৎকুমার রায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, গবেষণাকার্য কেবল সংগ্রহই নয়, বরং কিছু কর্ম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা দরকার। তার আর্থিক সহায়তায় 'গৌরলেখমালা' 'গৌড় রাজ মালা' 'ভাষাবৃত্তি' 'রাম চরিতম' 'পঞ্চরত্নম' প্রভৃতি নামকরা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশের উপর জোর দিয়ে তিনি ১৯৩১ সালে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে যে ভাষণ দেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।[৪০] রাজশাহীতে অবস্থান করে যাঁরা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ প্রধান। এরা প্রায় সবাই নাটোর ও দিঘাপতিয়া রাজের আর্থিক সহায়তা লাভ করেছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অমর সৃষ্টি নবাব সিরাজদৌল্লা ও মীরকাসিম। দুটি গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেই মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সাহায্য পেয়েছেন। কিন্তু তিনি রানী ভবানী নামক গ্রন্থ লেখার বেলায় মহারাজার অর্থ সাহায্য পাননি। এর প্রধান কারণ হলো অক্ষয় বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় কলকাতায় ঠাকুর পরিবারের প্রজা পীড়নের কিছু চিত্র

---

[৩৫] ইবনে গোলাম সামাদ, পৃ. ৪৯।

[৩৬] মুহম্মদ আবুল ফজল, "জগদিন্দ্রনাথ রায়" সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও তসিকুল ইসলাম(সম্পা.), *রাজশাহীর প্রতিভা* (রাজশাহী: রাজশাহী এসোসিয়েশন, ২০০০), পৃ. ১৫৯।

[৩৭] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *পতিসরে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ৮।

[৩৮] এস.এম. আব্দুল লতিফ, নাটোরের গৌরব, পৃ. ১১০।

[৩৯] বিমল প্রসাদ রায় ও অন্যরা, *নাটোরের কথা ও কাহিনী* (কলিকাতা: নাটোর মহকুমা সম্মিলনী, ১৯৮১), পৃ. ১০৮।

[৪০] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *কুমার শরৎকুমার রায়* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২), পৃ. ২৩, ৩৯-৪১। (উল্লিখিত গ্রন্থগুলো সে সময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী। বিশেষত রমা প্রসাদ চন্দের *Indo-Aryan History of Bengal* নামকরা পুস্তক ছিল।)

তুলে ধরেন। এতে রবীন্দ্রনাথ রাগ হন এবং মহারাজাকে আর্থিক সাহায্য দিতে না করেন।[৪১] রাজশাহী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণেতা কালীনাথ চৌধুরী। গ্রন্থটি ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি নাটোরের মহারাজা যোগেন্দ্রনাথ ও দিঘাপতিয়ার মহারাজা প্রথদানাথের সময়কালের লোক। তিনি তাদের নিকট থেকে অনুপ্রেরণাও লাভ করেছেন। রাজা প্রমথনাথের সাথে তার সখ্যতা ছিল। কাজী মোহাম্মদ মেছের রাজশাহীর উপর ২ খণ্ডের ইতিহাস রচনা করেছেন। গ্রন্থ দুটি রচনার ক্ষেত্রে যাদের সহায়তা লাভ করেছেন তাদের মধ্যে নাটোরের কাজী আব্দুল মজিদ ও এস.এম.আব্দুল লতিফরে নাম ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

জাদুঘরঃ বরেন্দ্র জাদুঘর রাজশাহীর একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। বলা যায় এর যাত্রা শুরু হয়েছিল নাটোর থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ভিত্তিতে। ১৯০৫ সালের দিকে নাটোরের বড়াইগ্রাম থানার ধানাইদহ গ্রামে একটি তাম্রলিপি পাওয়া যায়। সেটি নাটোরের উকিল জগদীশ্বর রায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে প্রদান করেন। সেটি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পরামর্শক্রমে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তারপর থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহের আগ্রহ জন্মলাভ করে।[৪২] এর পূর্ব নাম ছিল বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি। ১৯১০ সালে প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠার পূর্বলগ্ন থেকে কুমার শরৎকুমার রায় একান্তভাবে জড়িত ছিলেন। এ কাজে তিনি সম্মেলন ও সভা-সমিতিতে যোগদান করেন। বিভাগীয় কমিশনার ও গভর্নর জেনারেল লর্ড কারমাইক্যালের সাথে বহুবার যোগাযোগ করেন। লর্ড কারমাইক্যাল ১৯১৩ সালে বেসরকারিভাবে একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি দান করেন।[৪৩] তখন থেকে শরৎকুমার রায় মাসিক ২০০ টাকা প্রদান করেন এবং জাদুঘরের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। বর্তমান যে স্থানে জাদুঘরটি অবস্থিত সেটি খরিদ করে দান করেন রাজা প্রথমনাথ রায়। ১৯১৬ সালে লর্ড কারমাইক্যাল জাদুঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলে কুমার শরৎকুমার রায় নিজ ব্যয়ে তা নির্মাণ করতে থাকেন। পরে তদীয় ভ্রাতা কুমার বসন্তকুমার ৫০০০.০০ টাকা এবং রাজা প্রমথনাথ রায় ৬৩,০০০.০০ টাকা দান করেন। বসন্তকুমার পরবর্তী কালে আবার ৩০,০০০.০০ টাকা দেন। শরৎকুমার রায় ভবনের কারুকার্যের পরিকল্পনা করেন। স্যার যদুনাথ সরকারের ছোট ভাই প্রকৌশলী বিজয়নাথ সরকার ভবন নির্মাণে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। তিনি ছিলেন মিউজিয়ামের অবৈতনিক সেক্রেটারি।[৪৪] অনুসন্ধানী দলের প্রাপ্ত নিদর্শন রাখার যথার্থ স্থান না থাকায় সে সব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা জাদুঘরে নিয়ে যাবার উদ্যোগ নেন। রামকমল সিংহও কিছু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জাদুঘরে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু এসবের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ান নাটোরের ভুবন মোহন মৈত্রেয়। তার কারণে এসব রাজশাহীতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।[৪৫] উল্লেখ থাকে যে, প্রথমে যে সব সামগ্রী সংগ্রহ করা হয় তা রাখা হয় প্রথদানাথের রাজশাহীর মিঞাপাড়ার বাসভবনে।[৪৬] রাজা হেমেন্দ্রকুমার ১৯২২ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত মিউজিয়ামের অনারারি কিপার ছিলেন।

স্থানীয় সরকারঃ বাংলা প্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উন্নয়ন ও বিস্তারের ক্ষেত্রে ১৮৭০ সালের চৌকিদারি আইনকে মাইল ফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। আইনটির দোষ-ত্রুটি অপসারণকল্পে

---

[৪১] আবু জাফর, *ইসলাম ও আত্মঘাতী মুসলমান* (ঢাকা: পালাবদল পাবলিকেশন, ২০০০), পৃ. ১৭৭; নিশীথ রঞ্জন রায়, *রানী ভবানী* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন)।

[৪২] সমর পাল, *বরেন্দ্রভূমির সাহিত্য : প্রাচীন যুগ* (রংপুর: বর্ণসজ্জা, ১৯৯৮), পৃ. ৫।

[৪৩] ফজলুল হক, *ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: ঢাকা প্রেস, ১৯৯১), পৃ. ৭৭-৭৯।

[৪৪] কাজী মোহাম্মদ মেছের, পৃ. ১৪১।

[৪৫] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *রমা প্রসাদ চন্দ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১৪।

[৪৬] ফজলুল হক, পৃ. ৭৯।

১৮৮৫ সালে বাংলার আইনসভায় প্রণীত হয় গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন ১৮৮৫। উক্ত আইনের ধারা বলে জেলা পর্যায়ে গঠিত হয় জেলা বোর্ড। ১৮৮৬ সালে সে মোতাবেক রাজশাহীতে জেলা বোর্ড গঠিত হয়। বিধান অনুসারে জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন ২১ জন। সভাপতি ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে। মোট ২২ জনের মধ্যে ৮ জন ছিলেন ইংরেজ, ১১ জন হিন্দু এবং ৩ জন মুসলমান। জেলা বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা একজন সদস্য ছিলেন সিংড়া থানার রাজকুমার সরকার। রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের প্রণেতা কালিনাথ চৌধুরীও জেলা বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন।[৪৭] পরবর্তী সময়ে কাজী আব্দুল মজিদ (১৯১০-১৯৭৪) একটানা ১৭ বছর রাজশাহী জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। আইয়ুব আমলেও তিনি কয়েক বছর জেলা কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য থাকেন।[৪৮]

শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হলো পৌরসভা। রাজশাহী পৌরসভা গঠিত হয় ১৮৭৬ সালের ১লা এপ্রিল। মোট ২১ জন সদস্য নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। এর মধ্যে ১৪ জন নির্বাচিত এবং ৭ জন ছিলেন মনোনীত সদস্য। নির্বাচিত সদস্যগণ সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। করচমারিয়ার হরকুমার সরকার ছিলেন একজন নির্বাচিত সদস্য। তিনি রাজকুমার সরকারের আপন ভ্রাতা। নির্বাচিত সদস্যের ১ জন এবং মনোনীতদের মধ্যে ১ জন ছিলেন মুসলমান। ১৯০০ সালের ১২ই মে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ভুবন মোহন। তিনি একজন সফল চেয়ারম্যান ছিলেন। ইনার দানকৃত সম্পত্তি হল ভুবন মোহন পার্ক। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হলে প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন বাবু সনদকুমার রায় মৈত্রেয়। এরপর ১৯৫০ সালে জনাব মাদার বখশ (১৯০৫-১৯৬৬) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তার সময়ে পৌরসভার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য থাকাকালেই নির্বাচনের মাধ্যমে পৌরসভার চেয়ারম্যান হন।[৪৯]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হলো রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্র। রাজশাহীর গৌরব বৃদ্ধিতে বিশ্ববিদ্যালয়টির অবদান সত্যই প্রশংসার দাবিদার। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন তাঁদের মধ্যে জনাব মাদার বখ্শের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তিনি সে সময়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং এম.এল.এ. ছিলেন। প্রথম ধারণাকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। জনগণ তথা এতদঞ্চলের সুধীজনকে মটিভেট করার জন্য সকলে মাদার বখশ সাহেবকে দায়িত্ব দেন। তিনি একটি খসড়া প্রস্তাবনাও প্রণয়ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় জনাব মাদার বখশ ছিলেন তার যুগ্ম সম্পাদক। নানা পথ পরিক্রমণের পর জনাব মাদার বখশ ১৯৫২ সালে একটি বিল পেশ করেন এবং ১৯৫৩ সালে তা পাস হয়। এ কাজটি করতে গিয়ে তাকে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং সহ্য করেছেন অনেক উপহাস-বিদ্রূপ। সুতরাং বলা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদানই সবচেয়ে বেশি। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে নেতৃত্ব দেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। আমরা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, বহু পণ্ডিত ব্যক্তি তা নিয়ে নানা তাচ্ছিল্য করেছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি ১৯০৫ সালে যে কারণে বঙ্গ বঙ্গ নিয়ে বাধা দিয়েছেন, সে কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়েছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠার পথে জনাব মাদার বখশকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়েছে।[৫০] তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজশাহী

---

[৪৭] কালীনাথ চৌধুরী, পৃ. ৩৪৬।

[৪৮] কাজী গোলাম মুর্শেদ, "কাজী আব্দুল মজিদ : জীবন ও সাধনা", *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ১৯০। (লেখক বর্তমানে সিংড়া এলাকার সংসদ সদস্য এবং প্রখ্যাত কাজী আবুল মাসউদের সুযোগ্য পুত্র।)

[৪৯] তসিকুল ইসলাম, "সমাজ সেবক মাদার বখশ : জীবন ও সাধনা", *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ১৭১।

[৫০] আলোচনার জন্য দেখুন, কাজী মোহাম্মদ মেছের (এ পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: মোঃ মকসুদুর রহমান "মৌলবী মাদার বখশ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়" *স্মারকগ্রন্থ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা*, ২১-২৩ ডিসেম্বর ২০০৩)।

মেডিক্যাল কলেজ (১৯৪৯)। রাজশাহী মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৯৫৭) পিছনেও ছিল তাঁর যথেষ্ট অবদান। লক্ষ্মীপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬০) এবং হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে মরহুম মাদার বখশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি নাটোরের গৌরব।

রাস্তাঘাট: রাজশাহী জেলার পুরাতন রাস্তার মধ্যে 'রাজশাহী পাবনা রোড' অন্যতম। ১৮২৫ সালে নাটোর থেকে রামপুর বোয়ালিয়াতে জেলা সদর স্থানান্তরিত হলে রাজশাহীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রাজা-জমিদারগণ জমিদারি পরিচালনা সংক্রান্ত কাজের জন্য রাজশাহী আসতে আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যে রাজশাহী শহরের মর্যাদা বেড়ে যায় এবং নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হতে থাকে। পুরাতন সদর নাটোরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সরকার প্রয়োজন অনুভব করতে থাকে। রাজশাহী-নাটোর রাস্তাটি চলাচলের অনুপযুক্ত ছিল, সে কারণে সরকার রাস্তাটি পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করে। এ কাজে সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্য স্থানীয় রাজা-জমিদারকে অনুরোধ জানানো হয়। সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে দিঘাপতির রাজা প্রসন্ননাথ ১৮৫০ সালে ৩৫০০০ টাকা ব্যয়ে রাস্তাটি চলাচলের উপযুক্ত করে দেন। তখন থেকে এর নাম ছিল 'নাটোর রাজপথ'। সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজা প্রসন্ননাথ ১৮৫০ সালের ২৫শে জুন গভর্নর জেনারেলের কাছে এক সম্মতিপত্র প্রদান করেন এবং সে অনুসারে নিজ ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণ করে দেন। রাস্তাটি রাজশাহী থেকে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৫১] এতদঞ্চলের জনসাধারণ তখন থেকে অবাধে রাজশাহী আসতে আরম্ভ করে। সুতরাং বলা যায়, রাজশাহীর শ্রীবৃদ্ধিতে নাটোর-রাজশাহীর পথটি সে সময়ে কম গুরুত্ব বহন করেনি। রাজশাহী শহরের সাথে দেশের অন্যস্থানের রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলন গড়ে তোলে। ঐ আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে কুমার শরৎকুমারের নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের নেতৃত্বে ১৯২৯ সালের ১৪ই মার্চ আব্দুলপুর-আমনুরা রেলপথ স্থাপিত হয়। এর আগে রাজশাহী থেকে রেলপথে কোথাও গমন করতে হলে নাটোর স্টেশনে যেতে হত।[৫২] কাজী আবুল মসউদ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত থাকার সময়ে তাঁর প্রস্তাবক্রমে ও প্রচেষ্টায় নাটোর-ঢাকা মহাসড়ক নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় এবং এরপর থেকে রাজশাহী-ঢাকার যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড: ব্রিটিশ-ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজশাহী কখনও পিছিয়ে ছিল না। বরং বলা যায়, অগ্রভাগে থাকেন নাটোরেরই কৃতি সন্তানগণ। আমরা যদি ইতিহাসের গোড়ায় ফিরে যাই, তাহলে দেখতে পাই যে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে দেশের বরেণ্য রাজা-মহারাজাগণ ইংরেজদের সহযোগিতা করলেও নাটোরের মহারানী ভবানী কিন্তু নবাব সিরাজকে সমর্থন করেছেন। তিনি নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরসহ অন্যদের ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সহযোগিতা না করার জন্য পরামর্শ দেন। এক পর্যায়ে রানী ভবানী নাটোর থেকে সৈন্য পলাশীর দিকে চালানো করতে নির্দেশ দেন কিন্তু পথিমধ্যে নবাবের পতন সংবাদ অবগত হলে সেনাবাহিনী নাটোরে প্রত্যাবর্তন করে। সে কারণে অন্যরা পুরস্কৃত হলেও রানী ভবানীর উপর নেমে আসে অত্যাচার ও জুলুম। কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর লর্ড ক্লাইভকে সহযোগিতা করায় পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত ১২টি বন্দুক উপহার হিসেবে প্রাপ্ত হন। ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলনের সময়েও রাণী ভবানী এই স্বাধীনতাকামী সংগ্রামীদের সহযোগিতা প্রদান করেন। বাংলার মধ্যে 'রাজশাহী রাজ্য' ছিল সবচেয়ে নিরাপদ এবং

---

[৫১] K.C. Mitra, p.30.

[৫২] এস.এম. আব্দুল লতিফ, *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ১০৮।

সে কারণে বর্গীর হামলাসহ অন্যবিধ রাজনৈতিক অস্থির মুহূর্তে মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার পর্যন্ত রাজশাহীতে আশ্রয় নিয়েছিল। এর জন্য মহারানী ভাবানীর কৃতিত্বই বেশি।[৫৩]

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয় এবং একেই বলে ভারতীয়দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। সে সময়ে রাজশাহীর কোনো রাজা-মহারাজার কি ভূমিকা ছিল তা সঠিক জানা যায়নি। তবে দিঘাপতিয়ার মহারাজা প্রসন্ননাথ রায় তখন নাটোর অঞ্চলকে সিপাহির আক্রমণ থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। প্রাসাদের সামনে ২টি কামান আজও সংরক্ষিত আছে। এর একটি ১৮২৮ এবং অন্যটি ১৮৫৬ সালে নির্মিত বলে উল্লেখ আছে। রাজা প্রসন্ননাথকে ১৮৫৭ সালে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর অধীন পুলিশের একজন জমাদার ও ২০ জন বরকন্দাজ দেয়া হয়।[৫৪] তাতে মনে করা যায় যে, তিনি কোম্পানিকেই বাস্তবে সহায়তা দিয়ে ছিলেন-স্বাধীনতাকামী সিপাহিদের নয়।

১৮৮৫ সালে ইংরেজ অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ন স্যার অ্যালান অকটারভিয়্যান হিউমসের প্রেরণায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহীর বিশিষ্ট কংগ্রেসি নেতাদের মধ্যে সুরেন্দ্র মোহন মৈত্রেয় একজন। তিনি নাটোরের সিংড়া থানার কলম গ্রামের অধিবাসী। সে সময়ে কলম গ্রামকে 'প্রাচ্যের নবদ্বীপ' বলা হতো। নাটোরের বিশী পরিবারের হেমনলিনী বিশী একজন নেতা ছিলেন। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় স্যার সুরেন্দ্র নাথের আহ্বানে ১৮৮৬ সালেই বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে যোগ দেন। এর একটি সভা সে বছর নাটোর রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয় এবং মহারাজ সেখানে সভাপতিত্ব করেন। ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক খেতাব 'মহারাজ' প্রাপ্ত হয়েও তিনি এ রকম আন্দোলনে যোগ দেন। তখন থেকেই তার রাজনীতির হাতেখড়ি হয়।[৫৫] ১৯০৯ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে মহারাজা ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি।[৫৬]

১৮৯৭ সালে নাটোরে যে কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবশেন হয় সেখানেও মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বড় বড় নেতা-কর্মী নাটোরে আগমন করেন।[৫৭] ১৯০১ সালে কলিকাতায় বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মহারাজা অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেন।[৫৮] কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ মহাত্মা গান্ধী ১৯২৫ সালে চাঁদা সংগ্রহের জন্য রাজশাহী আগমন করলে আত্রাইয়ের আহসান মোল্লা ১০ হাজার টাকা এবং নাটোরের মহারাজা বীরেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন ৫ হাজার টাকা।[৫৯] রাজশাহীর খ্যাতিমান উকিল ভুবনমোহন মৈত্রেয়ের পুত্র উকিল সুরেন্দ্র মোহন মৈত্রেয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ লাভ করে সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে আর্বিভূত হন। তিনি রাজশাহীবাসীর গৌরব। তারা নাটোরের কলম গ্রামের সন্তান।[৬০]

বঙ্গভঙ্গ ছিল এতদঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। নবাব স্যার খাজা সলিম উল্লাহর নেতৃত্বে ১৯০৫ সালে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করা হয়। পূর্ব বাংলা ও আসাম সমবায়ে যে প্রদেশ গঠিত হয় তার নাম করা হয় পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। কলিকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা সর্বতোভাবে

---

[৫৩] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মোঃ মকসুদুর রহমান, *নাটোরের মহারানী ভবানী* (রাজশাহী: ইউনাইটেড প্রিন্টার্স, ১৯৮৮) এবং D. Mahabharatee, *A Short History of Brahman Rajas and Maharajas in Ancient and Modern Bengal* (Calcutta: Antapur Press, 1906), p.4.

[৫৪] C.F. Buckland, *Bengal Under the Lieutenant Governors* (Calcutta: Kedar Nath Bose Ltd., 1902), Vol.II, p.1085.; কালিনাথ, পৃ. ২০৮।

[৫৫] ফজলুল হক, *মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ২০।

[৫৬] বিমল প্রসাদ, *নাটোর কথা ও কাহিনী*, পৃ. ৮৯।

[৫৭] সত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত, *রবীন্দ্রনাথের গল্প* (ঢাকা: স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৪),পৃ. ৭৯।

[৫৮] *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৩২, পৃ. ৫৭৮।

[৫৯] ইবনে গোলাম সামাদ, পৃ. ৯১।

[৬০] বিমল প্রসাদ, পৃ. ১৫০।

এর বিরোধিতা করেন। অবশেষে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। নাটোরের স্যার চয়েন উদ্দিন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অবস্থান নেন এবং এ কাজে নবাব বাহাদুরকে সহযোগিতা দেন। এই মহান ব্যক্তি ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতিতে যোগদান করেছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এ দেশের অনেক রাজা মহারাজাও অংশ নিয়েছিলেন। নাটোর ও দিঘাপতিয়ার মহারাজা যথাক্রমে ১০০০ ও ২৫০০ টাকা চাঁদা প্রদান করেন। চৌধুরী পরিবারের আব্দুস সোবহান চৌধুরীও চাঁদা প্রদান করেন।[৬১] মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ কলিকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করতে ১৯০৫ সালের ৭ই অক্টবরে অনুষ্ঠিত এক সভায় যোগদানের জন্য গিরিডিতে অবস্থানরত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসার জন্য মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় একক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৬২] তবে নাটোরের মৌঃ চয়েন উদ্দিন, এরশাদ আলী খান চৌধুরী ও তদীয় পুত্র আশরাফ আলী নবাব সলিম উল্লাহকে সর্ববিধ সহায়তা দেন। আশরাফ আলী খান চৌধুরী (বাংলার ডেপুটি স্পিকার) ধনবারিয়ার নওয়াব নবাব আলী চৌধুরীর বন্ধু ছিলেন। তারা দুজনই নবার স্যার সলিমুল্লাহর একনিষ্ঠ সহচর । ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পিছনে মৌঃ চয়েন উদ্দিনের কম ভূমিকা ছিল না। ১৯০৯ সালে কলিকাতা গমন করেন। ১৯০৯ সালের শিক্ষা অধিবেশনে যাঁরা যোগ দেন তাঁদের মধ্যে রাজশাহীর ইউসুফ আলী, নাটোরের চয়েন উদ্দীন প্রমুখ প্রধান।[৬৩]

ভারতের মুসলমানদের অধিকার বাস্তবায়ন ও তাদের মধ্যে সচেতনতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মিলনী কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। ১৯০৩ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক সম্মিলনী। এর একটি অধিবেশন রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত করণের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ রাজশাহী, নাটোর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। এজন্য মুন্সী মেহেরুল্লাহ রাজশাহী আসেন এবং হেতেম খাঁ মসজিদে একটি মিটিং করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, রাজশাহীতে প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা কনফারেন্স-এর সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত মিটিং-এ নাটোরের এরশাদ আলী খান চৌধুরীকে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি করা হয়। ১৯০৪ সালের এপ্রিল মাসের ২ তারিখে রাজশাহী কলেজ চত্বরে প্রকাণ্ড অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশন সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি এরশাদ আলী খান চৌধুরী যে সব ব্যবস্থা নেন তার ভিত্তিতে 'মুসলিম ক্রোনিকল' ভূয়সী প্রশংসায় ১৯শে মার্চ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করেন খান বাহাদুর নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম, মৌলভী আব্দুল হামিদ ও অন্যরা। প্রায় ৪ হাজার অতিথিকে স্বাগত জানান এরশাদ আলী খান চৌধুরী। তাঁর ভাষণ মুসলিম ক্রোনিকলে ছাপা হয়। কনফারেন্সে ভাষণ দেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও অনেকে। সহানুভূতি জানিয়ে যাঁরা পত্র দেন তাঁদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের নবাবজাদী, সৈয়দ আমির আলী, নবাব মহসিন উল মূলক ও অনেকে। তাদের ভাষণ পাঠ করে শোনান নাটোরের এরশাদ আলী খান চৌধুরী।[৬৪]

১৯০৯ সালে গঠিত হয় 'ইম্পিরিয়্যাল লীগ' নামক একটি সংস্থা। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজা-মহারাজাদের সহায়তায় বঙ্গভঙ্গ জনিত কারণে অস্থিরতার নিরসন করা। ঢাকাস্থ বর্ধমান রাজার বাসভবনে এটি গঠিত হয়। নবাব সলিম উল্লাহ ২৪শে ফেব্রুয়ারির ঐ সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের কারণে বঙ্গ প্রদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ

---

[৬১] এম.আর.আকতার মুকুল, *কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী* (ঢাকা: সাগর পাবলিসার্স, ১৯৮৭), পৃ. ২০২।

[৬২] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ববঙ্গ*, পৃ. ৫০।

[৬৩] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃ. ২১৪।

[৬৪] Abu Imam, "The First Provincial Muhammadan Education Conference at Rajshahi in 1904" in S.A. Akanda (ed.), *The District of Rajshahi: Its Past and Present* (Rajshahi: IBS, RU, 1983), p.399, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *মুনশী মেহেরুল্লাহ্* (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০), পৃ. ১০।

পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে একটি সংগঠন তৈরির প্রয়াস চালান। ১৯০৯ সালের ২১শে মার্চ বিত্তবান লোকদের সহায়তায় 'ইম্পিরিয়্যাল লীগ অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম' প্রতিষ্ঠা করেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা এর সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, সৈয়দ সামসুল হক, দিঘাপতিয়ার মহারাজা প্রমথনাথ রায় প্রমুখ।[৬৫] এ কথা সত্য যে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের মানুষের বিশেষ উপকার হয়েছিল। সেজন্য এতদঞ্চলের মানুষ তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভারত সচিবের সাথে মনোমালিন্যের জন্য তিনি ১৯০৫ সালের শেষের দিকে পদত্যাগ করেন। তাঁকে বিদায় দেবার জন্য ১৯০৫ সালে ৪ঠা নভেম্বর ঢাকার হোসাইনি দালানে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজশাহী অঞ্চল থেকে যে কয়জন ব্যক্তি যোগ দান করেন তাঁরা হলেন নাটোরের সৈয়দ সিরাজুদ্দীন ও মৌলভী আলীমুল্লাহ।[৬৬]

১৯০৬ সালে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভারতের মুসলমানদের আসন সংরক্ষণের জন্য ভারত সচিব লর্ড মর্লির সাথে যাঁরা সাক্ষাৎ করেন তাঁদের মধ্যে নওয়াব নবাব আলী চৌধুরী একজন। নাটোরের ব্যারিস্টার স্যার আশরাফ আলী সে সময়ে তাঁর সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম লীগ গঠনের সময়ে তিনি লেফটেনেন্ট গভর্নর বামফিল্ড ফুলারের সাথে যোগাযোগ করেন। ১৯০৯ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার সময়ে যখন ইংল্যান্ডে গমন করেন তখন এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য ফুলারের সাথে দেখা করেন।[৬৭]

রাজা, জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে সংঘটিত হয় কৃষক বিদ্রোহ। রাজশাহী অঞ্চলেও এ রকম বহু বিদ্রোহ হয়েছে। প্রগতিশীল আন্দোলনে বহু মহৎপ্রাণ ব্যক্তি জীবনের মায়া ত্যাগ করে ব্রিটিশ সরকার তথা-রাজা-মহারাজাদের আক্রোশকে ভয় না করে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৮৮৮ সালে দুবোলহাটির কৃষক বিদ্রোহের পর নাটোরে একটি কৃষক সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাটোরের কৃতি সন্তান মুন্সী মহাম্মদ মহসেন উল্লাহ (১৮৬৯-১৯২৩)। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী একটি বই লিখেন। বাংলা ১৩১৬ সালে প্রকাশিত বইটির নাম হল 'বুড়ীর সূতা'। এটি সে সময়ের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। বর্তমানে এটি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।[৬৮] কৃষকদের করুণ কাহিনী বিবৃত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মহামান্য গভর্নরকে তেজস্বী ভাষায় পত্র দেন ১৯০৭ সালে। সেটি 'মিহির' ও 'সুধাকর' পত্রিকায় বাংলায় ১৩১৪ সালের ১০ই মাঘ প্রকাশিত হয়। কৃষকদের মর্মকথা তুলে ধরে তিনি 'আবেদন' ও 'ছিন্নখেই' নামক নিবন্ধ রচনা করেন, যা ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়।[৬৯] সে সময়ে চয়েন উদ্দীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৭০] ১৯৩১ সালে সিংড়া থানার বীরকুৎসার প্রজা নেতা প্রভাস লাহিড়ীও প্রজাদের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কৃষক নেতাদের মধ্যে সিংড়া থানার জসিম উদ্দীন আহমেদ (১৮৭৯-১৯৬৩) ও খয়ের উদ্দীন সরদারের নাম উল্লেখ করার মতো। খয়ের উদ্দীন সরদারের 'পাঁচালী' 'বন্যাকাহিনী' ও 'কৃষক-প্রজার মর্মকথা' সে যুগে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি সিংড়া থানায় পাঁচপাকিয়া গ্রামের বাসিন্দা।[৭১]

---

[৬৫] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পৃ. ৭২।

[৬৬] *তদেব*, পৃ. ১০৪।

[৬৭] কামরুন রহমান, *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ২১৬।

[৬৮] মুহঃ হাসার উদ্দীন কবিরত্ন, "বুড়ীর সূতা প্রণেতা : শ্রী মহসেন উল্লা সরকার" *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ২৫।

[৬৯] *তদেব*, পৃ. ২৪।

[৭০] M.K.U. Mollah, The New Provice of Eastern Bengal and Assam (Rajshahi University, IBS, 1981); p.232.

[৭১] রেজাউল করিম খান, "নাটোর জেলা" শেখ আকরাম আলী (সম্পা.), বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার (ঢাকা; মডার্ন টাইপ, ১৯৮৫), পৃঃ ৯৪।

পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে রাজশাহীবাসীর ভূমিকা কোনো সময়ে হীনভাবে দেখা যাবে না। নাটোরের যে সব গুণী ব্যক্তি সে সময়ে ভূমিকা রেখেছিলেন তার মধ্যে জনাব কাজী আবুল মাসউদ (১৯১০-১৯৯৭), জনাব মাদার বখশ, কাজী আব্দুল মজিদ (১৯০৯-১৯৭৪), ফজলার রহমান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান সৃষ্টি পিছনে মুসলিম লীগের অবদানকে স্বীকার করতেই হবে। ১৯৩৬ সালে রাজশাহীতে যে ২২ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়, সেখানে মাদার বখশ একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ সালে সোহরাওয়ার্দী রাজশাহী আসেন। মুসলিম লীগের এই নেতাকে স্বাগত জানতে একটি কমিটি গঠিত হয়। মাদার বখশ ছিলেন এর মধ্যে একজন সদস্য। সেখানে মুসলিম লীগের কমিটি গঠিত হলে মাদার বখশ সাহেবকে কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। সে সময়ে নাটোর থেকে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের মধ্যে কাজী আব্দুল মজিদ, কাজী আবুস মাসউদ ও ফজলার রহমান (ছোট চৌগ্রাম) অন্যতম। মাদার বখশ ছিলেন তখন মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারকদের মধ্যে অন্যতম।[৭২]

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পরই নাটোরে সর্বপ্রথম পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন জেহাদে রূপান্তরিত হয়। এখানে একটি মুসলিম আসনে বাই ইলেকশন হয় মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের ভিত্তিতে। সে সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতারা নাটোরে জমায়েত হন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী জনাব কাজী আবুল মাসউদ ৯৭% ভোট পেয়ে জয়যুক্ত হন। ১৯৪১ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ নাটোরে আসেন নির্বাচনী সভায়। স্টেশনের জনসভায় তিনি জনতার উদ্দেশ্যে একটি মাত্র কথা বললেন, "আপনারা কি পাকিস্তান চান"। তখন সারা দিক থেকে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ ওঠে, "চাই-চাই-চাই"। তিনি আবার বললেন, "তাহলে মুসলিম লীগের বাক্সে আপনাদের ভোট দিবেন"। সারা ভারতের মধ্যে নাটোরে পাকিস্তান ইস্যুর উপর প্রথম জনমত যাচাই হয়। নেতাদের সাথে সাথে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় ১ মাস অবস্থান করে নির্বাচনী প্রচারণা চালান। এতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। জনাব মাদার বখশ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কাজী আবুল মাসউদ ১৯৪৬ সালেও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম লাভের পর তাকে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পরে ছিল পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির পদ। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারের নানা মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করেন।[৭৩] মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নাটোর আগমনকে কেন্দ্র করে স্টেশনে একটি মিনার তৈরি হয় এবং সেটা করা হয় রাজশাহীর স্বনামখ্যাত জেলা প্রশাসক ও এককালের নাটোরের কৃতি এস.ডি.ও. জনাব পি.এ.নাজির কর্তৃক। মিনারটি আইয়ুব খানের উন্মোচন করার কথা থাকলেও পরে তা করেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার জনাব আব্দুল হামিদ চৌধুরী।[৭৪]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে রাজশাহীবাসীর ভূমিকা কম গুরুত্বের দাবি রাখে না। ২২শে ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে সর্বাত্মকভাবে হরতাল পালিত হয়। বিকেলে ভুবন মোহন পার্কে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় হাজির হন মুসলিম লীগ নেতা ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য মাদার বখশ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দিলে তিনি সংসদ সদস্যের পদ থেকে সরে আসবেন বলে ঐ সভায় ঘোষণা দেন।[৭৫] পরে ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে তিনি সংসদ সদস্যের পদ ত্যাগ করেন। সরকার বিরোধী বক্তব্য দেবার জন্য কারারুদ্ধ হন। অবশ্য ১

---

[৭২] কাজী মোহাম্মদ মেছের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৬।

[৭৩] এস.এম.আব্দুল লতিফ, "কাজী আবুল মাসউদ" সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও তসিকুল ইসলাম (সম্পা.), *রাজশাহীর প্রতিভা* (রাজশাহী: দি বেঙ্গল প্রেস, ২০০০), পৃ. ২৮৭।

[৭৪] পি.এ. নাজির, *স্মৃতির পাতা থেকে* (ঢাকা: নতুন প্রকাশনা, ১৯৯৩), পৃ. ২১, ১৬৪।

[৭৫] তসিকুল ইসলাম, *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ১৭৪।

সপ্তাহ পর মুক্তি দেওয়া হয়।[৭৬] রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই বেশি। বলা যায় ১৯৪৮ সালে যখন জিন্নাহর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যত্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, তখন রাজশাহীবাসীও পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯৪৮ সালে রাজশাহী কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র সংসদের প্রথম সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রস্তাব পাস করে তা ছাত্র সংসদের কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু কলেজ অধ্যক্ষ মমতাজউদ্দিন সাহেব তাতে রাজি হননি। ফলে ছাত্ররা আন্দোলন করতে থাকেন। এজন্য কিছু ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ছাত্ররা এর প্রতিবাদে আমরণ অনশন ধর্মঘট করতে থাকেন। অনশন ষাট ঘণ্টা চলার পর মাদার বখশ সাহেব কলেজে প্রবেশ করেন এবং অধ্যক্ষের কক্ষ থেকে খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে কথা বলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।[৭৭] সুতরাং বলা যায় তিনি ভাষা আন্দোলনের উষালগ্ন থেকেই এর পক্ষ অবলম্বন করেন।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি জনযুদ্ধ। তবে যারা প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের অবদানের কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সমগ্র রাজশাহী অঞ্চলের যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে নাটোরের সিংড়া থানার জনাব আশরাফুল ইসলাম (এম.পি.এ.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কাঠামোকে গড়ে তোলে। কেন্দ্রীয় ছাড়াও আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা হয়। ২৪শে জুনের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সারা দেশকে ১১টি প্রশাসনিক জোনে বিভক্ত করা হয়। এর প্রধান করা হয় এম.এন.এ. ও এম. পি.এ-দের। সচিব হিসেবে একজন আমলা দায়িত্ব পালন করেন। পশ্চিম জোন-২ এর সদর দপ্তর ছিল মালদহ। এর প্রধান ছিলেন নাটোরের সিংড়া থানার এম.পি.এ. জনাব আশরাফুল ইসলাম এবং প্রশাসক ছিলেন জহিরুল ইসলাম ভূইয়া (ই.পি.সি.এস.)। জোনের আওতায় আইনসভার সদস্যগণ এর সভ্য ছিলেন। তাদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। জনাব আশরাফুল ইসলাম জোনের চেয়ারম্যান ছিলেন। সমগ্র রাজশাহী জেলা ছিল ৮নং পশ্চিম জোন-২-এর আওতায়। এসব জোনে ভাগ করার উদ্দেশ্য ছিল যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও যেন প্রশাসনকে পরিচালনার কোনো ব্যাঘাত না ঘটে তার আগাম ব্যবস্থা নেওয়া। সে অনুসারে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও তিনি রাজশাহীর পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৭৮]

আইনসভার সদস্য: রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ১৮৭২ সালে বড়লাটের একজন অ্যাটাচে ছিলেন।[৭৯] রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর ১৮৭৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর শাসন পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন (Member of the Executive Council ১৯১১)। কুমার শরৎকুমার রায় প্রাদেশিক আইনসভার সভ্য ছিলেন। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বড়লাটের শাসন পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা হতে ৫ জন মাত্র সদস্য নেওয়া হতো। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির অনুরোধে তিনি প্রার্থী হন। সমগ্র রাজশাহী অঞ্চল থেকে তিনি একজন সদস্য ছিলেন। ১৮৯৫ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১২ সালে মন্টফোর্ড স্কিম অনুসারে নতুন কাউন্সিলে মহারাজা তৃতীয়বার সদস্য নির্বাচিত হন।[৮০]

---

[৭৬] মুহম্মদ একরামুল হক, "রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন ও প্রগতিশীল রাজনীতির স্মৃতিচারণ" তসিকুল ইসলাম (সম্পা.), *রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন* (রাজশাহী: একতা মুদ্রায়ণ, ১৯৯০), পৃ. ১৪।

[৭৭] তসিকুল ইসলাম, *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ১৭৫।

[৭৮] এম.আর.আকতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি* (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, বাংলা ১৩৯১), পৃ. ২১ এবং মোহম্মদ নুরুল কাদের, *একাত্তর আমার* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ৭৮-৭৯।

[৭৯] K.C. Mitra, p.25.

[৮০] ফজলুল হক, পৃ. ২৩।

মহারাজার ছেলে যোগীন্দ্রনাথও বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন।[৮১] কেন্দ্রীয় আইনসভার যাঁরা সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রীমতী মায়া রায় ও ড. রজত চক্রবর্তী প্রধান। চয়েন উদ্দীন আহমদও বাংলার আইনসভার একজন সদস্য ছিলেন। এরশাদ আলী চৌধুরী ১৯১৯ সালে বাংলার আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর ছেলে ব্যারিস্টার আশরাফ আলী চৌধুরী ১৯২৮ সালে উক্ত আসন থেকে জয়লাভ করেন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত আসনে ছিলেন। ১৯৩৫ সালের আইনসভায় তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিন হন। সে সময় স্পিকার নির্বাচিত হন স্যার মহাম্মদ আযিযুল হক।[৮২] ১৯৪১ ও ১৯৪৬ সালে এতদঞ্চলের আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন কাজী আবুল মাসউদ। ১৯৪১ সালে তার জয় পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে সবচেয়ে বড় ইন্ধন জুগিয়েছিল। ১৯৪৬ সালে মাদার বখশ আত্রাই, বাঘমারা ও মান্দা থানা নির্বাচনী এলাকা থেকে বাংলার বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মুসলিম লীগের টিকিটে নির্বাচন করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের আইনসভার সদস্য ছিলেন। এসব মহান ব্যক্তি সমগ্র রাজশাহীর জন্য কথা বলেছেন।

উপসংহার

রাজশাহী একটি প্রাচীন শহর, তাই এর আছে পুরাতন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। একদিনে এই শহরের খ্যাতি বৃদ্ধি হয়নি, হয়েছে ক্রমে ক্রমে। উন্নয়ন সাধনের পিছনে বহু লোকের অবদান আছে। এর মধ্যে নাটোরের যে সমস্ত মহান ব্যক্তি রাজশাহীকে ধন্য করেছেন তাদের সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হলো। পুরা ও আদি তথ্য দিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গেলে বহু সময় ও ধৈর্যের ব্যাপার। সে কারণে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতেই লেখার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদীয়মান গবেষকগণ এ ব্যাপারে আগ্রহী হবেন-এই আশা রাখি।[৮৩]

---

[৮১] মোহাম্মদ আতাউর রহমান, *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ৫১-৫২।

[৮২] কামরুন রহমান, *নাটোরের গৌরব*, পৃ. ১২৮।

[৮৩] নাটোরের জেলা প্রশসক জনাব সদর উদ্দিন আহমদের অনুপ্রেরণায় প্রবন্ধটি রচিত। প্রবন্ধকার তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের বাংলা অনুবাদ

মো. আবু জাফর*

Abstract: Shakespeare's famous tragedy *Julius Caesar* has been translated into Bengali by different translators. The present paper deals with the translations of Jyotirindranath Tagore, Sudhangshu Ranjan Ghose and Syed Shamsul Haq. It focuses on features of the translations as well as the individual approaches of the translators. Despite inedequacy, Jyotirindranath's translation is close to the original. Sudhangsu Ranjan avoids formal accuracy in translation and used simple prose that reads well. Syed Haq's translation, not really a complete rendering of *Julius Caesar*, is an excellent combination of translation and adaptation and a new creation as well.

১. ভূমিকা

বিশ্বের প্রায় সব ভাষাতেই শেক্সপিয়রের নাটক অনূদিত হয়েছে, অজস্র ভাষায় তাঁর নাটকের রূপান্তর বা ভাবানুবাদ হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর নাটককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রায় নতুন সৃষ্টিকর্ম।[১] উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা ভাষায় শেক্সপিয়র অনুবাদের কাজ শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় শেক্সপিয়র অনুবাদ এবং বাংলা ভাষায় মৌলিক নাটক রচনার অধ্যায় যুগপৎ ঘটনা। যেমন নাটকাকারে বাংলায় শেক্সপিয়রের নাটক প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন হরচন্দ্র ঘোষ। তিনি 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' শিরোনামে The Merchant of Venice-এর অনুবাদ করেন, যা প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালে। এর মাত্র ১ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৫২ সালে প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক 'ভর্দ্রাজুন' প্রকাশিত হয়।[২] এর পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শেক্সপিয়রের সবগুলো নাটকের একাধিক অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য 'জুলিয়াস সিজার' নাটকটির প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে। অনুবাদক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুবাদ কি, অনুবাদের ধরন কেমন হওয়া উচিত, অনুবাদের সমস্যা কি, একজন অনুবাদকের কি রকমের যোগ্যতা থাকা দরকার, অনুবাদ কি আদৌ সম্ভব, অনুবাদ কথাটিকে অনুবাদ না বলে পুনঃসৃষ্টি

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া; এবং পিএইচ.ডি. গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] রীণা ঘোষ, *শেক্সপীয়র অনুবাদ ও অনুবাদ সমস্যা* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮২, ১৯৭৫), পৃ. ২৪০।

[২] *তদেব*, পৃ. ৪২।

বলা হবে কি না, এসব নিয়ে নানা ধরনের মতবাদ ও আলোচনা সমালোচনার অন্ত নেই।[৩] তবে অনুবাদের তাৎপর্য ও আবশ্যকতা মানব সভ্যতার শুরু থেকেই রয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বায়ন ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের ফলে এর প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রসঙ্গত সাহিত্য বা কাব্যকলার অনুবাদ অন্যান্য ধরনের অনুবাদ থেকে একটু ভিন্নতর কারণ সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে শুধু অর্থ বা বিষয়বস্তুগত দিক ছাড়াও মূলের আবহ, সুর, ছন্দ, গঠন, ভঙ্গি, এমনকি অর্থের আড়ালে লুকানো আভাস-ইঙ্গিতও বিবেচনায় আনার দরকার হয়। এ কারণেই সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ অনুবাদকের মতে, সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা গ্রহণ না করলে অনুবাদ কর্মের নান্দনিকতা ও পাঠযোগ্যতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।[৪]

বিশেষভাবে শেক্সপিয়রের নাটক বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদককে বেশ কয়েকটি বাধা অতিক্রম করতে হয়। প্রথমত সমাজ-সংস্কৃতিগত বাধা। দ্বিতীয়ত বাংলায় যথাযথ প্রতিশব্দের অপ্রতুলতা। তৃতীয়ত শেক্সপিয়রের নাটকের ভাষা কাব্যিক এবং তা ব্লাংক ভার্সের এক ছান্দিক জাদুজালে আবিষ্ট, যার প্রকৃত সুষমা বংলা অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। শেক্সপিয়রের নাটক অনুবাদে এসব বাধা অতিক্রম করার জন্য অনেক অনুবাদক শেক্সপিয়রকে দেশীয়করণের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।[৫] আবার মূলানুগ অনুবাদের প্রচেষ্টাও থেমে থাকেনি। একই নাটক বিভিন্ন আঙ্গিকে অনূদিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অনুবাদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেক্সপিয়রের সবগুলো নাটকই (৩৭ খানা) বাংলাভাষী পাঠকের নিকট সুপরিচিত।

'জুলিয়াস সিজার' নাটকটির অনুবাদ অপেক্ষাকৃত কম হলেও কমপক্ষে অর্ধ ডজন অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটির উল্লেখযোগ্য অনুবাদকগণ হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ, মফিজ চৌধুরী, হারান চন্দ্র রক্ষিত এবং সৈয়দ শামসুল হক। তবে আলোচনার সুবিধার্থে তিন জন অনুবাদকের তিন ধরনের তিনটি অনুবাদ বেছে নেওয়া হয়েছে। অনুবাদকত্রয় হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ এবং সৈয়দ শামসুল হক। বাংলাভাষী পাঠকের নিকট মূল নাটকের বিষয় ও প্রকরণগত রূপান্তরের প্রকৃতি স্পষ্ট করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় অনূদিত 'জুলিয়াস সিজার' নাটকটির বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যলোচনা করা হলো। এ পর্যলোচনার ক্ষেত্রে

---

[৩] অনুবাদের উপর মূল্যবান আলোচনা সমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই: (1) Susan Bassnet. *Translation Studies* (London and New York: Routledge, 1998); (2) Susan Bassnet and Harish Trivedi. *Post Colonial Translation* (London : Routledge, 1999); (3) Jean Delisle and Judith Woodsworth. *Translators Through History* (Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 1995); (4) Louis G. Kelly. *The True Interpreter : A History of Translation Theory and Practice in The West* (Oxford: B Blackwell, 1979); (5) Andre Lefevere (ed.). *Translation History, Culture: A Sourcebook* (London: Routledge, 1992); (6) Sujit Mukherjee. *Translation As Discovery and Other Essays* (Hyderabad : Orient Longman, 1994); (7) George Steiner. *After Babel* (New York: OUP, 1998).

[৪] কবীর চৌধুরী, *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (ঢাকা: শব্দতরু প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৮৮।

[৫] সফি আহমেদ, *বঙ্গদেশে শেক্সপীয়র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৫৬।

বিশেষভাবে মূলের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, নাটকীয়তা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে অনুবাদ কর্মের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

২. নাটকের মূল বিষয়বস্তু

শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকটি একটি ঐতিহাসিক নাটক। রোমের দিগ্বিজয়ী সম্রাট জুলিয়াস সিজার ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। সিজারবধ এবং পরবর্তী গৃহযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে শেক্সপিয়র নাটকটি রচনা করেন। ঐতিহাসিক কাহিনীর সাথে নাটকের কাহিনীর কিছুটা পার্থক্য থাকলেও শেক্সপিয়র মূল ইতিহাসের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। নাটকের কাহিনীতে দেখা যায়, জুলিয়াস সিজার পম্পের পুত্রদের পরাজিত করে রোমের একচ্ছত্র অধিপতি হতে চলেছেন এবং এ উপলক্ষে বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঈর্ষাকাতর ক্যাসিয়াস জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়ে তোলে এবং ক্যাসকা, সিন্না, মেটালাস সিম্বারসহ সিজারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রুটাসকে দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়। ব্রুটাস স্ব-স্বভাব বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে তীব্র মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুভব করে এবং নিজেকে বোঝাতে বাধ্য করে যে বর্তমান সিজার খারাপ নয়, কিন্তু ভবিষ্যতের একনায়ক সিজার খারাপ হবে। এভাবে সিজার হত্যার পরিকল্পনা পাকাপাকি হয়ে যায়। এদিকে সিজারের স্ত্রী ক্যালপুর্নিয়া রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন দেখে স্বামীর নিকট নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেন যেন সিজার সেদিন ঘরের বাইরে না যান। কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করে সিজার ক্যাপিটল ভবনের দিকে রওনা হন। সেদিনই পূর্বপরিকল্পিতভাবে সাজানো কৌশলের মাধ্যমে সিজারকে হত্যা করা হয়। প্রথমে ক্যাসকা এবং পরে একে একে সবাই ছুরিকাঘাত করে। সব শেষে ব্রুটাস। সিজার মৃত্যুর মূহূর্তে গভীর হতাশার সঙ্গে বলেন 'ব্রুটাস তুমিও !'।

রোমের বাজার এলাকায় ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসকে জনতা ঘিরে ধরে। তারা জানতে চায় কেন এই হত্যা? ব্রুটাস জনতাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, কোনো বিদ্বেষবশত নয়, শুধু দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থেই সিজারকে হত্যা করা হয়েছে। ব্রুটাসের বক্তৃতায় উপস্থিত জনতা মুগ্ধ ও উদ্বেলিত হয়। কিন্তু ক্যাসিয়াসের নিষেধ উপেক্ষা করে ব্রুটাস অ্যান্টনিকে বক্তৃতা করার সুযোগ দিলে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। অ্যান্টনি সুকৌশলে সিজারের মহানুভবতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং জনগণের প্রতি ভালোবাসার উদাহরণ তুলে ধরেন। অ্যান্টনির বক্তৃতায় জনগণ অস্বাভাবিকভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে এবং হত্যার প্রতিশোধ নেবে বলে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে। এদিকে অক্টেভিয়াস সিজার এবং লেপিডাস অ্যান্টনির সাথে এসে যোগ দেয়। দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে রোমের জনগণ। রোমের সর্বত্র শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। অবশেষে অ্যান্টনি-অক্টেভিয়াস-লেপিডাস-এর মিত্রবাহিনীর অর্থাৎ মৃত সিজারিয়ান শক্তিরই বিজয় সূচিত হয় এবং ব্রুটাস-ক্যাসিয়াস বাহিনীর পরাজয় ঘটে।

জুলিয়াস সিজার নাটকে শেক্সপিয়র দেখিয়েছেন গৃহযুদ্ধ, হত্যা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কিভাবে মানুষের শান্তি নষ্ট করে, কিভাবে একজন ভীষণ জনপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র গড়ে ওঠে, একজন অত্যন্ত ভালো মানুষও কিভাবে স্বভাববিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, ঈর্ষা, আত্ম-অহমিকা, ভুল বোঝাবুঝি কিভাবে মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে ইত্যাদি। অন্যান্য নাটকের মতো এ নাটকেও শেক্সপিয়র কাহিনীর অন্তরালে মানব-মন ও মানব-চরিত্রের বিচিত্র প্রবৃত্তিকে সর্বজনীন ব্যাপ্তিতে চিত্রিত করেন।

৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ

বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় নাটক অনুবাদের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৮-১৯২৫ খ্রি.) নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর অনূদিত নাটকের সংখ্যা ২২।[৬] জুলিয়াস সিজার নাটকটির প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে।[৭] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে তাঁর এ অনুবাদকর্মটিকে ভাষান্তরিত বলেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদের প্রশংসনীয় দিক হলো তিনি মূল নাটকের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য অনুবাদে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি 'কবিতার অনুবাদ কবিতা, গদ্যের অনুবাদ গদ্য হবে' এ ধরনের মনোভাব নিয়ে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের সর্বত্র তিনি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সমানভাবে রক্ষা করতে না পারলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করা যাক:

মূল পাঠ

Antony: O world, thou wast the forest to this hart;
And this, indeed, o world the heart of thee
How like a deer strucken by many princes
Dost thou here lie! [Act. III scene i]

অনুবাদ

অ্যানটোনি: জগৎ! তুমিই ছিলে এ হেন মৃগের বনভূমি:
আর ও-হৃদয় ছিল সমস্ত জগতের হৃদি
হেথা তুমি মৃগসম শত নৃপতির অস্ত্রাঘাতে
নিহত হইয়া আহা আছো শুয়ে অতি দীনভাবে।

এখানে দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূলের চার লাইনের অনুবাদ চার লাইনেই করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদের আর একটি প্রশংসনীয় দিক তিনি তাঁর অনুবাদে শেক্সপিরীয় ব্লাংক ভার্সের ছন্দ বাংলা ১৪/১৬ মাত্রার দ্বিপার্বিক অক্ষরবৃত্তের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ক্যাসিয়াসের উক্তির অনুবাদে দেখি:

মূল পাঠ

Cassius: Why, man, he doth bestride the world
Like a Colossus, and we petty men:
Walk under his huge legs and peep about.

অনুবাদ

ক্যাসিয়াস: দেখিছ না সখা তুমি, সংকীর্ণ এ ধরাপৃষ্ঠে
চাপিয়া বসিয়া আছে বিরাট সীজার?
আর মোরা ক্ষুদ্র জীব পায়ের তলার নীচে
ঘুরিয়া বেড়াই হীন মরণ যাচিয়া।

ইংরেজি ব্লাংক ভার্সের ছন্দ শ্বাসাঘাতভিত্তিক কিন্তু বাংলা ছন্দ অক্ষরভিত্তিক। ইংরেজি ব্লাংক ভার্স বাংলা অমিত্রাক্ষরের সবচেয়ে কাছাকাছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে দুঃসাধ্য সাধনেরই চেষ্টা করেছেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছেন।

---

[৬] গোলাম মুরশিদ, 'বংলায় অনূদিত নাটক' *সাহিত্য পত্রিকা*, চতুর্বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (বর্ষা ১৩৮৮), পৃ. ৬।

[৭] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জুলিয়াস সিজার* (কলকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১৩১৪, ১৯০৭)।

বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ করলে বোঝা যায় তিনি ইংরেজি প্রায় প্রতিটি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে এসেছেন। তবে তিনি অনুবাদের সর্বত্র সমান দক্ষতা দেখাতে পারেননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি যথাযথ প্রতিশব্দ ব্যবহার করেননি এবং ফলে মূলের অর্থহানি ঘটেছে। নিম্নের উদাহরণটি লক্ষ করা যাক:

মূল পাঠ

Cassius : I was born free as Caesar: so were you :
We both have fed as well: and we can both
Endure the winter's cold as well as he!

অনুবাদ

ক্যাসিয়াস : জন্মেছি স্বাধীন হয়ে
সিজারের মত, দুজনেই মোরা পারি
সহিবারে হেমন্তের নিদারুণ শীত।

এখানে winter's cold বলতে 'হেমন্তের নিদারুণ শীত' মূলের শুধু অর্থহানিই ঘটায় না, পুরো আবহ নষ্ট করে। কারণ এখানে শীতের তীব্রতা বোঝাতে winter's cold ব্যবহার করা হয়েছে যা সহ্য করার ক্ষমতা সিজারের থেকে ক্যাসিয়াসের কোনো অংশে কম নয়।

একজন নাট্যকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে অভিনয়গুণ রক্ষার করার চেষ্টা করেছেন। তবে মূলের সাথে তুলনা করলে তিনি বেশি সার্থক হয়েছেন তা বলা যায় না। জুলিয়াস সিজার নাটকের শুরুতে ফ্লেবিয়াসের উক্তি লক্ষ করলেই তা বোঝা যাবে:

মূল পাঠ

Flavius : Hence ! home, you idle creatures, get you home.
Is this a holiday? What! Know you not.
Being mechanical, you ought not to walk
Upon a labouring day without the sign
Of your profession? Speak what trade art thou? (Act I, sc i, line 1-5)

অনুবাদ

ফ্লেবিয়াস: বাড়ী যা, বাড়ী যা তোরা যত অকর্মার দল।
আজ কি ছুটির দিন? তোরা সব কারিগর লোক
তোরা কি জানিস নারে উচিত না করমের দিনে
পথ দিয়া চলা হেন, নিজ নিজ ব্যবসায় চিহ্ন?
বল তুই কি করিস? কিসের ব্যবসা তোর?

রাস্তায় কোনো শ্রমিক শ্রেণীর লোকের প্রতি ফ্লেবিয়াসের ধমকের প্রকৃত নাটকীয় চমৎকারিত্ব এখানে অনুবাদে পুরোপুরি আসেনি। 'বাড়ী যা, বাড়ী যা তোরা যত অকর্মর দল' এর চেয়ে Hence ! home, you idle creatures, get you home অতি বেশি নাটকীয় এবং 'তোরা কি জানিস নারে' এর চেয়ে What! Know you not বেশি নাটকীয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে অতিমাত্রায় প্রচলিত কাব্যধর্মী ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা সাধারণ কথোপকথনের ভাষার উপযোগী নয়। এটি আনুবাদে নাট্যগুণের ঘাটতি হিসেবে ধরা যেতে পারে।

৪. সুধাংশু রঞ্জন ঘোষের অনুবাদ

সুধাংশু ঘোষ শেক্সপিয়রের সবগুলো নাটকের অনুবাদ করেছেন। ৫টি খণ্ডে প্রকাশিত শেক্সপিয়রের রচনাবলির ২য় খণ্ডে 'জুলিয়াস সিজার' এর অনুবাদ পাওয়া যায়।[৮] সুধাংশু ঘোষের অনুবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সরল গদ্যানুবাদ করেছেন। তিনি অনুবাদে মূলের কাঠামোগত এবং ছন্দগত দিকটি বিবেচনায় আনেননি। তিনি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো করেই এ ধরনের অনুবাদে ব্রতী হয়েছেন। অনুবাদের সর্বত্রই তিনি সরল গদ্যানুবাদ করেছেন।

বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় সুধাংশু ঘোষ মূলের প্রতি মোটামুটি বিশ্বস্ত থেকেছেন। তবে তিনি অনেক জায়গাতে কিছু ইংরেজি শব্দের অনুবাদ করেননি আবার কিছু নতুন শব্দ জুড়ে দিয়েছেন। তবে এতে মূল বিষয়বস্তুর বিশেষ কোন হানি ঘটেনি।

যেমন, চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ব্রুটাসের উক্তির কতগুলো লাইন লক্ষ করা যাক :

মূল পাঠ

Brutus : There is a tide in the affairs of men,
Which, taken at the flood, leads on to fortune:
Omitted, all the voyager of their life
Is bound in shallows and in miseries. [IV, i, 246-9]

অনুবাদ

ব্রুটাস: সব মানুষের জীবনসমুদ্রেই আসে সৌভাগ্যের জোয়ার, সে জোয়ারের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়েই মানুষ লাভ করে তার আকাঙ্ক্ষিত সুখ আর সম্পদ। কিন্তু যে সে জোয়ারের সুযোগ নিতে না পারে তার জীবনের জয়যাত্রা দুঃখের চরে যায় অবরুদ্ধ হয়ে।

এখানে tide–'সৌভাগ্যের জোয়ার' taken at the flood–'জোয়ারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার' fortune–'আকাঙ্ক্ষিত সুখ আর সম্পদ' আক্ষরিক অনুবাদ নয় কিন্তু মূলের বিশ্বস্ত অনুবাদ বলা যায়।

সুধাংশু ঘোষের অনুবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, তিনি বাংলাভাষী পাঠকের কাছে অপরিচিতির সমস্যা দূরীকরণের জন্য কিছু কিছু ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গ্রহণে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। যেমন–Tribune শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ জেলা প্রশাসক, Capitol এর প্রতিশব্দ রাজধানী, Praetor এর প্রতিশব্দ ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছেন, ইত্যাদি।

সুধাংশু ঘোষের অনুবাদের কয়েক জায়গায় পর পর কতগুলো ইংরেজি লাইনের অনুবাদ বাদ পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ডেসিয়াসের উক্তি লক্ষ করা যাক:

মূল পাঠ

Decius : Never fear that: if he be so resolv'd,
I can o'ersway him; for he loves to hear
That unicorns may be betray'd with trees,
And bears with glasses, elephants with holes;
Lions with toils and men with flatterers;
But when I tell him he hates flatterers,
He says he does, - being then most flattered
Let me work;
For I can give his humour the true bent,
And I will bring him to the Capitol.

---

[৮] সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ, *শেক্সপীয়র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (কোলকাতা: তুলিকলম, ১৯৭৪)।

অনুবাদ

ডেসিয়াস: তার ভয়ের কিছু নেই। যদি সে তাই ভেবে না আসার সংকল্প করে তাহলে আমি তার সে সংকল্পের পরিবর্তন সাধন করতে পারব কারণ সে তোষামোদ পছন্দ করে। কিন্তু আমি যখন বলি সে তোষামোদ ঘৃণা করে তখন সে তা স্বীকার করে আর আমার সেই কথাটাকেও তোষামোদ ভেবে প্রীত হয়। সুতরাং এ ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি তার মতের পরিবর্তন করে অবশ্যই তাকে নিয়ে আসব পরিষদে।

এখানে মূলের That unicorns... with toils এর কোনো অনুবাদ করা হয়নি।

সুধাংশু ঘোষের অনুবাদে মূল নাটকের যে নাটকীয় গুণ তা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয়নি। উপরের উদাহরণ গুলো থেকে তা অনুমান করা যায়। There is a tide ... fortune 'সব মানুষের জীবনসমুদ্রেই আসে সৌভাগ্যের জোয়ার, সে জোয়ারের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়েই মানুষ লাভ করে তার আকাঙ্ক্ষিত সুখ আর সম্পদ' মূলের মত নাটকীয় গুণ সম্পন্ন নয় এবং পারস্পারিক কথোপকথন উপযোগী হয়নি । অনুরূপভাবে never fear that – 'তার ভয়ের কিছু নেই' অভিনয়ের চেয়ে বেশি পঠন উপযোগী ভাষা।

৫. সৈয়দ শামসুল হকের 'গণনায়ক'

সৈয়দ শামসুল হক 'জুলিয়াস সিজার' নাটকটির হুবহু অনুবাদ করেননি। 'জুলিয়াস সিজার'-এর মূল প্লট মোটামুটি ঠিক রেখে সৈয়দ হক বাংলাদেশের পটভূমিতে 'গণনায়ক' নামে নাটকটির একটি অনুকৃতি রচনা করেছেন । রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে একটি সাধারণ ঘটনা। সৈয়দ হক সম্ভবত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জুলিয়াস সিজার নাটকের কাহিনীর একটি মিল খুঁজে পেয়েছেন এবং এবং কাল্পনিক নাম ব্যবহার করে তিনি সেই ঘটনার ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। 'গণনায়ক' সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় সৈয়দ হক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকটির অনুবাদ করেননি, আবার 'গণনায়ক'-কে রূপান্তরিত রচনাও তিনি বলতে চাননি: বরং তিনি পাঠক বা দর্শকদেরকে একটি ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য শেক্সপিয়র রচিত কিছু চরিত্র, কিছু দৃশ্য বর্জন করেছেন, কিছু নতুন দৃশ্য রচনা করেছেন এবং কিছু চরিত্রের নতুন লক্ষণ ও পরিণতি দান করেছেন। সৈয়দ হক একথাও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্তগুলো স্থাপিত করানোর জন্য জুলিয়াস সিজার নাটকটিকে একটি নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন এবং তা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়।

শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার' এবং সৈয়দ শামসুল হকের 'গণনায়ক' পাশাপাশি রাখলে কাহিনীর ও চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। জুলিয়াস সিজার নাটকের জুলিয়াস সিজারকে গণনায়ক ওসমানের সাথে তুলনা করা যায়। অনুরূপভাবে ব্রুটাস → হুমায়ুন, ক্যাসিয়াস → সানাউল্লাহ, অ্যান্টনি → রশিদ, ডেসিয়াস → দাউদ চৌধুরী, সিসারো → কাশেম খাঁ, মেটেলাস সিম্বার → ফজলুল, লুসিয়াস → আকবর, ক্যালিফোর্নিয়া → রাষ্ট্রপতি ওসমানের স্ত্রী, ফ্লেভিয়াস/মারুলাম → সিকান্দার/মির্জা ইত্যাদি চরিত্রগুলো দুটি নাটকেই সমান্তরাল ভূমিকা পালন করে।

জুলিয়াস সিজার নাটকটির শুরু হয় ফ্লোবিয়াসের উক্তি দিয়ে। এই উক্তিতে ফ্লোবিয়াস ও মারুলাস নামে মেয়র শ্রেণীর দুইজন লোককে সিজারের বিজয় উৎসবে শরিক হওয়ার জন্য দুইজন শ্রমিককে ধমক দিতে দেখা যায় । ফ্লেবিয়াস ও মারুলাসের উক্তির মধ্য দিয়ে নাটকের মূল আবহ

অর্থাৎ সিজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস ফুটে ওঠে। একই ধরনের ঘটনা আমরা দেখতে পাই গণনায়কের শুরুতে। এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিকান্দার ও তথ্যমন্ত্রী মির্জার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গণনায়ক ওসমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে বিশাল জনসমাবেশে সিজারকে মুকুট পরানোর ঘটনা গণনায়কে এসেছে ওসমানকে ফুলের মালা পরানো হিসেবে, সিজারের এপিলেপসি বা মূর্ছা রোগ, ওসমানের গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা, জুলিয়াস সিজারে প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা ও প্রকৃতির অস্বাভাবিক রুদ্ররোষ 'গণনায়ক'-এ এসেছে ভয়াল পঁচিশে মার্চের রাত হিসেবে, জুলিয়াস সিজারকে গণক সতর্ক করে দেয় 'আইডিস অব মার্চ' সম্পর্কে, গণনায়ক ওসমানকে বরিশালের সদস্য নরেন্দ্রনাথ সতর্ক করিয়ে দেয় 'অঘ্রানের কৃষ্ণা দশমী' সম্পর্কে। সিজারকে হত্যা করা হয় সভাভবন প্রাঙ্গণে গণনায়ককেও হত্যা করা হয় সংসদভবন প্রাঙ্গণে, সিজারের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় মার্কেট প্লেসে, যেখানে জনতার সামনে বক্তৃতা করেন ব্রুটাস ও অ্যান্টনি। 'গণনায়ক'-এ ওসমানের মৃতদেহ সংসদকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সংসদ সদস্যদের সামনে বক্তৃতা করে হুমায়ুন ও রশিদ আলী, ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস এবং তাঁদের অনুসারীরা পালিয়ে আশ্রয় নেয় রোমের নিকটবর্তী সার্দিসে, 'গণনায়ক'-এ হুমায়ুন ও সানাউল্লাহ পালিয়ে আশ্রয় নেয় যমুনার ওপারে নগরবাড়িতে। সিজার বিরোধী শক্তির পরাজয়ের পর অ্যান্টনি, অক্টেভিয়াস সিজার এবং লেপিডিয়াস রোমের ট্রায়াম্ভিরেটু (৩ জন শাসক) হন, অন্যদিকে মৃত ওসমান অনুসারী শক্তির জয়ের ফলে ওসমানের স্ত্রীকে পুতুল সরকার বানিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে।

সৈয়দ শামসুল হক নিঃসন্দেহে 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের বেশ কিছু অংশের সরাসরি অনুবাদ করেছেন এবং বেশ বিশ্বস্ত অনুবাদ বলা যায়। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ওসমানের উক্তি লক্ষ করা যাক:

ক্যাসিয়াস: কাপুরুষ মৃত্যুর আগে বারবার মরে
বীর শুধু একবার। দীর্ঘ এ জীবনে
আমাকে অবাক করে দিয়ে যায় শুধু এই আবিষ্কার
যে, মৃত্যুই নিশ্চিত তবু মৃত্যুকেই লোকে ভয় পায়
ভয়াবহভাবে। মৃত্যু আসে, যখন সে আসে।

পুনরায়, ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে ব্রুটাসের উক্তির অনুবাদে দেখি:

মূলপাঠ

Brutus: As Caesar loved me I weep for him; as he was fortunate, I rejoice at it; as he was valiant I honour him; but as he was ambitious, I slew him. There is tears for his love; joy for his fortune; honour for his valour; and death for his ambition"

অনুবাদ

হুমায়ুন: স্নেহশীল তিনি, তাই কাঁদি। কীর্তিমান, তাই উল্লাস করি।
সংগ্রামী, তাই গৌরব করি, কিন্তু প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী।
তাই আঘাত করি। ভালবাসায় অশ্রু, কীর্তিতে উল্লাস।
সংগ্রামে গৌরব, আর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মৃত্যু।

'গণনায়ক'-এর কিছু কিছু অংশ 'জুলিয়াস সিজার'-এর ভাবানুবাদ বা রূপান্তরিত অনুবাদ বলা যায়। কারণ সৈয়দ হক স্বদেশের সামাজিক পটভূমিতে 'জুলিয়াস সিজার'-এর কাহিনী স্থাপন করে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণীয় করার চেষ্টা করেছেন। যেমন প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে হুমায়ুনের উক্তি লক্ষ করা যাক:

মূল পাঠ

Brutus: Brutus had rather be a villager
Than to repute himself a son of Rome
Under these hard conditions as this time
Is like to lay upon us.

অনুবাদ

হুমায়ুন: আমি বরং অখ্যাত কোন জলার ধারে বাসা বাঁধব
তবু বঙ্গোপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে
নিজেকে বঙ্গ সন্তান বলে দাবি করব না, যখন
যে কোন মুহূর্তে সে আমাদের ভাসিয়ে নেবে
ঘূর্ণিঝড়ের জলোচ্ছ্বাসে।

পুনরায়, প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ক্যাসিয়াসের উক্তির অনুবাদ:

Cassius: Were I a common laughter, or did use
To state with ordinary oaths my love
To every new protester, if you know,
That I do fawn on men: and hug them hard.
And after scandal them:..." [I. ii. line 77-81]

অনুবাদ

সানাউল্লাহ: ... হতাম যদি কোন পত্রিকার ভাড়াটে লেখক, কিংবা
সংসদের এমন সদস্য যিনি নির্বাচনের আগে
যে দলের নৌকা উদ্দাম তাতেই গিয়ে চড়ে বসেছেন,
অথবা এমন কেউ যিনি বন্ধুত্বে মুখর, কিন্তু
পুলিশকে গোপনে তথ্য যোগাতে সর্বাগ্রে...।

সৈয়দ হকের 'গণনায়ক'-কে যেমন পুরোপুরি অনুবাদ বলা যায় না, আবার একে পুরোপুরি ভাবানুবাদও বলা যায় না। কারণ সৈয়দ হক কাহিনীর পরিণতিকে একদিকে যেমন আভিনবত্ব দান করেছেন এবং অন্যদিকে বেশ কিছু চরিত্র চিত্রণে ভিন্নতা দেখিয়েছেন । যেমন Octavious Caesar এবং Antony-এর চরিত্র 'গণনায়ক' এর জেনারেল চৌধুরী এবং রশীদ আলীর চরিত্রের সাথে হুবহু এক করে দেখা যায় না। 'জুলিয়াস সিজার'-এ Antony, Octavious Caesar এবং Lepidus যোগ্য শাসকত্রয় রোমের অধিপতি হন এবং সেখানে নেতৃত্বের কোনো সংকট দেখা দেয় না। কিন্তু গণনায়কের শেষ দিকে দেশের এক অশুভ ভবিষ্যতের আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়েছে। জেনারেল চৌধুরী রাষ্ট্রপতির বিধবা স্ত্রীকে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করে।

সৈয়দ হক 'জুলিয়াস সিজার'-এর যেসব অংশের অনুবাদ ও ভাবানুবাদ করেছেন তা চমৎকার। তবে 'জুলিয়াস সিজার' ও 'গণনায়ক' এর শিল্পমূল্য তুলনা করলে একথা বলতেই হয় যে শেক্সপিয়র 'জুলিয়াস সিজার'-এ যে আবহ ও ট্রাজিক আবেগময়তা সৃষ্টি করেন এবং চরিত্র চিত্রণে যে দক্ষতা প্রর্দশন করেন, 'গণনায়ক'-এ তা সেভাবে আসেনি। তবে শেক্সপিয়রের কোনো নাটক অবলম্বনে এ ধরনের একটি নাটক রচনা বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন বলা যায়। নাটকটির আলোচনা করতে গিয়ে কবীর চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, সৈয়দ হক 'গননায়ক'-কে এক অগ্রজ বিশ্বনন্দিত তুলনাহীন নাট্যকারের রচনার উপর ভিত্তি করেও একটি স্বকীয় স্বতন্ত্র ও নতুন রচনার স্বাদ মণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছেন।[১]

৬. তুলনামূলক আলোচনা

আলোচ্য অনুবাদ তিনটির মধ্যে কোনটি মূল নাটকের কাছাকাছি, অথবা নাটক হিসেবে অনুবাদগুলো কতোটা সার্থক এই দুই ভাবে বিচার করা যায়। প্রথমোক্ত মাপকাঠিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত মাপকাঠিতে তা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। একই ভাবে সৈয়দ শামসুল হকের অনুবাদ প্রথমোক্ত মাপকাঠিতে মেলানো কঠিন, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত মাপকাঠিতে তা রীতিমতো উত্তীর্ণ বলা যায়। অনুবাদ দুটোর যে কোনো একটি এভাবে একদিকে সার্থকতা দেখায়, অন্য দিকটায় থেকে যায় অপর্যাপ্ততা। সুধাংশু রঞ্জন ঘোষের অনুবাদটি কোনো মাপকাঠিতেই অপর দুইটি অনুবাদের কোনটিকেই অতিক্রম করতে পারে না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য তিনি শেক্সপিয়রের নাটকের বক্তব্যের পাশাপাশি, সেই নাটকের ভাষা শৈলীকে অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন এবং সমকালীন বাংলা ভাষারীতিতে তা রূপান্তরের চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি ছন্দ-অলঙ্কারের প্রতিও তাঁর বিশেষ খেয়াল ছিলো।

সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ শেক্সপিয়রের কাব্যিক ভাষা সরল গদ্যে অনুবাদ করেছেন। তাই তিনি ইংরেজি একটি ছোট বাক্যকে ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে বা একটি বড় বাক্যকে কমিয়ে মূল বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার ভাষা চয়ন বেশ সাবলীল হওয়ায় অনুবাদ সুপাঠ্য হয়ে উঠেছে। তবে তার অনুবাদে নাটকীয় গুণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। মূলত তার অনুবাদের মূল লক্ষ্য পাঠক, মঞ্চ নয়।

শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার' এর ১ম অঙ্কের ২য় দৃশ্যে ব্রুটাসকে উদ্দেশ্য করে ক্যাসিয়াসের একটি উক্তির অনুবাদ তিন জন অনুবাদক কিভাবে করেছেন তা দেখানো হলো, – এর মাধ্যমে অনুবাদটির প্রকৃতিগত তফাত আংশিক ভাবে হলেও উপলব্ধি করা সম্ভব:

Cassius : Men at sometime are masters of their fates :
The fault, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves, that we are underlings.

---

[১] কবীর চৌধুরী, *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (ঢাকা: শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ২৪৮।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ:

ক্যাসিয়াস : কখন কখন নর নিজ অদৃষ্টের প্রভু:
আমাদের নক্ষত্রের নাই কোন দোষ
দোষ আমদেরি সখা—মোরা ক্ষুদ্র বলি।

সুধাংশু ঘোষ:

ক্যাসিয়াস: মানুষ অনেক সময় ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে বড় হতে পারে ব্রুটাস। সুতরাং দোষটা আমাদেরই, আমরা যে অনেক সময় বড় হতে পারি না জীবনে সে দোষ আমাদের গ্রহনক্ষত্রের নয়।

সৈয়দ হক:

সানাউল্লাহ: মানুষ নিজেই নির্মাণ করে তার ভবিষ্যৎ।
দোষটা গ্রহনক্ষত্রের নয়, আমাদের, যে —আমরা
নেতৃত্ব দেবার বদলে মেনে নেই নেতৃত্ব।

মূলের 'men at sometime are masters of their fates' এর মধ্যে 't' স্বর এর যে অনুপ্রাস ব্যবহৃত হয়েছে, ন-এর অনুপ্রাস ব্যবহার করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সমতা আনয়নের চেষ্টা করেছেন। তবে সাবলীলতা ও নাটকীয়তার বিচারে তিন জনের মধ্যে সৈয়দ হকের ভাষা নিঃসন্দেহে সেরা। উদ্ধৃত উক্তিটি শেক্সপিয়রের অনেক বিখ্যাত উক্তির মধ্যে একটি। এ উক্তিটির মধ্যে আছে গভীর ব্যঞ্জনা। যতি ও অলঙ্কারে মধ্য দিয়ে তা যতটা মূর্ত হয়ে ওঠে, একমাত্র সৈয়দ হকের অনুবাদেই তার প্রতিরূপ লক্ষ করা যায়। মূলের 'the fault, dear Brutus, is not in our stars.' যে কথোপকথনের গতিময়তা সৃষ্টি করে তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদে তেমন আসেনি সুধাংশু ঘোষের অনুবাদেও তাই, কিন্তু সৈয়দ শামসুল হকের অনুবাদে বেশ ভালোভাবে এসেছে। যেমন মূলে সরাসরি ব্রুটাসকেক সম্বোধন এবং কমা (,) ব্যবহারের মধ্যে যে গতিময়তা ও মুখোমুখি সংলাপের ভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে, তা সৈয়দ হকে কমা (,) ও ড্যাশ (—) ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে।

৭. উপসংহার

বাংলা ভাষায় 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের যে তিনটি অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর কোনোটিই মূল নাটকের তূল্যমূল্য কোনো অনুবাদ তা বলা যাবে না। তিন ধরনের তিনটি অনুবাদের মাধ্যমে বোঝা যায় কিভাবে শেক্সপিয়রকে নানা আঙ্গিকে অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এ তিনটি অনুবাদের কোনোটিই শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নয়। এগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

'জুলিয়াস সিজার', সুধাংশু ঘোষের 'জুলিয়াস সিজার' এবং সৈয়দ শামসুল হকের 'গণনায়ক'। নাটক লিখিত হয় অভিনয়ের জন্য এবং অভিনয়ের মাধ্যমেই তা পূর্ণতা লাভ করে। নাটকের ভাষায় থাকে অভিনেতার নানা অঙ্গভঙ্গির ইঙ্গিত এবং অভিনেতার সাথে দর্শকের মিথস্ক্রিয়া। ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে এবং ভিন্ন ভাষায় মূলের এই সব ভঙ্গি বা জেশ্চার প্রকাশের ইঙ্গিত অনুবাদে ফুটিয়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। যে তিনটি অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করা হলো এগুলোর মধ্যে সৈয়দ শামসুল হকের 'গণনায়ক'-এ এসব নাটকীয় গুণের উপস্থিতি যথেষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুধাশু রঞ্জনের অনুবাদ মঞ্চ উপযোগী নয়। তবে মূলের সাথে সামগ্রিক সামঞ্জস্য অনুসন্ধান করলে বলতে হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ মূলের বেশি কাছাকাছি এবং, সৈয়দ শামসুল হক একজন সৃষ্টিশীল অনুবাদক।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী': দেশ-কাল

মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ*

Abstract: Abu Ishaq is widely recognized as a social-realistic artist. He was a distinguished novelist of the fifties decade in Bangladesh. *Shurya Dighal Bari* is one of his greatest works. The leit-motif of this novel is based on the observation of the preceding and subsequent years. of the partition of the country. The worth mentioning events of this period are—the great and devastating famine, partition and communal riot. The story is composed on these disasters. The socio-economic and political condition of the then time is also critically sketched by the author. So *Shurya Dighal Bari* is a piece of evidence of contemporary time and place.

ভূমিকা

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি নিভৃতচারী লেখক।[১] কালিক অভিধায় তিনি পঞ্চাশের দশকের সাহিত্যিক। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ রচনা করলেও আবু ইসহাকের প্রতিষ্ঠা প্রধানত ঔপন্যাসিক হিসেবে।[২] তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫), 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬) এবং 'জাল' (১৯৮৯)। অবশ্য গোয়েন্দা-আখ্যান বলে শেষোক্ত রচনাটিকে উপন্যাসের শ্রেণিভুক্ত করা যায় না। স্বয়ং লেখকও এ সম্পর্কে নিঃসংশয় নন।[৩] তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'। এ উপন্যাসের শৈল্পিক সার্থকতা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে;[৪] তবুও সন্দেহাতীতভাবে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। কোনো কোনো সমালোচক এটিকে ধ্রুপদী সাহিত্যের শ্রেণিভুক্ত করা যায় বলেও মত প্রকাশ করেছেন।[৫] উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৫৫ সাল হলেও মূলত এর রচনাকাল ১৯৪৭-৪৮।[৬] 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'

---

* ড. মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১ হামিদ কায়সার, "কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের সাক্ষাৎকার", *দৈনিক সংবাদ*, ৯ মাঘ ১৪০৪।

২ মহম্মদ রেজাউল হক, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৩২১।

৩ আবু ইসহাক, "ভূমিকা", *জাল* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৯৮৯), পৃ. ৭।

৪ রশীদ করীম, "একটি বিখ্যাত উপন্যাস", *আর এক দৃষ্টিকোণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৬৭-৮১।

৫ স্বরোচিষ সরকার, "আবু ইসহাক জয়যুক্তেষু", *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ ফাল্গুন, ১৪০৯।

৬ আমিনুর রহমান সুলতান, "কথাশিল্পী আবু ইসহাকের সাক্ষাৎকার", *দৈনিক সংবাদ*, ৪ আশ্বিন ১৪০৯।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৯৫০-৫১ সালে 'নওবাহার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[৭] পরে কলকাতার নবযুগ প্রকাশনী গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করে।[৮] দুর্ভিক্ষ, দেশ-বিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো ঐতিহাসিক ঘটনাবলি 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত। তাছাড়া এতে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতিফলনও ঘটেছে। তাই 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে দেশ-কালের রূপায়ণ কতটা হয়েছে তা অন্বেষণই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট।

কথাসাহিত্যিকের অন্যতম অভীষ্ট হলো পারিপার্শ্বিক-বিশৃঙ্খল-বাস্তবকে নির্দিষ্ট রূপবন্ধনে ধরা। যে কোনো ঘটনা বা বাস্তবতা উপজীব্য হতে পারে, কিন্তু তাকে শেষপর্যন্ত কথাসাহিত্যের বিষয় করে তুলতে হলে কথাশিল্পীর নান্দনিক-জীবনগত দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে উত্তীর্ণ হতে হয়।[৯] তবে কথাসাহিত্যে 'প্রবহমান সময়ের বস্তুগত চেহারা' সাহিত্যের যে কোনো শাখার চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ।[১০] তাই কথাসাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধ ও প্রজ্ঞা কেবলমাত্র জন্মগতসূত্রে গড়ে ওঠে না; এর সঙ্গে প্রয়োজন হয় বস্তুজগৎ সর্বোপরি স্থান ও কালের অভিঘাত। কেননা:

> বস্তুজগতের অভিঘাত আমাদের অনুভব-তন্ত্রে সক্রিয় হয়েই জ্ঞানলাভের পথ নির্দেশ করে। বস্তুজগৎ বলতে স্থান (Space) এবং কাল (Time) বোঝায়। যুক্তিগত বিশ্লেষণ দিয়ে আমরা বলতে পারি জ্ঞানের মূল উপাদান হচ্ছে সংবেদন: এবং উক্ত সংবেদন উদ্রিক্ত হয় স্থান-কাল-বিধৃত জগতের সহস্রমুখী অভিঘাতে।[১১]

মানব মনের সামগ্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উৎসে বস্তুজগতের ক্রিয়াশীলতাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই যে কোনো সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মের বস্তুলোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর দেশ-কালের পটভূমির ওপর নির্ভরশীল। আবার সেই সাহিত্যিক যদি হন কথাশিল্পী তাহলে তাঁর সৃষ্টিকর্মে নিজস্ব সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা, সমকালীন-ভাবলোক, চিন্তাচেতনা ইত্যাদির উপস্থিতি অনিবার্য। একজন ঔপন্যাসিককে নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হয়। ফলে কথাসাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মে যেমন দেশ-কাল ও বস্তুজগৎ প্রতিফলিত হয়, তেমনি আবার সেই দেশ-কাল, সমাজ-পারিপার্শ্বিকতাই তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আলোচ্য কথাসাহিত্যিকও এ বিবেচনার বাইরে নন।

পটভূমি

আবু ইসহাকের জন্ম শরিয়তপুরের নড়িয়ার শিরঙ্গল গ্রামে।[১২] এটি নিভৃত পল্লীগ্রাম। শিরঙ্গলে তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার যে প্রকাশ ও সাফল্য, তার পরিপুষ্টিতে এ গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কেননা জন্মই শুধু নয়, তাঁর

---

[৭] হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন:সাহিত্যিক পটভূমি* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০), পৃ. ২৪।

[৮] শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ২৬৫।

[৯] পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব* (ঢাকা:র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৪), পৃ. ১৯।

[১০] আবু হেনা মোস্তফা কামাল, "বাংলাদেশের কথাসাহিত্য : বিষয়-আশয়", *কথা ও কবিতা* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮১), পৃ. ১০৭।

[১১] সৈয়দ আকরাম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস:দেশ-কাল ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯), পৃ. ১৭।

[১২] আমিনুর রহমান সুলতান, *পূর্বোক্ত*

মননের বিকাশও ঘটেছে প্রামীণ প্রতিবেশে। পরবর্তীকালে আবু ইসহাক জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে শহরে বসবাস করেছেন; কিন্তু তাঁর সাহিত্যচর্চার পটভূমিতে সর্বদা গ্রামের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়। তিনি আজীবন গ্রাম ও গণমানুষের প্রতি প্রাণের তীব্র টান অনুভব করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন:

> বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমি কাজ করেছি। শহরে বসবাস করলেও গ্রামের সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ কখনো ছিন্ন হয়নি। গ্রাম আমার স্মৃতিতে বার বার এসেছে।[১৫]

অন্যদিকে উপমহাদেশের সমকালীন ঘটনাবহুল রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সংকট আবু ইসহাক প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে স্বদেশের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অভ্যুদয়, ভাষা-আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ তাঁর সচেতন মন এড়িয়ে যায়নি। বরং এ সব উত্তাল ঘটনা তিনি কৈশোর ও যৌবনে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেন। ফলে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে বিশেষত তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, দেশ-বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষা-আন্দোলন ইত্যাদি পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর-উত্তর প্রেক্ষাপট 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের পটভূমি। লেখক স্বয়ং দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বাংলার দুর্বিষহ মন্বন্তর। এমনকি ইসহাক এ সময়ে লঙ্গরখানায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজও করেন।[১৪] তাই মন্বন্তর সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও ক্ষুণ্নিবৃত্তির সমস্যা তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সুতরাং 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' রচনার প্রেরণা তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ-কালের প্রত্যক্ষ চালচিত্র থেকেই পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আবু ইসহাক 'নির্ভর করেছেন নিজের সামগ্রিক জীবনোপলব্ধির উপর, নিজের সহানুভূতি, দরদ ও মমত্ববোধের উপর।'[১৫] অবশ্য লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া মানুষের প্রতি দরদ বা মমত্ববোধের উন্মেষ ঘটতে পারে না। প্রসঙ্গত তাঁর স্মৃতিচারণ স্মর্তব্য:

> ১৯৪৪ সালে আমার পোস্টিং হয় নারায়ণগঞ্জে।...ছুটির দিনে নারায়ণগঞ্জ থেকে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করার জন্য ঢাকায় যেতাম। তখন দেখতাম জয়গুনের (সূর্য-দীঘল বাড়ী'র প্রধান চরিত্র) মতো মেয়েদের চাল কেনার জন্য ময়মনসিংহ যেতে। আবার বিকেলেও, ফেরার সময় দেখতাম ওদের। ফতুল্লায় পৌঁছার আগেই ওরা ট্রেন থেকে চালের থলে দুপদাপ ফেলে দিত। ওখানে দু-একটা ছেলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত। এ বিষয়টা নিয়েই একটা গল্প লিখতে শুরু করি। লিখতে লিখতে মনে হলো এটার মধ্যে উপন্যাসের এলিমেন্ট আছে।[১৬]

উপন্যাসটি প্রধানত নারায়ণগঞ্জে রচিত হলেও এর শেষের কিছু অংশ লেখক রচনা করেন পাবনায় চাকরিসূত্রে অবস্থানকালে।[১৭] তবে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে বিবৃত ভৌগোলিক পটভূমি সুস্পষ্ট। তৎকালীন ঢাকা জেলার ফতুল্লা রেলস্টেশন সংলগ্ন একটি গ্রাম, ফতুল্লা রেলস্টেশন, চাষাড়া,

---

[১৫] নাসির আলী মামুন, "জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি", *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ নভেম্বর ২০০১।

[১৬] হামিদ কায়সার, *পূর্বোক্ত*।

[১৭] মুনীর চৌধুরী, "সূর্য-দীঘল বাড়ী", *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ নভেম্বর ১৯৫৫।

[১৪] হামিদ কায়সার, *পূর্বোক্ত*

[১৫] স্বরোচিষ সরকার, *পূর্বোক্ত*।

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা রেলস্টেশন, ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থান এ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ব্যবহৃত ভাষা ও সংলাপ এ বিশেষ অঞ্চলের স্থানিক পটভূমিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। তাছাড়া এ উপন্যাসে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পটভূমি ছাড়াও পূর্ববঙ্গের একটি বিশেষ কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত রূপায়িত হয়েছে। তাই ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক পটভূমির বিবেচনায় 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটিকে সম্পূর্ণভাবে পূর্ববঙ্গীয় বা বাংলাদেশের বলা যায়।

মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ

দেশ-বিভাগের কিছু পূর্ব থেকে পরবর্তী কয়েক বছরের প্রেক্ষাপট 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র উপজীব্য। তাই এ সময়ের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক নানা ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চালচিত্র পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। এ কালপর্বে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে মন্বন্তর প্রত্যক্ষ পটভূমি হিসেবে উপস্থাপিত হয়নি সত্য; কিন্তু মন্বন্তরপীড়িত দুটি পরিবারের আখ্যান এর উপজীব্য। এ উপন্যাসে দরিদ্র মানুষদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিরন্তর সংগ্রাম চলে পশ্চাৎপদ সামন্তবাদী গ্রামীণসমাজ সর্বোপরি 'সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতির বিষদুষ্ট' ক্ষতের বিরুদ্ধে।[১৯] দুর্ভিক্ষের ছোবল থেকে বেঁচে যাওয়া জয়গুন, হাসু, মায়মুন, শফি ও শফির মায়ের গ্রামে নিজেদের ভিটে-মাটিতে ফিরে আসার দৃশ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। দুর্ভিক্ষের দুঃসহ ক্ষত তাদের মন ও শরীরে:

> অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে; কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। তাদের শির-দাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ— শুষ্ক ও বিবর্ণ।[২০]

দুর্ভিক্ষে তাদের অনেকেই স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই-বোন হারিয়ে গ্রামে ফেরে। জয়গুনের কোলের মেয়ে শিশুটির মৃত্যু হয়। আর শফীর মা হারায় তার ছেলেকে। ভাতের লড়াইয়ে পরাজিত মানুষ তারা। অথচ মন্বন্তরের সর্বগ্রাসী ছোবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা শহরে আশ্রয় নিয়েছিল:

> অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। ভিমরি খেয়ে গড়াগড়ি যায় নর্দমায়। এক মুঠো ভাতের জন্য বড় লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়।[২১]

মানবিক বোধহীন শহুরে তথাকথিত সভ্য মানুষের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে এ উপন্যাসে। মাত্র কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে আবু ইসহাক দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর বাস্তবতাকে জীবন্ত করে এঁকেছেন। অনুমান করা যেতে পারে, এ চিত্র ঢাকা শহরের। উল্লেখ্য যে, 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটির কিছু পূর্বে রচিত

---

[১৯] আতোয়ার রহমান, "বিভাগোত্তর কালের উপন্যাস", *সাহিত্য-সংলাপ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৫), পৃ. ১৪০।

[২০] আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, পাকিস্তানি ১ম সংস্করণ, ১৯৬২), পৃ. ১।

[২১] *তদেব*।

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটকেও তেতাল্লিশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে কলকাতা শহরে গ্রামের মানুষের অসহায় শোভাযাত্রা ও নীরব মৃত্যুবরণের বাস্তব চিত্র মেলে।[২১]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে বিবৃত কালপর্বে এদেশের রাজনৈতিক পটভূমি ছিল প্রচণ্ড সংক্ষুব্ধ। এ উত্তাল সময়ের নানা ঘটনা এ উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। লাহোর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্র গঠন ছিল অনিবার্য।[২২] তাই পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ কলকাতায় বিশেষ দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিলে সমগ্র ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে।[২৩] তৎকালীন পূর্ববঙ্গও এ সংকট থেকে মুক্তি পায়নি। নোয়াখালীসহ বিভিন্ন স্থানে মর্মান্তিক ও ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে হাসুর মনে পড়ে এক বছর পূর্বের সেই ভয়াবহ দাঙ্গার কথা :

> রাস্তায় উঠেই সে চমকে ওঠে। চারদিক থেকে চীৎকারের ধ্বনি শোনা যায়। হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি শুরু হল না ত ! ...মারামারি বাধলে কোন কাজই হবে না আজ। গত বছর এমন দিনে মারামারি বেধেছিল। পনেরো দিন সে ঘরের বার হতে পারেনি। তিনদিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে।[২৪]

স্বাধীনতার স্বপ্ন ও দেশভাগ

লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। স্বভাবত তারা পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে। এমনকি সাধারণ মানুষদের মনেও নানা কৌতূহল ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আবার এ সম্পর্কে কারো মনে যে কোনো শঙ্কা ছিল না তা-ও নয়। তাই এ সময়ে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পাকিস্তানের আসন্ন স্বাধীনতার উত্তেজনায় যেমন সংক্ষুব্ধ ছিল, তেমনি এ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণের চিন্তায় দ্বিধান্বিতও ছিল। এ কালের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মনে যে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে এভাবে :

> — আইচ্ছা মামু, স্বাদীন অইলে খাজনা দিতে অইব নি?
> — না, না, খাজনা দিলে আবার স্বাদীন অইল কি?
> অপর একজন বলে— না মিয়া, রাজার খাজনা মাপ নাই, দিতেই অইব।[২৫]

রেলযাত্রীদের এ তর্ক জয়গুন প্রত্যক্ষ করে, তবে নিজে এতে অংশ নেয়নি। সে নিচুতলার মানুষ। কিন্তু তার স্বপ্ন দেখতে তো বাধা নেই। তাই সব দরিদ্র মানুষের মতো জয়গুনের আশা-আকাঙ্ক্ষাও কেবল অন্ন-বস্ত্র নিয়ে। পাকিস্তানের অভ্যুদয়কে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের দরিদ্র ও

---

[২১] বিজন ভট্টাচার্য, *নবান্ন* (কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, ৪র্থ প্রমা সংস্করণ, ১৯৯২), পৃ. ৭৪-১০৮।

[২২] সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *রাজনীতির অভিধান* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭), পৃ. ১৬৬।

[২৩] মুহম্মদ আব্দুল রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ৯ম সংস্করণ, ২০০১), পৃ. ৪৪২।

[২৪] আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

[২৫] *তদেব*, পৃ. ২৬।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমকালীন সেই আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হয়েছে জয়গুনের প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে:

> জয়গুন মন দিয়ে শোনে সব কথা। একটি কথাই তার ভালো লাগে, আশা জাগে মনে— চাল সস্তা হবে, কারো কোনো কষ্ট থাকবে না।[২৬]

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট দেশভাগ হয় এবং পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। দীর্ঘকালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক শাসনের সর্বগ্রাসী ছোবল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ অবশেষে মুক্তি লাভ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির নেপথ্যে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বিশেষত মুসলমানদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। কেননা আর্থ-সামাজিক ও নানা ঐতিহাসিক ঘটনার দিক থেকে এ অঞ্চলের মুসলিম-সম্প্রদায়ের কাছে আপাতভাবে হলেও এ স্বাধীনতা যথেষ্ট তাৎপর্যবহ বলে মনে হয়।[২৭] তাছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনকারীরা 'হিন্দু জমিদারের শোষণ থেকে মুসলিম চাষীর মুক্তি এবং হিন্দু ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা থেকে স্বল্প পুঁজির মুসলমান ব্যবসায়ীদের রক্ষা এবং শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি' দেওয়ায় এ আন্দোলন তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছিল।[২৮] তাই পাকিস্তানের স্বাধীনতার সংবাদে সমগ্র পূর্ববঙ্গ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে এ ঐতিহাসিক দিনটি জীবন্ত হয়ে আছে এভাবে :

> একটা গাড়ী আসছে নারায়ণগঞ্জ থেকে। ইঞ্জিনের সামনে একটা নিশান পত্ পত্ করছে বাতাসে। সবুজ রঙের বড় নিশান। মাঝে চাঁদ ও তারা। গাড়ীর মাঝেও চীৎকার। চারদিকের চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠছে। গাড়ীটা কাছাকাছি আসতে স্পষ্ট বোঝা যায়—
>
> আজাদ পাকিস্তান— জিন্দাবাদ!
>
> কায়েদে আজম— জিন্দাবাদ!
>
> হাসুর গা রোমাঞ্চিত হয় আনন্দে। সে চেয়ে থাকে। গাড়ীর প্রত্যেকটি লোক আনন্দ-চঞ্চল। অনেকের হাতেই নিশান।[২৯]

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের হাসু জাহাজ-ঘাটের কুলিগিরি ফেলে আনন্দে মিছিলের সাথে মিশে যায়। দেশের সমস্ত দরিদ্র মানুষেব মতো হাসুর হতদরিদ্র মা জয়গুনও স্বাধীনতার কথা শুনে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। ছেলের আনন্দে শরীক হতে সে তার জীর্ণ পুরনো সবুজ শাড়ির অংশ বিশেষ ছিঁড়ে দেয়। সেই শাড়ি পাকিস্তানের পতাকা হয়ে আকাশে উড়তে থাকে। আর—

> জয়গুন নিশানটার দিকে তাকায়। সবুজ নিশান নতুন জীবনের আভাস দিয়ে যায়। মনে জাগে বাঁচবার আশা।[৩০]

বাস্তুত্যাগ ও শরণার্থী সমস্যা

দেশ-বিভাগের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশ এক মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল। কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে বাস্তুত্যাগ করতে বাধ্য হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে

---

[২৬] *তদেব*।

[২৭] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০), পৃ. ৯৪-৯৫।

[২৮] সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৩।

[২৯] আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

[৩০] *তদেব*, পৃ. ৪৫।

এক অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এ পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তোলে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তান এবং ভারত উভয় দেশই অনাকাঙ্ক্ষিত শরণার্থী-সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ ঐতিহাসিক মুহূর্তের দলিল হয়ে আছে যে সব উপন্যাস তার মধ্যে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' অন্যতম।[৩১] এ উপন্যাসে শরণার্থীদের বিবরণ :

> আজকাল যাত্রীর সংখ্যা খুবই বেড়েছে। বাইরের থেকে যেমন বহুলোক আসছে, আবার বাইরেও যাচ্ছে তেমনি। বিশ্রাম-ঘরে গাজাগাজি হয়ে আছে লোক। জাহাজে, গাড়ীতে জায়গা হয় না। অনেক যাত্রীকেই দু'তিন দিন ষ্টেশনে পড়ে থাকতে হয়। ছেলেমেয়ে মা-বউ নিয়ে আবার অনেক বিদেশী আশ্রয় নিয়েছে ষ্টেশনের চালা ঘরে।[৩২]

দেশ-বিভাগের অনিবার্য ফলাফল ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ইত্যাদি ঘটনা সাধারণ মানুষের জীবনে গভীর সংকট হিসেবে দেখা দেয়। বাঙালির মূল্যবোধ এবং জীবনবোধের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কম ছিল না। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই দেশ-বিভাগ ঘটে। ফলে গ্রামীণ জীবনে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সহজাত ও চিরায়ত সম্পর্ক বিরাজামান ছিল তা আর রক্ষিত হয়নি। রাজনীতিবিদদের কূটবুদ্ধি ও ক্রমাগত উস্কানি দুটি সম্প্রদায়ের ভিতর পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু ও মুসলমান নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। সমকালের এ গভীর সংকটের চালচিত্র মেলে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাস্তুত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মনে যেমন নিরাপত্তার প্রশ্নটি বড় হয়ে ওঠে, তেমনি আবার তাদের কারো কারো চোখে 'আলোর ধাঁধা'ও লাগে।[৩৩] তাই সম্প্রদায়ভেদে হিন্দু-মুসলমানের কাছে ভারত বা পাকিস্তান স্বপ্নের দেশ বলে বিবেচিত হতে থাকে। দেশত্যাগ সম্পর্কে রমেশ ডাক্তার এবং তার স্ত্রীর মানসিক টানাপোড়েন 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র পাঠকদের এ সংকটের গভীরে নিয়ে যায়:

> ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের চোখে লেগেছে আলোর ধাঁধা। ডাক্তারের স্ত্রীর চোখেও তাই লেগেছে। পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ডাক্তারের পাকা চোখে দূরের সে-আলো নেশা জাগাতে পারে না। পারে না মায়ার সৃষ্টি করতে। স্বামী স্ত্রীর এই বিরুদ্ধ মনোভাব সংসারের সমস্ত শান্তি নষ্ট করেছে। ...স্ত্রী নানা রকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন, বিভিন্ন জায়গার সামম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে স্বামীকে প্ররোচিত করেন।[৩৪]

সমকালের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের প্রতিনিধি হলো রমেশ ডাক্তার। সে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল সূত্রটি সহজেই ধরতে সক্ষম হয়। তাই স্ত্রীর কথার প্রতিক্রিয়ায় রমেশ ডাক্তারের সাফ জবাব:

---

[৩১] ভূঁইয়া ইকবাল, *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ৩।
[৩২] আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮।
[৩৩] *তদেব*, পৃ. ১৬৬।
[৩৪] *তদেব*।

> এখানে কে তোমাকে মারছে শুনি? কতগুলো পশুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল, তা আর হবে না, দেখে নিও। ...ভায়ের বুকের রক্তে যে করুণ অভিজ্ঞতা হল, হিন্দু-মুসলমানের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবে না। আর যদি একান্ত মুছেই যায়, তবে বুঝব তার পেছনে কাজ করছে স্বার্থান্ধ হিংস্রতা।[৩৫]

বাস্তুত্যাগ প্রসঙ্গে উপমহাদেশের সমকালীন রাজনীতির আরো কিছু জটিল সমস্যা ও ঘটনা বিবৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। সংখ্যালঘু সমস্যাটি কেবলমাত্র যে ধর্মীয় পরিচয় বা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে উদ্ভূত হতে পারে তা নয়। বরং রাজনৈতিক বিবেচনায় জনসংখ্যার দিক থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এমনকি ভোটদাতা ইত্যাদির ভিত্তিতে ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।[৩৬] এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে—'সংখ্যালঘুরা একটি শ্রেণীও হতে পারে, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা নৃতাত্ত্বিক জাতি বিচারে।'[৩৭] লক্ষণীয় বিভাগোত্তরকালে উপমহাদেশের নানা স্থানে ধর্মীয় বা বর্ণগত পরিচয় ছাড়াও, ভাষা-পরিচয় এবং আঞ্চলিকতার কারণে সংখ্যালঘু-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ সমস্যার কথা 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে রমেশ ডাক্তারের উক্তিতে বিবৃত হয়েছে:

> এ হিংস্রতা শুধু এখানেই নয়। সব জায়গায় উঠতে পারে। যেমন আসামে 'বঙ্গাল খেদা' চাড়া দিয়ে উঠেছে। 'ধূলি-বালা'দের বিরুদ্ধে গুর্খারা কুকরি শান দিচ্ছে। বিহারে কোণ-ঠাসা করে রাখা হচ্ছে বাঙালীকে। এখন এক গণ্ডগোলের ভয়ে পালিয়ে আর এক গণ্ডগোলের মুখে পড়তে হবে।[৩৮]

প্রতিশ্রুতি ও স্বপ্নভঙ্গ

মুসলিমলীগ নেতারা পাকিস্তানের স্বাধীনতার পূর্বে জনগণের উদ্দেশ্যে মোহসৃষ্টিকারী ভাষণ ও বিবৃতি দান করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে পাকিস্তান-আন্দোলনকে গতিশীল করা। তাঁদের ভাষণ ও বিবৃতির সারকথা ছিল: 'পাকিস্তান হলে ঘরে ঘরে ভাত-কাপড়ের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।'[৩৯] কেবল তাই নয়, দুঃখ-দারিদ্র্যের যেমন অবসান হবে তেমনি জমিদারের জুলুম ও শাসকদের নিপীড়ন থাকবে না; সর্বোপরি ইসলামের ইনসাফ, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের বাস্তব রূপায়ণের ভিতর দিয়ে এক সুখী ও সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে। এ রকম আশ্বাসবাণী পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে দেশের রাজনীতিবিদগণ সাধারণ মানুষকে শুনিয়েছিলেন।[৪০] এ পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা প্রচণ্ড আবেগতাড়িত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর রাজনীতিবিদদের পূর্বোক্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল তা অপূর্ণই থেকে যায়। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে শোনা যায় আশাভঙ্গ মানুষদের কথোপকথন:

---

[৩৫] *তদেব*, পৃ. ১৬৭।
[৩৬] সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৪।
[৩৭] *তদেব*।
[৩৮] আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭।
[৩৯] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮।
[৪০] *তদেব*, পৃ .১০৮-১০৯।

—কত আশা-ভরসা আছিল। স্বাদীন অইলে ভাত-কাপড় সায্য অইব। খাজনা মকুব অইব। কিন্তু কই? বেবাক ফাট্‌কি। বেবাক ফাট্‌কি। আবার লেল গাড়ীর ভাড়াও বাইড়্যা গেল।

— আরো কত দ্যাখ্‌বা মিঞা, মাত্র বিছমিল্লা।[৪১]

সুবিধাভোগী শ্রেণী

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানের সূচনালগ্ন থেকে শাসকদের অনুগত ও সুবিধাভোগী একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরা সরকারি সমস্ত সাহায্য আত্মসাৎ ও কালোবাজারি করে অচিরেই প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে ওঠে। যেমন 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে গ্রামের ফুড কমিটির সেক্রেটারি খুরশীদ মোল্লা পাকিস্তানি শাসকদের প্রতিনিধি।[৪২] গ্রামের মোড়ল খলিল বক্‌শ ও গদু প্রধান ফুড কমিটির সেক্রেটারির ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ঈদ উপলক্ষে দরিদ্রদের জন্যে বরাদ্দকৃত চিনির একটা অংশ অনায়াসে পেয়ে যায় গ্রামের মোড়ল ও গদু প্রধান। এমনকি এলাকার হিন্দু জমিদার ভবানী বাবুও চিনির ভাগ পান। কিন্তু অল্প বরাদ্দের অজুহাতে দরিদ্র মানুষদের চিনি বিতরণ বন্ধ থাকে। অন্যদিকে ফুড কমিটির সেক্রেটারির ভাই লতিফ মোল্লার দোকানে গ্রামের মানুষের জন্যে বরাদ্দকৃত চিনি চড়া দামে বিক্রি হয়। প্রতিবেশী কেরামতের কথার পরিপ্রেক্ষিতে হাসুর উক্তি:

"ও, ফুট কমিটির চিনির এই দশা! হেই ত আমরা কই, চিনিগুলা কই যায়?"[৪৩]

মূলত পাকিস্তান সৃষ্টির ফলাফল ভোগ করে 'মুসলিম লিগার, অফিসার, চোরাকারবারি'র দল।[৪৪] এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলো 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র হোসেন দালাল ও রশিদ কন্ট্রাক্টর। হাসুর প্রশ্নের উত্তরে রমজান বলে:

হোসেন দালালের নাম হোন্‌ছেন? নতুন ধনী হোসেন দালাল?
একজন বলে— হ্যা হ্যা, চিনছি। পাডের দালালি কইর‍্যা বস্তা বস্তা ট্যাকা করছে ব্যাডা।[৪৫]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে জয়গুন, হাসু, মায়মুন, শফি এবং শফির মায়ের মতো অসংখ্য দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন না হলেও হোসেন দালাল ও রশিদ কন্ট্রাক্টরদের মতো অনেকেই যে রাতারাতি বিত্তবান হয়ে ওঠে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাতচল্লিশোত্তর দুর্ভিক্ষ

স্বাধীনতা লাভের সূচনা থেকে পূর্ব পাকিস্তান যে বৈষম্যমূলক অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতির শিকার হয় তা পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এ সময়ে ভারতের বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের এদেশে আগমনও একটা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। এছাড়া ১৯৪৭-৫২ কালপর্বে পূর্ব-বাংলায় ব্যাপক পুঁজি-পাচার, ব্যবসা-সংকট, প্রতারণামূলক পাটনীতি সর্বোপরি আত্মঘাতী লবণনীতির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম-বাংলায় দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়।[৪৬] এক্ষেত্রে মহাজন, মজুদদার ও

---

[৪১] আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২২।
[৪২] *তদেব*, পৃ. ৫৪।
[৪৩] *তদেব*, পৃ. ৫৮।
[৪৪] হুমায়ুন আজাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩।
[৪৫] আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৮১।
[৪৬] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬।

কালোবাজারিদের ভূমিকাও কম ছিল না।[৪৭] পূর্ব বাংলার এ নীরব মন্বন্তরের সময়কে ধারণ করেছে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী':

> দেশে চালের দর কুড়ি টাকার নিচে নামে না বছরের কোন সময়েই। ফাল্গুন মাস থেকে সে দর আরো চড়ে যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। চল্লিশ টাকায় গিয়ে ঠেকে। ...যারা টেনেটুনে দু'বেলা খেত, তারা এক বেলার চালে দু'বেলা চালায়। ফেনটাও বাদ দেয় না, ভাতের সঙ্গে দুধভাতের মত করে খায়। যারা দু'বেলা আধ-পেটা খেয়ে থাকত, এ সময়ে তারাও শাক-পাতার সাথে অল্প চাল দিয়ে জাউ রেঁধে খায়। ক্ষুধিতের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায়।...সমস্ত দেশ দিশেহারা। দুর্ভিক্ষে কে দেয় ভিক্ষে ?[৪৮]

এভাবে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, দেশভাগ ও বাস্তুত্যাগ, সংখ্যালঘু ও শরণার্থী সংকট, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও স্বপ্নভঙ্গ, শাসকদের অনুগত শ্রেণীর সুবিধালাভ, সাতচল্লিশোত্তর দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষ চালচিত্র 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে প্রতিফলিত হয়েছে।

দেশ-কালের চিত্র যেমন রাজনৈতিক ঘটনা ও অর্থনৈতিক চালচিত্রের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়, তেমনি তা সমকালীন সামাজিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে এর প্রমাণ মেলে। এ উপন্যাসে দেশ-বিভাগের কিছু পূর্ব থেকে পরবর্তী কয়েক বছরের কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবৃত হয়নি; বরং পূর্ববঙ্গের সমকালীন গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত রূপায়ণের ভিতর দিয়ে দেশ-কাল বিধৃত হয়েছে। চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকে পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলোর সামাজিক কাঠামো যে প্রায় সামন্তবাদী ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাকিস্তানের স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তীকালের পটভূমিতে রচিত কয়েকটি উপন্যাসের উপজীব্য এ সময়ের সামন্তবাদী গ্রামীণ জীবন।[৪৯] অবশ্য এর মধ্যে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' অন্যতম। এ উপন্যাসে বর্ণিত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, পীর-ফকিরদের শোষণ, পর্দা ও অবরোধপ্রথা, নারীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি সহজেই সামন্তবাদী গ্রামীণ সমাজকে চিহ্নিত করে।

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটির নামকরণের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে। জয়গুন, হাসু, মায়মুন, শফি ও শফির মায়ের মতো নিঃস্ব-ছিন্নমূল মানুষ একান্ত নিরুপায় হয়ে এমন একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়— যে বাড়িটি পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী অর্থাৎ সূর্য-দীঘল বাড়ি। এ বাড়ির ইতিহাস জয়গুন বা শফির মায়ের অজানা নয়:

---

[৪৭] আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১৮৮।
[৪৮] *তদেব*, পৃ. ১৮৩-১৮৪।
[৪৯] ভূঁইয়া ইকবাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১-২।

> পূর্ব ও পশ্চিম— সূর্যের উদয়াস্তের দিক। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ীর নাম তাই সূর্য-দীঘল বাড়ী। সূর্য-দীঘল বাড়ী গ্রামে ক্বচিৎ দু'একটা দেখা যায়। কিন্তু তাতে কেউ বসবাস করে না। কারণ গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস সূর্য-দীঘল বাড়ীতে মানুষ টিকতে পারে না। যে বাস করে তার বংশ ধ্বংস হয়।[৫০]

সূর্য-দীঘল বাড়ি সম্পর্কিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এতটাই ভীতিজনক যে, দুর্ভিক্ষের সময়ে জয়গুন ও শফির মা বাড়িটি বিক্রি করতে চাইলেও কেউ তা কিনতে আগ্রহী হয়নি। গ্রামের লোকের বিশ্বাস এ বাড়ির তেঁতুল, শিমুল ও গাবগাছে 'ভূত পেত্নির আড্ডা'।[৫১] বাড়িটির ভূতের গল্পের অন্ত নেই। ফলে "দিন-দুপুরেও পারতপক্ষে এ বাড়ীর পাশ দিয়ে কেউ হাঁটে না।"[৫২] আবার মায়মন সূর্য-দীঘল বাড়ির মেয়ে হওয়ার কারণে তার শাশুড়ির অভিমত:

> সূর্যু-দীগলা বাড়ীর মাইয়া। পরাণ লইয়া বাইচ্যা আছে, এই কফালের ভাগ্যি।...মাইয়ার উপরি পেত্নীর দিষ্টি না আছে ত কি কইলাম।[৫৩]

ঈদের চাঁদ সম্পর্কেও 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র মানুষদের মনে সংস্কার কম নয়। শফীর মায়ের উক্তি:

> — দক্ষিণ মুহী কাইত অইয়া ওড়লে আকাল অইব-ই। বুড়াবুড়ীর কাছে হুনছি, দক্ষিণ মুহী কাইত অইয়া চান যদি সমুদ্দুরের ওপ্‌রে নজর দেয়, তয় ডাইক্যা দ্যাশ-দুইন্নাই তলাইয়া যায়।[৫৪]

আরো নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কথা প্রকাশ পেয়েছে এ উপন্যাসে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র গ্রামের লোকদের আস্থা নেই। তাদের ধারণা হলো : "এলোপ্যাথিকের ভেজাল ওষুধ পেটে গেলে রুগী যা-ও দু'ঘণ্টা বাঁচত, তা-ও শেষ হয়ে যায় দু'ঘণ্টা আগেই।"[৫৫] তাই এ গ্রামে ফকির-কবরেজদের পসার বেশি এবং আধুনিক চিকিৎসার চেয়ে মন্ত্রপূত পানির কদর অধিক। কাসু গুরুতর অসুস্থ হলে করিমবক্শ গ্রামের শ্রেষ্ঠ ফকির দিদার বক্শকে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কাসুকে ভূতে ধরেছে এ মত প্রকাশ করে ফকির বলে : "ভালয় ভালয় যদি না যায় ত ওস্তাদ শেখ ফরিদের নাম কইর‍্যা এমুন মন্তর ঝাড়মু যার তেজে সুড় সুড় কইর‍্যা আমার বোতালের মইদ্যে ঢুকব।"[৫৬] আবার করিমবক্শের তৃতীয় স্ত্রী আঞ্জুমানও মেয়ের অসুখে বেদেনির কাছ থেকে তাবিজ সংগ্রহ করে।[৫৭]

পীর-ফকিরদের শোষণ

জয়গুন ও শফির মা মন্বন্তরে নিঃস্ব। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' ছাড়া তাদের বসবাসের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। তাই তারা নিরুপায় হয়ে এ বাড়িতে বসবাস শুরু করে। কিন্তু অমঙ্গল থেকে রক্ষা পেতে

---

[৫০] আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ২।
[৫১] *তদেব*, পৃ. ৪।
[৫২] *তদেব*, পৃ. ৫।
[৫৩] *তদেব*, পৃ. ১৫১।
[৫৪] *তদেব*, পৃ. ৪৭।
[৫৫] *তদেব*, পৃ. ১৬০।
[৫৬] *তদেব*, পৃ. ১৪৪।
[৫৭] *তদেব*, পৃ. ৩৪।

তাদের জোবেদালী ফকিরের আশ্রয় নিতে হয়। আর দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের দুর্বলতার সুযোগ নেয় ফকির :

> সূর্য-দীঘল বাড়ীর চারকোণে চারটা তাবিজ পুতে এসে সে জানিয়ে দেয়— এইবার চউখ বুইজ্যা গিয়া ওড বাড়ীতে। আর কোন ডর নাই। ধুলাপড়া দিয়া ভূতপেত্নির আড্ডা ভাইঙ্গা দিছি। চার কোণায় চাইড্যা আলিশান আলিশান পাহারাদারও রাইখ্যা আইছি। সব আপদ-বিপদ ওরাই ঠেকাইব। বাড়ীর সীমানার মধ্যে ভূত-পেত্নী, জিন-পরী, ব্যারাম-আজর— কিচ্ছু আইতে পারব না।[৫৮]

এ ব্যবস্থায় খুশি হয়ে জয়গুন পাঁচ আনা পয়সা এবং শফীর মা তার ভিক্ষার ঝুলি থেকে সোয়া সের চাল ফকিরকে দেয়। কিন্তু তাতে ফকিরের মন ওঠে না। তার লোভ একটি পিতলের কলস আর তাদের বাঁশঝাড়ের দিকে। অবশ্য জয়গুনের শরীরের দিকেও তার লোলুপতা কম নয়। অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারজনিত ভীতিকে অবলম্বন করে জোবেদালী ফকির শোষণের স্থায়ী উপায় বের করে : "বচ্ছর বচ্ছর কিন্তু পাহারা বদলাইতে অইব।"[৫৯]

পর্দা ও অবরোধপ্রথা

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে পর্দা ও অবরোধপ্রথা নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। জয়গুন তার হাঁসের প্রথম ডিমগুলো মসজিদে পাঠালে বেপর্দার অজুহাতে ইমাম তা ফেরত দিয়ে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করে।[৬০] পর্দা রক্ষা না করে চলাফেরা সম্পর্কে মানুষের নানা কটূক্তি শুনে হাসুও মাকে বাইরের কাজে যেতে নিষেধ করে। প্রথম স্বামীর পুঁথিপাঠ-সূত্রে বেপর্দা নারীর দোজখের শাস্তি সম্পর্কে জয়গুন অবহিত।[৬১] কিন্তু বিধি-নিষেধ মানতে গেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে তাকে না খেয়ে মরতে হয়। মায়মনের বিয়ে উপলক্ষে গ্রামের মৌলবি ও নারীলোভী গদু প্রধানের ষড়যন্ত্রের শিকার হয় জয়গুন। পুরুষশাসিত সমাজের নির্মমতা গদুপ্রধানের আস্ফালনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে :

> ...বিয়ার আগে বৌর মারে তোবা করাইতে অইব। পর্দার বরখেলাপ করে বুইল্যা এখনি তারে তোবা করাইতে অইব। তোবা না করাইলে মৌলবী সাব কলমা পড়াইব না। আর সে ছাড়া কে কলমা পড়ায় আমি দেইক্যা লইমু।[৬২]

নারী-নিপীড়ন

সামন্তবাদী সমাজের অন্যতম বিশেষত্ব হলো পুরুষের কর্তৃত্ব। চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ সমাজে নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল অবিসংবাদিত। সঙ্গত কারণেই 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে নারীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের নানা ঘটনা বিধৃত হয়েছে। করিমবক্শ তার প্রথম স্ত্রী মেহেরনকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। দ্বিতীয় স্ত্রী জয়গুনের শরীরের কোনো স্থান তার প্রহার থেকে রক্ষা পায়নি এবং তৃতীয় স্ত্রীর ওপরও নির্যাতন অব্যাহত থাকে। এ সামন্তবাদী সমাজে

---

[৫৮] *তদেব*, পৃ. ৬।
[৫৯] *তদেব*।
[৬০] *তদেব*, পৃ. ১৭।
[৬১] *তদেব*, পৃ. ২২।
[৬২] *তদেব*, পৃ. ১২৩।

নারী বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে : "মরদ্‌গুণে যেই পিড়ে মারব হেই পিড় বিস্তে যাইব।"[৬৩] দুর্ভিক্ষের সময়ে কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়াই জয়গুনকে তালাক দেয় করিমবক্‌শ। এমনকি "পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।/ কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।।"[৬৪]— সামন্তবাদী সমাজের এই নীতি-নির্দেশে তিন বছরের ছেলে কাসু রয়ে যায় করিম বক্‌শের কাছে; আর মেয়ে দু'টিকে চলে যেতে হয় পরিত্যক্তা জয়গুনের সঙ্গে।

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং অসমবয়সী-বিবাহের দৃষ্টান্ত সামন্তবাদী সমাজের সাধারণ ঘটনা। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে বাল্যবিবাহের বেশ কয়েকটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। গেদির মায়ের পাঁচ বছর বয়সী মেয়ের সঙ্গে লালুর মা তার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করে। আবার ময়মনেরও দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়। শফীর মায়ের উক্তিতে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে:

> দুধের মাইয়া ! কি যে কস্ তোরা ছাই-মুণ্ডু। মাইয়ারা এই বয়সে বাচ্চা বিয়ায়।
> আমার মা-র এগার বচ্ছরের কালে আমার জর্ম অয়।[৬৫]

আবার মায়মন ও ওস্‌মানের বিয়ে ছিল অসম বয়সের। মূলত মায়মনকে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করতে হয় অসম বয়সের বিয়ের কারণে।[৬৬] পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ ছিল সাধারণ ব্যাপার। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে জয়গুনের দ্বিতীয় স্বামী করিমবক্‌শ একাধিক বিয়ে করে। অন্যদিকে তিন স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও গ্রামের প্রতিপত্তিশালী গদু-প্রধান চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে জয়গুনকে ঘরে আনতে চায়। তাই শফীর মা জয়গুনের নিরাপত্তার কথা ভেবে গদুপ্রধানের প্রস্তাব লোভনীয় করে তার কাছে উত্থাপন করে।[৬৭] মূলত 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে জয়গুনের সংগ্রাম যেমন ক্ষুধা-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, তেমনি পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুর বিধি-বিধানের বিরুদ্ধেও। এ সংগ্রাম করতে গিয়েই জয়গুন ও শফীর মা 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' থেকে বিতাড়িত হয়। তাদের এ পরাজয় যেমন সামন্তবাদী সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কাছে, তেমনি পুরুষের লালসা, নিষ্ঠুরতা ও আধিপত্যের কাছেও ঘটে।

উপসংহার

আবু ইসহাকের উপন্যাসের অন্যতম বিশেষত্ব হলো গ্রামকেন্দ্রিকতা। এর কারণ হিসেবে দৈশিক ও কালিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ষাটের দশক পর্যন্ত প্রধানত গ্রামীণ জীবনের রূপায়ণ লক্ষণীয়।[৬৮] এর সঙ্গত কারণও ছিল। দেশবিভাগের পূর্বে এমনকি বিভাগোত্তর কালেও পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নগরায়ণ ও নাগরিক-মধ্যবিত্তশ্রেণীর

---

[৬৩] *তদেব*, পৃ. ৩৩।
[৬৪] *তদেব*, পৃ. ২৩।
[৬৫] *তদেব*, পৃ. ৭৩।
[৬৬] *তদেব*, পৃ. ১৫০-১৫১
[৬৭] *তদেব*, পৃ. ৭২।
[৬৮] সারোয়ার জাহান, "স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ উপন্যাস", *একুশের প্রবন্ধ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ২৬।

বিকাশ বিলম্বিত হয়েছে। ফলে সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের যে মানসভূমি ও অভিজ্ঞতার জগৎ তা নগরকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে ওঠেনি। বরং এ সময়ের লেখকদের 'জীবন-যাপনের ধাঁচ, সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁদের অবস্থান, তাঁদের মানসিক উত্তরাধিকার এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্য' সবই গ্রামীণজীবনের সঙ্গে অন্বিত ছিল।[৬৯] সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের সাহিত্যেও উপজীব্য হিসেবে গ্রামীণজীবন ও সমাজ প্রাধান্য পেয়েছে।[৭০] আবু ইসহাকও তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রামীণজীবনকে অবলম্বন করেছেন। এমনকি তাঁর অনুজ কথাসাহিত্যিকদের রচনায়ও এ প্রবণতা লক্ষ করা যায়।[৭১] আরো উল্লেখ্য, দেশ-বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার যে ধারা গড়ে ওঠে তাতে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যিক শিল্পরীতির অনুবর্তী হয়েও পটভূমি হিসেবে রূপায়িত করেছেন প্রধানত পূর্ববঙ্গের সমাজ এবং ভৌগোলিক পরিবেশ। এক্ষেত্রে আবু ইসহাকের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো দেশ-কাল এবং সমাজবাস্তবতার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে তাঁর উপন্যাসে 'গ্রাম সমাজের গলিত, ধসে-পড়া, বিবর্ণ, দুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত, কুসংস্কার-শাসিত' জীবনচিত্রের রূপায়ণে।[৭২] এ পরিপ্রেক্ষিতে আবু ইসহাককে যেমন দৈশিক ও কালিক চেতনার শিল্পী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, তেমনি 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'ও দেশ-কালের প্রামাণ্য দলিল বলে বিবেচিত হতে পারে।

---

[৬৯] হাসান আজিজুল হক, 'অপ্রকাশের ভার', (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৮), পৃ. ৬২।

[৭০] ভূঁইয়া ইকবাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১-২৬।

[৭১] শাহীদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৭৭।

[৭২] হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা*, একুশে (কলকাতা), একুশে' সংস্করণ ১৩৯৫, পৃ. ১৮।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

সুজিত সরকার*

Abstract: Manik Bandyopadhyay is usually considered as a distinguished noveiist in Bengali literature. But many people do not know that he used to write pomes in his youth, which were found in 1970 after 14 years of his death in 1956. His poetry is rich in rhyme, diction and approach. These pomes have certain distinguishing characteristics which deserve close analysis and critical evaluation. In this article the researcher attempts to analyse and evaluate his poems to show the intrinsic values of his poetry.

১. ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু গল্প-উপন্যাস রচনার আগে তিনি কৈশোরে এবং পরিণত বয়সে কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। কথাসাহিত্যে মনোনিবেশ করার ফলে তাঁর কবিতা লেখায় খানিকটা ছেদ পড়ে। তারপর পরিণত বয়েসেও তাঁর কবিতা লেখার আন্তরিক অনুভূতি জাগ্রত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই কবিতাগুলো দুটি খাতায় দীর্ঘদিন বন্দী ছিলো, যা তাঁর মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পর (১৯৭০) তাঁর জামাতা যুগান্তর চক্রবর্তী উদ্ধার করেন। তাঁর কবিতা এবং কথাসাহিত্যের ভাষা অভিন্ন চেতনার প্রকাশধ্বনিরই সমন্বয়। এ ছাড়া, চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক কর্মী ও কবিদের ভাষা ও বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তাঁর কবিতায় অনুরণিত হলেও তাঁর রচনা-শৈলী এবং বক্তব্যে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে এ পর্যন্ত বেশ কিছু মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনার পরিমাণ সে তুলনায় কম। অবশ্য এটা অনস্বীকার্য, তাঁর কবিতার সংখ্যাও অনুরূপ কম। এ ছাড়া সব চেয়ে বড়ো কথা, তিনি কবি হতে চাননি, চেয়েছেন ঔপন্যাসিক হতে। তা তিনি হয়েওছিলেন। তবে গল্প-উপন্যাস রচনার সমান্তরালে তিনি যে কবিতা রচনা করেছিলেন এবং তাঁর যে কবিপ্রতিভা ছিলো তা ওই কবিতাগুলোই বলে দেয়। কবিতা লেখা একজন ঔপন্যাসিকের স্বতন্ত্র প্রতিভারই পরিচয়। সেই পরিচয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কতোটা পথ পরিক্রম করেছিলেন এবং কবি হিসেবে তিনি কতোটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছিলেন, সে বিষয়ই এই আলোচনার মূল লক্ষ্য। সেই সঙ্গে তাঁর মানস বিচার, সময়চেতনা আর কবিতার শিল্প বিচারও এই আলোচনার আরেকটি উদ্দেশ্য। অবশ্য কবি না হয়ে ঔপন্যাসিক হওয়া যে তাঁর যথার্থ একটি সিদ্ধান্ত হয়েছিলো, তা তাঁর আত্মস্বীকৃতিমূলক লেখা থেকেই সে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি নিজেকে 'কলম পেষা মজুর'[১] মনে করতেন। তাঁর কবিতায় সে স্বাক্ষর খুব স্পষ্টভাবে রয়েছে। এই আলোচনায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত একজন কথাশিল্পী মনে রেখেই আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

---

* ড. সুজিত সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] *মানিক গ্রন্থাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা: গ্রন্থালয় ,১৯৮৮), পৃ. ৩৮৩।

২. কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আত্মস্বীকৃতি ও পর্যবেক্ষণ

আমি কবি, শুঁড়ি নই।
শব্দ-মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ লেখা প'ড়ো না।
জীবনের সব তৃষ্ণা
সব ঋণ শুধে
সৃষ্টির পেয়েছি অধিকার
দখল করেছি ভবিষ্যৎ।
এ প্রেমের গান,
মনে হবে তোমারই মৃত্যু পরোয়ানা।
দু'টো দিন বাকি আছে,
থাক,
প'ড়ো না ঘোষণা।[১]

উপরিল্লিখিত কবিতাটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আত্মস্বীকৃতিমূলক উক্তি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি কবিতা নিয়ে বিলাসিতা বা ভাবালুতা করতে চাননি। কবিতা হবে সংগ্রামের হাতিয়ার, বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের শানিত অস্ত্র আর ইস্তেহার, তিনি সে কথা ব্যক্ত করেছেন। তাই মানিকের কাছে কবিতা কেবল সুন্দর শব্দের বিন্যাসই নয়, সংগ্রামেরও দুর্ভেদ্য অস্ত্র।

বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিত কথাসাহিত্যিক হিসেবে। কিন্তু গল্প-উপন্যাস রচনার আগে তিনি বহু সংখ্যক কবিতা রচনা করেছিলেন। ১৯৭০-এ এই অজানা তথ্য সাহিত্যপ্রেমীদের সম্মুখে উপস্থিত হলে তাঁরা বিস্মিত হন এই ভেবে যে, যে ব্যক্তির নির্ভেজাল বিচরণ ছিলো কথা সাহিত্যের উর্বর জমিনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, সেই ব্যক্তি কবে কখন কবির পদটি অধিকার করলেন। তাঁর কবিতা যে তাঁরই কথাসাহিত্যের মতো বিষয়-নির্বাচনে, ভাব-বিন্যাসে এবং শব্দ-চয়নে স্বতন্ত্রধর্মী একজন লেখকের ইঙ্গিত বহন করে, সেটা কবিতাগুলো পড়লেই অনুধাবন করা যায়। তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ কবিতাই তাঁর মৃত্যুর পর উদ্ধার করা হয়। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০১-১৯৭১) বা সমসাময়িক কবিদের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতার জগতে ঠিক স্থির চিত্তে অবস্থান করতে পারেননি। তিনি বোধহয় কথাসাহিত্যের মাধ্যমেই আপন মনের দুয়ার উন্মুক্ত করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। আর সে কারণে কবিতা রচনা করলেও তিনি সেগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেননি। তিনি সেগুলোকে ভালো কবিতা হিসেবেও স্বীকৃতি দিতে সংশয়বোধ করেছেন—এ কথা অনেকেই[২] উল্লেখ করেছেন। আর তাই তাঁর কবিতা প্রায় সবগুলোই তাঁরই কথাসাহিত্যের বিপুল ভারে আড়ালে রয়ে গেছে। তবে কবিতাতেও তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি আর শ্রেণী চেতনার তির্যক বক্তব্য উচ্চারণ করেছেন। সমাজের উৎপীড়িতদের পক্ষে কলম ধরেছেন, তাঁর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত কবিতাগুলো থেকে সে ইঙ্গিতটি স্পষ্ট।

যুগান্তর চক্রবর্তী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু পর সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ মিলিয়ে 'প্রায় একশো চৌত্রিশটি কবিতা'সহ[৩] দু'টি কবিতার খাতা উদ্ধার করেছেন। প্রথম খাতাটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

---

[১] *মানিক গ্রন্থাবলী*, সপ্তম খণ্ড,উপন্যাস : *স্বাধীনতার স্বাদ*, (কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২) পৃ. ৩২৭।

[২] শুদ্ধসত্ত্ব বসু, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা', *মানিক বিচিত্রা*, সম্পাদক : বিশ্বনাথ দে (কলকাতা: সাহিত্যম), পৃ. ১১৪। এ ছাড়া, ড. লিলি দত্ত তাঁর জীবন শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, একশোটি কবিতার মধ্যে একটিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি। কোনোটিই যে প্রকাশযোগ্য ছিল না, তা অবশ্য নয়। এক গভীর অতৃপ্তি এবং কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দ্বিধাই এর কারণ। পৃ. ৪৩।

[৩] লিলি দত্ত, *জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (কলকাতা, দে বুক স্টোর, ১৩৯৬), পৃ. ৪৩।

প্রথম জীবনে (১৯২৪-১৯২৯) লেখা কবিতায় ভরা। অনেক কথাশিল্পীর[৫] মতো তাঁরও সাহিত্য চর্চার সূচনা কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে। তাঁর লেখা শতাধিক কবিতার মধ্যে জীবিতকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাত্র সাতটি প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মৃত্যুর চোদ্দ বছর পর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ওই উদ্ধারকৃত একটি খাতা থেকে বাছাই করে ত্রিশটি কবিতা *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা* শিরোনামে যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদনা করে একটি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই কবিতা গ্রন্থে অপর খাতা থেকে *শিরোনামহীন কবিতা* হিসেবে আরো সতেরোটি কবিতা এবং গ্রন্থের শেষাংশে *প্রাথমিক কবিতা* হিসেবে চোদ্দটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। গ্রন্থে মোট একষট্টিটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল আবেগের বশে কবিতা লিখেছিলেন—এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ তিনি আপাদমস্তক একজন বিজ্ঞান-চেতনাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। যুক্তি আর প্রখর বাস্তবতাবোধ ছিলো যাঁর মানস ভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সে কারণেই বলা যায়, অন্তরের টানে নিজের অনুভূতিকে তিনি কবিতার ভাষা-শৈলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। গল্প বা উপন্যাসের বৃহৎ পরিধি সব সময়ে আত্ম-প্রকাশের প্রধান আশ্রয় হতে পারে না বলেই বিন্দু বিন্দু অনুভূতির প্রকাশ কেবল কবিতা-শৈলীর মাধ্যমেই প্রকাশ করা সম্ভব। সমাজের নানা অসঙ্গতি, অযুত বৈসাদৃশ্য, অন্যায়-উৎপীড়ন আর ন্যায়-নীতিবোধে সচেতন বলে কিছু মানুষের ভেতরে ভেতরে চরম মূল্যবোধহীনতা পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া তাঁর মন ও মেধায় করাঘাত করতো, তারই নির্ভেজাল প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। সে কারণে তিনি *পদ্মানদীর মাঝি* (মে, ১৯৩৬) উপন্যাসের মতো বলতে পেরেছিলেন:

> অবজ্ঞার খোয়া-তোলা যত্নে-গড়া সাধারণ পথ।
> এক প্রান্তে রিজার্ভ-জমিতে
> ভবিষ্যতের শব-সমারোহ, সমাধি-ফলক, পুষ্পিত শ্রদ্ধার্ঘ্য,
> অন্যপ্রান্তে ছোট-ছোট নিষ্করে-জমিতে
> ভদ্র গৃহস্থের
> একতলা দোতলা বন্দীশালা।[৬]

মানিকের এই ভাষা যেন 'ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না'[৭]–সঙ্গে অভিন্ন। কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাব ও ভাষা তাই তাঁর কথাসাহিত্যের ভাষার মতো অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রকাশিত। আর তাঁর কবিতা লেখা নিছক আবেগ নয়, পরিকল্পিত। তিনি নষ্ট সমাজ, নষ্ট মানুষকে এবং ব্রাত্য জনজীবনকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন; সেই অনুভূতিকে একটি শৈল্পিক পরিণতি দানের জন্যই কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। খেয়ালের কিংবা ভাবাবেগের বশে তাঁর কবিতা লেখা নয়। জীবনের নানা অনুষঙ্গকে নিজের মতো করে খণ্ড খণ্ডভাবে উপস্থাপন করাটাই ছিলো তাঁর কবিতা রচনা উদ্দেশ্য। একজন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন কবির মতো তাঁর জগৎ আর জীবনকে দেখার অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রকাশ ঘটেছে। সে কারণেই তিনি আপাদমস্তক একজন কবি। এ ছাড়া তাঁর উপন্যাসে–বিশেষ করে *দিবারাত্রির কাব্য* (ডিসেম্বর,১৯৩৫)সহ অন্যান্য বেশ কয়টি উপন্যাসে কবিতা প্রসঙ্গে যে উক্তি করেছেন এবং উপন্যাস সূচনায় কবিতাকেই ভূমিকা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, তাতে তাঁর কবি-মানসেরই পরিচয় পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। যেমন–*দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে আনন্দর মা মালতী হেরম্বের সঙ্গে একদিন নিজের সুখস্মৃতির কথা বলতে গিয়ে সন্তান জন্মদানের অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা বললে, হেরম্বও কবিতা

---

[৫] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩৮) ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৭১) প্রমুখ কথাশিল্পীর কথা প্রসঙ্গত বলা হয়েছে। তাঁরাও কথাসাহিত্য রচনার আগে কবিতা রচনা করেছেন।

[৬] *মানিক গ্রন্থাবলী* , ত্রয়োদশ খণ্ড (কলকাতা, ১৯৭৬), পৃ. ১।

[৭] *মানিক গ্রন্থাবলী* , প্রথম খণ্ড, উপন্যাস : *পদ্মানদীর মাঝি* (কলকাতা, ১৯৮৬), পৃ. ৮।

লেখার সঙ্গে সেই যন্ত্রণার তুলনা করে। উপন্যাসে উল্লিখিত তাদের সেই কথোপকথনের অংশবিশেষ এখানে উপস্থাপিত হলো:

> জীবনে আমার দুটি সুদিন এসেছে। প্রথম, তোমার মাস্টার মশায় যেদিন দাদাকে পড়াতে এলেন, অন্দরের জানালায় অন্ধকারে ঠায়
> দাঁড়িয়ে আমি লোকটাকে দেখলাম, সেদিন। আর যেদিন আনন্দ কোলে এল। প্রসব বেদনা কেমন জান ?
> হেরম্ব জোর দিয়ে বলল, 'জানি।'
> 'জানো ! পাগল নাকি, তুমি কি করে জানবে !'
> 'আমি এককালে কবিতা লিখতাম যে মালতী-বৌদি !'
> 'কবিতা লেখা আর প্রসববেদনা কি এক ? মাথা খারাপ না হলে কেউ এমন কথা বলে ! তোমাতে আর ভগবান লক্ষ্মীছাড়াতে তাহলে
> আর কোন প্রভেদ থাকত না বাপু। আমরা প্রসব করি ভগবানের কবিতাকে, তার তুলনায় তোমাদের কবিতা ইয়ার্কি ছাড়া আর কি !
> যাই হোক, আনন্দকে দেখে সেদিন আমি প্রসববেদনা ভুলে গেলাম হেরম্ব।'
> 'সব মা-ই তাই যায়, মালতী-বৌদি।'[৮]

কবির কবিতা সৃষ্টি এবং মায়ের সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা এই দুই কবি আর জননী ব্যতীত কারো পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। মানিক প্রকৃত একজন কবি ছিলেন বলে তাঁর কবিতায় কেবল নয়, কথাসাহিত্যেও সে অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বিচারেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর তিনি নিজেই *স্বাধীনতার স্বাদ* (জুন, ১৯৫১) উপন্যাসে দাবি করেছেন, 'আমি কবি, শুঁড়ি নই....সৃষ্টির পেয়েছি অধিকার > দখল করেছি ভবিষ্যৎ'[৯]। বিধায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন কথাশিল্পী, তেমনি কবিও এবং আধুনিক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যও বোধ হয়—অন্তত তাঁর উপরিল্লিখিত স্বীকারোক্তির কারণেই তাঁকে কবি হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে। উল্লেখযোগ্য এ জন্য যে, তাঁর কবিতার এ বক্তব্য সরল এবং তির্যক। তিনি যা অনুভব করেছেন তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়, এক রকম চোখে আঙুল দিয়ে যুক্তি সহকারে বক্তব্য উপস্থাপন। তিনি কবি, তাই যা সত্য বলে জেনেছেন ও বুঝেছেন তা-ই সাহসের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। *ছন্দপতন*[১০] (অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ /১৯৫১) উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কবি মানস সম্পর্কে নিজেই একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন:

> আমি বস্তুবাদী কবি। শুধু কবিতায় নয় সবকিছুতেই বস্তুবাদী। বস্তুবাদী কবি কি ? যে সত্যবাদী কবি। দুটো একই কথা। বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।
> আমি কবিতা লিখি, শব্দ মদ চোলাই করি না। আকাশ চষে আমি কাব্য-ফুলের চাষ করি না, মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব চিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবন রসে পূর্ণ।

---

[৮] *মানিক গ্রন্থাবলী*, প্রথম খণ্ড, উপন্যাস : *দিবারাত্রির কাব্য*, পৃ. ১১৯-১২০।

[৯] *মানিক গ্রন্থাবলী*, সপ্তম খণ্ড, উপন্যাস : *স্বাধীনতার স্বাদ*, পৃ. ৩২৯।

[১০] *ছন্দপতন* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাইশতম উপন্যাস। রচনাকালে ঔপন্যাসিকের পরিকল্পনায় এই উপন্যাসের নাম ছিলো *কবির জবানবন্দী*। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির পূর্বপরিকল্পিত নাম পরিবর্তন করে *ছন্দপতন* নাম দেন। উল্লিখিত তথ্যটি *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা* গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তীও দিয়েছেন।মানিক গ্রন্থাবলীর এয়োদশ খণ্ডে পরিশিষ্ট ক-এ সেই ভূমিকাটি মুদ্রিত হয়েছে। পৃ. ৪০২-৪০৪।

....

> শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বস্তুবাদী। কবি তার কবিতায় একরকম, জীবনে অন্যরকম–এটা আমার উদ্ভট ব্যাপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারীর অঙ্গ স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে পুত্রোৎপাদন।[১১]

কবি আর কবিতা সম্পর্কে এই হচ্ছে মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোরালো বক্তব্য। ব্যক্তিগত জীবন আর সাহিত্যের জগতের মধ্যে তিনি পার্থক্য করে নিজেকে প্রকাশ করতে চান না। ও রকম যারা করেন, তারা প্রতারণা করেন বলেই তিনি মনে করতেন। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেন তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে এই জগতের মানুষ আর প্রকৃতি। 'আকাশ চষে কাব্য ফুলের চাষ'[১২] করাটা অযৌক্তিক আর মানুষ ও প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন অবাস্তব আবেগেরই প্রকাশ বলে তিনি মনে করতেন। সত্য আর সুন্দরের সপক্ষে অবস্থান কবি চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি চরিত্রে এবং কবিতার ভাষায় সেই বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এ কথাগুলো সমভাবে প্রযোজ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক লেখায় নিজের সম্পর্কে স্বীকারোক্তিমূলক জবাববন্দি দিয়ে লিখেছিলেন:

> পরে নিজের অভিজ্ঞতাকে ভালো করে তলিয়ে বুঝে 'কেন লিখি?' তত্ত্বগত দিকটার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠলো সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে নানা এলোমেলো থিয়োরি ও তার ব্যাখ্যার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। তখন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একটা আশ্চর্য কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, লিখতে আরম্ভ করার আগেও বলে দেওয়া সম্ভব ছিল—যদি কোনদিন আমি লিখি ঝোঁকটা আমার পড়বে উপন্যাস লেখার দিকে। আমার বিজ্ঞান প্রীতিজাত বৈজ্ঞানিকের কেনধর্মী জীবন জিজ্ঞাসা, ছাত্র বয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক।'[১৩]

৩. জীবদ্দশায় প্রকাশিতসহ অন্যান্য কবিতার শিরোনাম

ড. সরোজমোহন মিত্র জানিয়েছেন,[১৪] 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে মোট সাতটি কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'উত্তর দক্ষিণ' অধুনালুপ্ত *অগ্রগতি* পত্রিকার পাতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত কবিতা। তারপর 'শ্রমবঞ্চিতা শিকারিণী' কবিতাটি *পূর্বাশা*, বৈশাখ,১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত। এই কবিতাটি এখনো সংগৃহীত হয়নি। 'ছড়া' কবিতাটি ১৯৫৩-র ঐতিহাসিক ট্রাম আন্দোলন উপলক্ষে রচিত হয় এবং ১৭ই জুলাই ১৯৫৩ তারিখের দৈনিক *স্বাধীনতা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যক্ষা রোগাক্রান্ত কবি 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' অবলম্বনে রচিত কবিতাটি সুকান্তের মৃত্যুর পূর্বে ৪.৫.১৯৪৭ তারিখের রবিবারের *স্বাধীনতা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সুকান্তের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় মানিকের আত্মকথন মূলক সুদীর্ঘ কবিতা 'প্রথম কবিতার কাহিনী' শারদীয়া *বসুমতী* ১৩৫৪ পত্রিকায়। 'চা' কবিতাটি ১৯৪৭ সালের অধুনালুপ্ত *অভিবাদন* পত্রিকায় এবং 'পরিচয়' কবিতাটি ১৯৪৮ সালের অধুনালুপ্ত *অভিধারা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।'[১৫]

জীবদ্দশায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়—এ তথ্য যুগান্তর চক্রবর্তীও তাঁর *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুর পরে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের *সবুজের অভিযান* পত্রিকায় 'রাজা ও প্রজা' , 'গ্রীষ্ম' ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শারদীয় *স্বাধীনতা* এবং ১৯৬৭-র *কালপুরুষ*-এ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া, 'দুর্ভিক্ষ ' ও 'আমি ধাত্রী' *পরিচয়*-এর ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের পৌষ

---

[১১] *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৮ম খণ্ড, উপন্যাস :*ছন্দপতন* (কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩),পৃ. ১৬১।

[১২] *তদেব*, পৃ. ৩৭।

[১৩] *মানিক গ্রন্থাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৯৯।

[১৪] সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় পরিমার্জিত সংস্করণ), প. ১৯২।

[১৫] সরোজমোহন মিত্র, পৃ. ১৯২।

সংখ্যায়। *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি কবিতা, *পদ্মানদীর মাঝিতে* হোসেন মিয়ার একটি গান এবং *স্বাধীনতার স্বাদ* আর *ছন্দপতন* উপন্যাসেও তাঁর কয়েকটি কবিতা সংযোজিত হয়েছে। সে হিসেবে শেষোক্ত কবিতা ও গান তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত বলে আমরা বলতে পারি। 'দিনের কবিতা,' 'রাতের কবিতা', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'আমি কবি শুঁড়ি নই', 'শব্দ বেচা শুঁড়িগুলো' এবং 'চাতকের প্রাণ গেছে' কবিতা ছয়টি অবশ্য *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা* গ্রন্থে আশ্রয় পেয়েছে। কবিতা গ্রন্থ অবশিষ্ট কবিতাগুলো তাঁর খাতা থেকে বেছে সম্পাদিত হয়েছে। কবিতাগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানস স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে। কেবল তা-ই নয়, তাঁর কবিতার গতানুগতিক ফর্ম বিরোধিতার প্রবণতাও লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে ল্যাটিন আমেরিকার কবিদের কবিতার ভাষা, বিষয় এবং প্রবণতা-প্রকরণের কথাও উল্লেখ করা যায়। অবিকল তাঁর কবিতায় জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে চাঁদ আর মেঘের খেলার বাইরে এনে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার করে রূঢ় সত্যকে তির্যক ভাষায় প্রকাশ করার শৈল্পিক অঙ্গীকারও ব্যক্ত করতে দেখা যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা যে সব কবিতা মুদ্রিত হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে উপস্থাপিত হলো। এই তালিকাটি গ্রন্থালয় কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থাবলীর ত্রয়োদশ খণ্ড থেকে প্রণীত হলো।

'উত্তর দক্ষিণ','বুড়ো সন্ন্যাসী', 'সুকান্ত ভট্টাচার্য',' চা', 'প্রথম কবিতার কাহিনী', 'পরিচয়', 'কবিতা', 'রাজা ও প্রজা', 'চীন', 'ছড়া', 'নূতন ঘৃণার প্রথম কবিতা', 'সুন্দর',' আমি', 'গদ্য-কবিতা', 'বাংলা ভাঙার কবিতা', 'গুড়ের ভাঁড়', 'শ্রাবণ মাস', 'তুষের আগুন', 'মোড়', 'কিশোরী', 'দুর্ভিক্ষ', 'ডিসেম্বর', 'আদিম কবিতা', এবং সতেরটি শিরোনামহীন কবিতাসহ প্রাথমিক কবিতাংশে 'দিগ্বিজয়ী', 'নাস্তিকের কথা', 'পত্র', 'সবুজে পাখি ও হলুদে পাখি', 'শেফালি', 'সূর্যমূখী', 'জবা', 'রূপকথা', 'পাঁকের ফুল', 'হায় গো হায়', 'শাওন রাতে', 'যৌবন', 'এই পৃথিবীর দেড়শ' কোটি লোক'–এই তেরোটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাঁর কবিতাগুলো তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে প্রকাশ করলেও সরোজমোহন মিত্র মনে করেন, 'দুই ভাগে কবিতাগুলো ভাগ করা যায়।'[১৬] এই বিভক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এক, প্রচলিত কাব্যাদর্শের অনুসারী এবং দুই, মানিকের স্বকীয় চিন্তাধারায় বিশিষ্ট।'[১৭] নিতাই বসুও আবার কবিতাগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করার মত দিয়ে বলেছেন, 'আত্ম বিকাশের ইতিহাস, সমাজ ও ইতিহাসসচেতন বিপ্লবী মনের প্রকাশ এবং বিবিধ।'[১৮]

আবদুল মান্নান সৈয়দ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি মানস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর 'শব্দ-মদের বিরুদ্ধে' নিবন্ধে বলেছেন, 'প্রথম জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য লেখায় (দিবারাত্রের কাব্য) কবিতা কেবল শিরোদেশেই ছিলো না, ছিলো উপন্যাসটির সমস্ত শরীরাত্মা ...বস্তুত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁরই গদ্য রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত, সংলগ্ন একটি নূতন প্রদেশে বড়োজোর...।'[১৯]

তাঁর প্রথম ভাগের কবিতা ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত কৈশোরক এবং দ্বিতীয় ভাগের কবিতা ১৯৪৬ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিরাবেগ জীবন চেতনায় সমৃদ্ধ। শেষ ভাগকে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, মৃত্যুপূর্ব প্রৌঢ়তার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। মাঝখানের সময়টুকুতে তিনি কবিতাসক্ত ছিলেন না। একবাক্যে তাঁর প্রায় সব কবিতাকে মৌলিক অভিজ্ঞতা, জীবন ভাবনা সমৃদ্ধ এবং তাঁর দ্বিধাহীন শানিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকিত প্রকাশ বলে উল্লেখ করা যায়।

একটু লক্ষ করলে দেখা যায়,তাঁর চেতনা খণ্ডিত ছিলো না কখনই। প্রকাশভঙ্গি, সময় ও অভিজ্ঞতার হেরফেরের কারণে তাঁর কাব্যভাষা প্রকাশভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত এবং অনুকরণীয় কবিদের থেকে

---

[১৬] সরোজমোহন মিত্র, পৃ. ১৯২।

[১৭] সরোজমোহন মিত্র, পৃ. ১৯২।

[১৮] বসু, নতাই , *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬), পৃ. ২৮০।

[১৯] আবদুল মান্নান সৈয়দ,"শব্দ-মদের বিরুদ্ধে" *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভুঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯১), পৃ. ১৭১।

স্বতন্ত্র। সে নিয়ে নানা বিতর্ক উত্থাপন করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বিষয় মানিক-মানসের ক্ষেত্রে কতোটুকু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছিলো যে তা এভাবে বিভাজন করে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীতা দেখা দিতে পারে। মানিক আমৃত্যু একই চেতনার আলোকে সমৃদ্ধ ছিলেন এবং একই পথের যাত্রী ছিলেন। তাঁর কবিতাগুলোর প্রতি একটু সযত্ন দৃষ্টি দিলেই বুঝতে একটুও ভুল হয় না যে, কবিতাগুলোর বিষয় বৈচিত্র্য খুব কম। বক্তব্য প্রায় অভিন্ন। কেবল ভিন্ন যা, তা হচ্ছে বক্তব্য প্রকাশের কৌশল। কবিতার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি আর সমাজের শ্রমজীবী অধিকার বঞ্চিত অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের প্রতি মমত্ববোধ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর অন্ত্যজশ্রেণীর প্রতি মমত্ব প্রকাশের ভঙ্গিটা ছিলো শোষক আর নির্যাতকের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহের অঙ্গীকার। আর এই অঙ্গীকারের মধ্যে দিয়ে একটি শোষণহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আয়োজনে জনমত সৃষ্টি করে তাদের সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যয় সুস্পষ্ট।

বেদ বাইবেল কোরাণ কিনেছে
শিশি বোতলের বিক্রিওলা,
পুঁথির পাতা পুড়িয়ে আরাম করবে শীতের রাতে ফুটপাতে ![২০]

ডিসেম্বরের হাড় কাঁপানো শীতে শীত প্রতিরোধ করার বস্ত্র যাদের নেই তারা শীত নিবারণের জন্য কতো মূল্যবান আর পবিত্র গ্রন্থ পোড়াচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখে না। তারা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনটাই কেবল মোকাবেলা করে। এটাই জীবনের বাস্তবতা। সত্যোপলব্ধি করার মতো যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ যে কবির নেই তিনি যথার্থ কবি নন। *প্রাথমিক কবিতার কাহিনী, নূতন ঘৃণার প্রথম কবিতা* ও *পত্র*-এ তিনটি দীর্ঘ কবিতা।

৪. কবিতা কেবল ভাবাবেগ নয়, লড়াইয়েরও শানিত হাতিয়ার

সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায়ও সমাজের অসঙ্গতি, আর্থনীতিক শোষণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়ন নানা আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। কবি-শিল্পী একটি সমাজ-সভ্যতার বিবেক হিসেবে পরিচিত। কবিতা কেবল তো মনের রোমান্স ও আবেগ প্রকাশের মাধ্যম হতে পারে না। প্রাচীন আর মধ্য যুগের কবিরাও সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। রাষ্ট্রের সংকট ও সমস্যায় কবিতা নিয়ে সাহসের সঙ্গে নিপীড়িত জনতার সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রকাশ করেছেন শাসক-শোষক শ্রেণীর নানা অত্যাচার-অসঙ্গতির চিত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রাজনীতি সচেতন একজন লেখক। তিনি সমাজের নানা অসঙ্গতি তাঁর গল্প-উপন্যাসের মতো কবিতায় প্রকাশ করেছেন। বিশ্বের সব দেশের মানুষ তারুণ্যের দ্বারপ্রান্তে এসে কবিতা রচনায় ব্রতী হয়। তারুণ্যে দেখা ভালোলাগা নারীর প্রতি খুব সহজে ভালোবাসা জন্মে। কখনো সে ভালোবাসা একতরফাও হতে পারে। আর সেই ব্যর্থতার প্রকাশ কবিতার শব্দে হতে পারে। অধিকাংশ কবি-শিল্পীর বেলায় এ ঘটনা অনেকটা সত্য। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য কতোটা যথার্থ, তা জানা যায়নি। অন্তত তাঁর তারুণ্যে রচিত কবিতার ভাব-ভাষা সে কথাই সমর্থন করে। তাই সূচনা লগ্নে অনেক কবির মধ্যে যে আবেগ আর বালখিল্যতা থাকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় বা কথাসাহিত্যে কিন্তু তা অনুপস্থিত। একেবারে সচেতন মানসে এবং যৌক্তিক মানসে তিনি কবিতা লিখেছিলেন। শাসকদের উপেক্ষিত প্রান্তিক মানুষের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে তিনি তাদের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর কবিতা। এখানে নারীর প্রেমের তীব্র রোমান্স কিংবা ফুল-পাখি-নদী-আকাশ ইত্যাদি দেখে তার মধ্যে নতুন কিছু দেখার চোখ মানিকের থাকলেও সেটাকে তিনি বাস্তবসম্মত মনে করেননি। কিন্তু তিনি যে চোখে জীবন আর জগৎকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেখানে মানবতার যে নির্মম অবমানার বিরামহীন প্রতিযোগিতা

---

[২০] মানিক গ্রন্থাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, কবিতা: "ডিসেম্বর" (কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৬), পৃ. ৩৯।

দেখেছিলেন, তা তাঁর সাহিত্যে আক্ষরিকভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সেই উপেক্ষা-উৎপীড়িত এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুসের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি কবিতা লেখার প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন। তাঁর কবিতাই ছিলো উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অস্ত্র বিশেষ। সেই অস্ত্র প্রয়োগ করে তিনি দেশের অবহেলিত মানুষের চিত্র তুলে ধরেছেন। বলেছেন:

আমার জনতা,
আজো জন্মে উলঙ্গিনী ক্ষুধার জঠরে,
না-খেয়ে মরে না,
জমে না ঠাণ্ডায়,
গলে না উল্লাসে শত জারজের উচ্ছিষ্ট স্নেহ তাপে
উচ্চকিত রাজপথে রিলিফখানার ডাস্টবিনে।
সর্বহারা ক্ষুধাতুর প্রাণ,
বিশ্বজয়ী আশা নিয়ে ঘৃণা করে যায়।[২১]

এই দীর্ঘ কবিতার বিজ্ঞানের যুক্তি উত্থাপন করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেন, অহিংসাই মানুষের দীর্ঘস্থায়ী জয়ের পতাকা বহন করে। এই যে ক্ষুধা, মারী-মড়ক আর মানবতার বিপর্যয়, এটা সাময়িক পরাজয়। এই পরাজয়ই একদিন মহান ত্যাগ হয়ে বিশ্ব জয় করবেই। পৃথিবী যখন উত্তপ্ত ছিলো, তখন কোনো কিছুই সৃষ্টি হয়নি। যখন পৃথিবী ক্রমান্বয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসে তখন সৃষ্টি হয় প্রাণের। সেই অমূল্য প্রাণ লাঞ্ছিত হলে কবি কণ্ঠ উচ্চকিত হয়। জানায় তীব্র প্রতিবাদ:

শীতলতাই ধর্ম জীবনের,
যত কম তাপ তত মহান আগুন,
ধন্য নিভে গেলে !
তোমার বিজ্ঞান কি বলে ?
. . . . . .
আমি মানুষের কবি, পৃথিবী আমার
আমি ঘৃণা করি।[২২]

এই যে নিরন্তর শোষণের ফলে মানুষ যে ক্রমাগত বিপন্ন-বিপর্যস্ত হচ্ছে, হচ্ছে শোষিত-বঞ্চিত-লাঞ্ছিত, কবি তার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। এই শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঘৃণা দিয়ে, একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করে তাকে চিরতরে সমূলে উচ্ছেদ আর অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সাহিত্য রচনায় প্রতিশ্রুত হচ্ছেন, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমগ্র বিশ্বে সর্বক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করেছে। বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আরেকটি যুদ্ধের ভয়াবহ ইঙ্গিত, মূল্যবোধের চরম অবমূল্যায়ন আর অবক্ষয় এবং মানবতার অবমাননার পাশাপাশি দেশে দেশে বিবেকসম্পন্ন মানুষের যুদ্ধ বিরোধী অবস্থান নিয়ে জনমত গঠন। রুশ বিপ্লবের (অক্টোবর, ১৯১৭) ফলে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী জনতার সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন এবং সেই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে এবং নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে তার পতাকা তলে জনসমাবেশ করা। ভারতেও ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সমগ্র বাংলায় সেই রাজনীতির অন্যতম পুরোধা ছিলেন কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ছাত্র। তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে যেমন জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) সংবাদ পর্যবেক্ষণ করেছেন, তেমনি 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন'-এর সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের

---

[২১] *মানিক গ্রন্থাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড (কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৬), পৃ. ২৬।

[২২] *তদেব*, পৃ. ২৯-৩১।

প্রতিও তাঁর রাজনীতি সচেতন মনের দুয়ার খুলে রেখেছিলেন। চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনকে গ্রেফতার করে দেওয়া হচ্ছে ফাঁসি। বিনয়-বাদল-দীনেশসহ অসংখ্য সাহসী বাঙালিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করার অভিযোগে হয় ফাঁসিতে ঝুলানো হচ্ছে, নয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিংবা দীপান্তর দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজরা নির্মমভাবে দমন-পীড়ন করেও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কার্যক্রম বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়।

তাঁর প্রথম পর্যায়ের কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রীয় প্রভাব স্পষ্ট হলেও সেই প্রভাব তাঁর রচনায় স্থায়িত্বলাভ করেনি। 'অতসীমামী' বা 'নেকী'–এই জাতীয় দু'চারটি গল্পে সে প্রভাব খানিকটা লক্ষ করা গেছে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বা সমসাময়িক কবিদের প্রভাব নেই। এমন কি ত্রিশোত্তরের কবিদের–বিশেষ করে 'কল্লোল', 'পরিচয়', কালি-কলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি লেখকদের লেখায় ভারতীয় দর্শন-বিজ্ঞানের বিপরীতে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের–বিশেষ করে ফ্রয়েড-ডারুইনের দর্শন-বিজ্ঞান তত্ত্বের অনুকরণ যে কবিদের মধ্যে স্বকীয়তা অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানিকের কবিতা তা থেকে মুক্ত। তিনি তাঁর পরিপার্শ্বকে একজন সচেতন নিরীক্ষকের চোখে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মানবতা কিভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে, মানুষ কেনো শোষিত-লাঞ্ছিত হচ্ছে, তার যৌক্তিক কারণ কবিতা ও কথাসাহিত্যে বিশ্লেষণ করেছন এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষকে এই অন্যায়ের বিপরীতে কি করতে হবে সে পথও তিনি নির্দেশ করেছেন। নিচের কবিতাটি তার উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ:

আগ্নেয়গিরির পুরানো খনি চাঁটগাঁ,
...পাহাড়ের বিস্ফোরণে ধরা পড়েছিল,
সোনায় ঠাসা সে খনি, ইস্পাতের মতো তীব্র সোনা।
চাঁটগাঁ থেকে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে চাঁটগাঁর মালিক ?
বেশ করেছে,
তাড়িয়ে দিয়েছে বলেই তো এবার
ওদের যে তাড়াতে হবে,
জগৎ থেকে,
এটা বুঝে তুমি,
মার্কস লেনিন স্ট্যালিনের
সাঙাৎ হয়েছ ![১৩]

এই কবিতাটি যে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনকে উদ্দেশ্য করে রচনা তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা দিন-রাত্রি সমাজ ও জনসেবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে কণ্ঠ ভেঙে ফেলে, তারা অনেকেই ব্যক্তি জীবনে ঠিক তার বিপরীত কাজের সঙ্গে যুক্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন সমাজের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তঃসারশূন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ঘটনা। শোষিত জনতার পক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করার মতো সাহস দেখান না। তাদের ভয় পাছে শাসক শক্তি কষ্ট পায়, ক্ষোভ প্রকাশ করে, তাদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে তারাও শেষ অব্দি অবস্থান নিতে দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করেন। এদের বলে সুবিধাবাদী আর সুযোগ সন্ধানী। তারা দোদুল্য চিত্তেরও অধিকারী। তারা শিক্ষিত হলেও সবাই নিপীড়িত জনতার মিত্র নন। আর তারই প্রকাশ ঘটেছে নিচের কবিতাটিতে। এখানে মানিক শ্রমজীবী মানুষের শোষণ-বঞ্চনার চিত্র একজন দায়িত্ববান কবির মতো পরিবেশন করেছেন। করেছেন আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের ব্যঙ্গ আর কটাক্ষ।

জীবনের মানে পেলাম না কবিতায়,
মরণের মানে পেলাম না দুঃখীর জীবনে।

---

[১৩] তদেব, পৃ. ০৫-০৬।

কি দিয়ে বন্দনা শুরু করি ?
রাজার প্রাসাদে বাক, অর্থ জনতায় !
কবিতা লেখা হল না প্রথম যৌবনেও।
... ...
বন্ধুরা মুখোশপরা বুদ্ধিজীবী জীব।
শত্রু মিত্র চেনা দায় স্বদেশের সঙ্কীর্ণ সীমায়,
দানবের দাঁতে নখে আহতা ধরণী,
বিষে জরজর।[২৪]

'চা' কবিতাটি দীর্ঘায়তনের। যারা চা উৎপাদন করে তারা কখনোই উৎকৃষ্ট চা পান করতে পারে না। শ্রমজীবীদের গতর খাটানো উৎপাদন সামগ্রী বিক্রি করে মালিক পক্ষ যে বিপুল ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে বিলাস-ব্যসনের জীবন উপভোগ করে, তার কিঞ্চিত নাগরিক সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পান না উৎপাদক শ্রেণী। তারা যা উৎপাদন করেন তার মালিক তারা নন, মালিক যারা তারা শ্রমবিমুখ। মালিকেরা তাদের শোষণ করে বলেই সমাজের সবচেয়ে খারাপ পরিবেশে আর্থিক অভাব অনটনে শ্রমজীবীদের বঞ্চনার জীবন কাটে। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সদস্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের এই উৎপাদক শ্রেণীর জীবন কেবল প্রত্যক্ষই করেননি, তিনি তাদের মুক্তির আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। নিচের কবিতাটিতেও সেই একই চিত্র ভেসে ওঠে:

তুমি কাব্যে টাকার জোরে ক্ষুধার বিনিময়ে,
পিয়াসী মদ যৌন মেয়ে পাও !
তোমার তো এই মদ্যপ অভিযান,
মেয়েগুলি যৌন প্রতিক্রিয়া–
কামনার গর্ত আর প্রসব করার সুখ,
কবির যেন বিপদ ভয়ানক,
রক্ত পঙ্কে মাখা ওঁয়াও সার্বজনীন ভাষা,
মেয়েকে বলে মা !
সব মেয়েকে ![২৫]

সামন্ত আর পুঁজিবাদী সমাজের সাংস্কৃতিক এবং আর্থনীতিক চরিত্র বিপরীত হলেও নারীর ক্ষেত্রে উভয় সমাজ ব্যবস্থাই উৎকটভাবে আগ্রহী। অপরের শ্রম শোষণ করে অর্থের পাহাড় গড়ে ভোগ বিলাসিতাই যে ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। তারা নারীকে সেই বিলাসিতার অঙ্গ হিসেবেই বিবেচনা করে। 'উত্তর দক্ষিণ' বা 'নূতন ঘৃণার কবিতা' ওই একই বক্তব্য ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। এসব কবিতা পাঠ করে কারো কাছে রাজনীতিক শ্লোগান বলে মনে হতে পারে। সময়ের পরিবর্তনে মানুষ যেখানে নিজের অধিকার বুঝে নিতে তৎপর সেখানে রাজনীতি ব্যতীত যে তা আদৌ সম্ভব নয়, এ কথাটা অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু তারা নিজের শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে যখন রাজনীতিকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন, তখন কিন্তু একবারও মনে হয় না শোষিত-বঞ্চিত শ্রমজীবী শ্রেণীও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ওই রাজনীতিকে আশ্রয় করেন। না করলে তারা কি করে নাগরিক অধিকার আদায় করবেন। মানুষ তো যন্ত্র নয় ? তাকেও সাধ্য মতো শ্রম আর প্রয়োজন অনুযায়ী জোগানের দাবি ঐক্যবদ্ধ হয়েই জানাতে হয়। আর তা যদি রাজনীতি হয়, তাহলে তা উপেক্ষার বিষয়টি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানা ছিল। তাঁর মতে, প্রভুত্ববাদী ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুর মানসিকতার বিস্তারে তাতে বাধা সৃষ্টি করে বলেই এই ভিন্নতর স্বার্থচিন্তা।

---

[২৪] *তদেব*, পৃ. ১২ ও ১৫।
[২৫] *তদেব*, পৃ. ৪৬।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক কবিতাংশের কবিতাগুলি তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। আর সেগুলো তারুণ্যের আবেগের পাশাপাশি তাঁর নিয়ত স্বভাব যুক্তিপ্রবণতার প্রধান্য বর্জিত হয়নি। যেমন *যৌবন* কবিতার তিনি এই বলে আহ্বান জানিয়েছেন যে, যৌবনকাল মানুষ ও দেশের কল্যাণ কর্মে নিবেদিত হতে হবে। ঘরে বসে অলসতা করে যৌবনকে অপচয় করা অযৌক্তিক। কারণ দেশ ও মানুষ যুবকদের ওপর সবচেয়ে বেশি আশাবাদী। তারাই সাহসের সঙ্গে সংকটকালে জাতির কল্যাণের দায়িত্ব নিতে পারে। তিনি তাই কবিতার শেষে বলেছেন:

ওগো ধরণীর ভীতু নরনারী,
এসো এ বাহিরে কারাগেহ ছাড়ি
বাহিরে যদি বা কালবৈশাখী
দেখ তাও কত রসময় !
দৃষ্টিসীমার পারে যৌবন
ফুল ফল করে সঞ্চয় !
যৌবন নহে অপচয় ![২৬]

কবিতাটির অন্ত্যমিল লক্ষণীয়। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকথা' (রচনাকাল : ৬ জুলাই ১৯২৮) বা 'যৌবন' তাঁর একুশ বছর বয়সে রচিত *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের প্রাককথন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। *যৌবন* শিরোনামের কবিতাটিও মধ্যবিত্ত মানুষের কৃত্রিম জীবন থেকে বেরিয়ে না এসে ঠুনকো অহংকারকে তিরস্কার করেছেন যুবক কবি। এই কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর শ্রেণী সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। 'সূর্যমূখী' কবিতায় সূর্যমূখী ফুলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এই ফুলের কোনো গন্ধ ও মধু নেই। দিনের বেলায় সে নির্বাক মুখে উন্নতশিরে রৌদ্র-তাপ উপেক্ষা করে। বুকে তার অজস্র তৃষ্ণা, তবু সে দহনকেই প্রত্যাশা করে। আর সন্ধ্যা নামলে শিশিরে অবগাহন করে শক্তি সঞ্চিত করে পরের দিনের অপেক্ষায়। কবি সে কথা এইভাবে বলেছেন:

বুকে জাগে তৃষ্ণা, তবু দহনেরে মাগে !
ধরণীর এক কোণে বসি'
উপেক্ষিয়া যায় কান্না হাসি
দহন উল্লাসে। সন্ধ্যাবেলা
নতমুখে বিরহের জ্বালা
বরি' লয়।....প্রভাতের তরে,
বুক শুধু শিশিরেতে ভরে ![২৭]

অনুরূপ 'শেফালি' ও 'জবা' ফুল শিরোনামের কবিতা দু'টি তাদের বৈশিষ্ট্য স্বাক্ষরিত কবিতা। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি প্রতিভার পরিপূর্ণতা লক্ষ করা যায় শিরোনামহীন সতেরোটি কবিতাগুলোর মধ্যে। 'তুষের আগুন'ও একটি রাজনৈতিক কবিতা। এই কবিতায় কবি সরাসরি দেশ ভাগ (বাংলা ভাগ) ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কটাক্ষ করেছেন। 'বাংলা ভাঙার কবিতা' নামে তিনি একটি রাজনৈতিক কবিতাও লিখেছেন। কবিতাটি অনেকটা অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত ছড়ার মতো।

তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর ওপর রাগ কর
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা বাংলা ভেঙে ভাগ করো।[২৮]

---

[২৬] *তদেব*, পৃ. ৬৮।
[২৭] *তদেব*, পৃ. ৫৯।
[২৮] *অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, (কলকাতা: বাণীশিল্প, ১৯৯৮), পৃ. ১৮।

মানিক যখন বাংলা ভাঙার কবিতা রচনা করছেন তখন ভগ্ন বাংলা আন্দোলনের তোড়ে পুনরায় একত্র হয়েছে।

তাঁর কবিতার ভাষা ব্যঙ্গধর্মী নয়। বরং বলা যেতে পারে খানিকটা বক্রোক্তি কোথাও কোথও লক্ষ করা যায়। তিনি সরাসরি শাসক এবং তাদের দালালদের বাংলা ভাঙার বিরোধিতা করেছেন। তারা বাংলা ভাঙার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলো, তারও একটা চিত্র এই কবিতায় বর্ণনা করেছেন:

খবরের কাগজ নাকি বাংলা ভাগ করতে চায় ?
নেতারা নাকি ভাতের হাঁড়ি ভাগ করতে ইচ্ছুক,
বড়লাটের আজ্ঞায় ?
... ...
নেহেরুর নখের আঁচড়ে জিন্নার গরিব মুসলমানের প্রতি দরদে,
দাঙ্গা, কারফিউ, ব্যর্থ ও মিথ্যায় ?
নেতাদের নেতারা বাংলা ভাগ করতে চায় !
বাংলা বাঙালীর।
ঈশ্বর আল্লার হাজার বছরের সব জনমন মহামহোদয় বাক্য,
জীবন ফাউ নাকি ? মরণ তো জানাশোনা।
... ...
মাইরি বলছি কালীর দিব্যি, খোদার দোহাই,
আর মরা যায় না কিছুতেই।
তাই ঈশ্বর আল্লা নেতা লাটদের বাদ দিয়ে
এবার বাঁচতে চাই,
মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই।
ঘর ভাগ হোক,
ভাগ হতে দেব না দেহটা, প্রাণটা ![২৯]

অবিকল কিছু কথার প্রভাব এই কবিতায় লক্ষণীয়। তবে 'তুষের আগুন' কবিতাতেও তার খানিকটা প্রতিধ্বনি আমরা ব্যঞ্জিত হতে দেখি:

রাত্রি যেমন আত্মনাশের ভোরে,
দিনকে জ্বালায় পূর্ব পাকিস্তানে।
চোখের পলক ফেলার আগে বিরাট হিন্দুস্থান,
সে দিনেরই আলোয় ডুবুডুবু ![৩০]

আবার 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় বলেছেন দেশে খাদ্যের অভাব। মানুষ অন্নহীন, ক্ষুধার্ত। কিন্তু খাদ্য বোঝাই লরি গোপনে চলে যায় চোরাবাজারি আর মজুতদারের গুদামে। যে মানুষগুলো ক্ষুধার আক্রমণে ক্রমাগত মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে কবি তাদের কবিতার মৃত্যু তথা সুন্দরের মৃত্যু বলে উল্লেখ করে বলেছেন:

---

[২৯] তদেব, পৃ. ৩৩-৩৪।
[৩০] তদেব, পৃ. ৩৬।

শোষণশুষ্ক মরুতে ঘাস গজাতে চায়,
চাওয়া সম্বল করে অফুরন্ত অঙ্কুর উঁকি মারে,
তারার ডাকে শিশির ঊর্ধ্বে উপে যায়,
অনাগত ঘাসেদের স্নেহে ভেজাবে,
বনস্পতির শিকড় বেঁধেছে মাটির প্রেম।[৩১]

'ডিসেম্বর' কবিতাটিও সুকান্তের মতো শীতে গরিব-দুস্থ শিশুদের জন্য সূর্যের অকৃপণ আলো প্রত্যাশা করার আঙ্গিকে রচিত একটি কবিতা। 'শিরোনামহীন কবিতা'র সাত সংখ্যক কবিতাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি কবিতা। রাজনীতি সচেতন কবি বলেছেন:

এদিকে আকাশে আশা ছিল না,
নির্মেঘ ধূসরতা !
এদিকে বাতাসে গতি ছিল না,
গুমোটের হাঁপ ধরা !
ওদিকে মাটিতে মানুষ ছিল বেঁচে,
লড়াই নিরন্নতা সব কিছু অবজ্ঞা ভরে,
দারুণ ঘৃণায়,
এক পাশে ঠেলে ফেলে শিকড় গেড়েছে মাটিতে,
যত দিক তত শিরা মানুষের,
শোষকের হৃৎপিণ্ড শিকড় গাড়া।[৩২]

INSTITUTE OF BANGLADESH STUDIES
LIBRARY
RAJSHAHI UNIVERSITY

একজন রাজনীতিসচেতন কবিই কেবল পারেন এই অনুভূতি ব্যক্ত করতে। এখানে আকাশের চাঁদে প্রিয়ার মুখ প্রদর্শিত হতে না দেখে যারা কবিতা হিসেবে এই কবিতাগুলিকে কবিতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সঙ্কোচবোধ করেন, তাঁরা কবিতা বলতে যদি কেবল মেঘ-তারার রঙ, ফুল-পাখি আর প্রেমিকার রঙিন ঠোঁট অনুভব করেন, তাহলে বলতেই হবে জীবন মানে কেবল সোনার কাঁকনে বাঁধা জগৎ নয়, জীবনের লড়াইটাও একটি বাস্তবতাপূর্ণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই ভাবনা যথার্থ প্রতিফলিত করেছেন তাঁর কবিতায়। কথাসাহিত্য তাঁর এই কবিতার উর্বর চারণ ক্ষেত্রেরই প্রতিফল বলে অনুমান করা কল্পনা নয়, বাস্তবসম্মত একটি স্বাতন্ত্র্য ভাবনা।

মেছুনির ধার করা পাতলা শাড়ি,
ছায়া শেমিজ নেই।
পানওলা আড় চোখে নজর রাখছে,
বাবুদের পোয়া ছটাক মাছ কেনা।
... ...
তবু, পানওলা তার দেহের লাভের নিয়ন্তা !
সাধ ছিল তার মা হবার,
সস্তা সেই চলতি সাধও পানওলাটির অসুখে
চিরদিনের তরে বিসর্জন ![৩৩]

শোষিত-বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের এমন করুণ চিত্র বাংলা কবিতায় বিরল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিকৃতির স্বাতন্ত্র্য এখানেই। কবি সুকান্তের মৃত্যুর আগে ৪ মে ১৯৪৭-এ রবিবারের *স্বাধীনতা* পত্রিকায় তাঁর 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের পাঠক মাত্রই কবি-

---

[৩১] *তদেব*, পৃ. ৩৮।
[৩২] *তদেব*, পৃ. ৪৫-৪৬।
[৩৩] *তদেব*, পৃ. ৪৬।

কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং তাঁর কবিতা সম্পর্কে অবহিত। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির নিরলস কর্মী। এ ছাড়া যুদ্ধ বিরোধী একজন প্রচারক ও সাংস্কৃতিক কর্মী। তাঁর নিরলস রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। কারণ সে সময়ে তিনিও কমিউনিস্ট পার্টি এবং যুদ্ধবিরোধী কাজের একজন কর্মী ছিলেন। সে কারণে কবি সমচেতনাসম্পন্ন সুকান্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকাটাই স্বাভাবিক। সেই কবি অল্প বয়সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায় আশ্রয় নিলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানসিকভাবে ভীষণ আঘাত পান। মানুষের দারিদ্র্য, তাদের প্রতি অবহেলার জন্য তিনি প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন। বলেছেন কবি হচ্ছেন বসন্তের কোকিল। গান গেয়ে সুরের মূর্ছনায় ঘুমন্ত মানুষকে জাগান এই কবিরাই। তাঁরাই মানুষের মনে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম সৃষ্টি করেন। সেই কবি যখন জাগরণের সঙ্গীত পরিবেশন করতে করতে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন কি সেই পরিবেশে বসন্তের জয়গান মানায় ? চাঁদা তুলে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত কবিকে আরোগ্য করার প্রত্যয়ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্ত করেছেন:

তোমার বুক কুরে খাচ্ছে টি বি কীট।
দুর্যোগের ঘনকালো মেঘ ছিঁড়ে কেটে
আমরা রোদ এনে দেব গায়ে,
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ ?
কে গাইবে জয়গান ?
বসন্তে কোকিল কেসে কেসে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত ![৩৪]

৫. স্বাতন্ত্র্যমাত্রিক শব্দবিন্যাস

তাঁর কবিতায় শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবনানন্দ দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের মতো তাঁর কবিতায় শব্দ ব্যবহারে ঐন্দ্রজালিকতা নেই। তাঁর শব্দ ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে জীবনচর্চা আর বক্তব্যের তির্যক প্রতিফলন ঘটানো। তিনি ভাষার সাহায্য নিয়েছেন মুখ্যত কারুকাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, উক্তির প্রত্যক্ষতা সৃষ্টি করতে। সে ক্ষেত্রে তিনি যেমন উপমা ব্যবহার করেছেন : 'আমার ঘৃণার মতো তোমারও আদিম আলো তাপ ; কাঁকরের মতো চাল ; লেলিহান শিখার মতো পুঁই ডগা ; বরবেশী এটমের পালকি ; প্রাণহীন লোভের বরফ ; উঠতি সূর্যের লাল রোদের ভালোবাসা ; জলঠোসা ব্রণের মতো; আকাশ ভেঙে পড়ল হঠাৎ শামিয়ানার মতো; সুন্দর পেয়ালা, চকমকি পাথরের রূপ যেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনুরূপ রূপকল্প সৃষ্টিতেও মানিক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন : দয়ার শোষণে শুভ্র পাটের মুকুট ; জপে কান্না উইধরা সুরে ; শীতে মণ্যা উপবাসী বাঁকা চাঁদখানি ; গৈরিক বৈরাগ্যে শিশু বাল্মীক কবরে লাঙলের বিরহিণী মাটির ঢেলা, কৃত্রিম বাঁধানো দাঁতে যুদ্ধর খিঁচুনি ; অর্জুনের সিফিলিস উর্বশীর রুজি ; পিয়াসী মদ যৌন মেয়ে পাও' অন্যতম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত বিশ্বাস এবং বোধের দাসত্ব করেননি। তিনি কাব্যের ভাষাতেও বিদ্রোহী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শব্দ ও বাক্য ব্যবহারেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ার মতো। যেমন : 'প্রান্ত-ফ্রান্ত, বিস্কুট-ফিস্কুট, শব্দ-মদ, ভাতার-পুতের, মুথা ঘাসের, চোখে উথালানো, সাঙাৎ, সিফিলিস, টাকা-ওলা , গান্ধী-ভাঙানো, লাঙলের বিরহিণী মাটির ঢেলা, যৌন-চিকন, আলুনি-সংগ্রাম, মাইরি' ইত্যাদি তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ক বলে দাবি করা যেতে পারে। কবিতার শরীরে এই শব্দ বিন্যাস অপ্রচলিত কিন্তু অভিনব শিল্পগুণে

---

[৩৪] তদেব, পৃ. ৬৫।

সমৃদ্ধ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের জীবন চিত্র কবিতায় এঁকেছেন, তাদের সম্পর্কে এই শব্দগুলোই সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। এই শব্দগুলো যুক্ত না হলে বোধহয় তাঁর কবিতা রচনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হতো। শোষিত শ্রেণীর জীবন চিত্রকে এই ভাষায় উপস্থাপন করার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ সংযুক্ত হয়েছে।

আবার কবিতায় অন্ত্যমিলের দৃষ্টান্তও তাঁর কবিতায় লক্ষ করা যায়। যেমন–'যৌবন', 'সূর্যমুখী', 'শাওন রাতে', 'রূপকথা', 'জবা', 'দিগ্বিজয়ী', 'পত্র', 'নাস্তিকের কথা' প্রভৃতি কবিতায় অন্ত্যমিল মানিক বাংলা কবিতার অতীত ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। এ ছাড়া এই সব কবিতায় তিনি ক্রিয়া ও সর্বনাম পদে সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন:

আপনার অস্তিত্বই যবে একদিন
অসীম শূন্যের মাঝে হইবে বিলীন
কেন তবে ওরে মূঢ় দু'হাত বাড়ায়ে,
আর এক মহাশূন্যে ধরিস জড়ায়ে ?[৩৫]

অথবা–'পত্র' কবিতার অন্ত্যমিলের দৃষ্টান্তও এখানে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই কবিতায় মানিক চার পংক্তির প্রথম ও চতুর্থ পংক্তি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির অন্ত্যমিল দিয়ে রচনা করেছেন।

গান থামে, সুর যায়, কিন্তু তার থাকে শেষ রেশ,
চিঠি শেষ কিন্তু তার রেশ থাক কুশল জিজ্ঞাসা,
তাহার জবাব পাব ফিরে ডাকে নিয়ে এই আশা,
আজিকার মতো আমি করিলাম দীর্ঘ পত্র শেষ।[৩৬]

আবার 'শাওন রাতে ' কবিতার ওই চার পংক্তির প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির অন্ত্যমিল লক্ষণীয়। অতীত ঐতিহ্যকে মনে রেখে এক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতায় মানিক নতুন অন্ত্যমিল দিয়ে কবিতার শরীরে অভিনবত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তাতে তাঁর স্বকীয়তার স্ফুরণ না ঘটলেও তিনি নিজের বক্তব্যকে তাঁর মতো করে প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে কবিতাকে গড়েছেন।

তাহারে হিয়া হৃদয় দিয়া চিনিল নবভাবে
পড়িল ধরা কিসের যোগাযোগে
হৃদয় মম উঠিল ভরি বাদল অনুরাগে
শাওন ঘন বাদল রাতে জেগে !৩৭

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত—এই তিন ছন্দেই কবিতা রচনা করেছেন। এখানে 'তাহার', 'মম' ইত্যাদি সর্বনাম পদ এবং 'হইবে, 'করিলাম','দিয়া', 'চিনিল', 'উঠিল' ইত্যাদি ক্রিয়া পদগুলো সাধু ভাষার। তেমনি আবার চলিত ভাষার মিশ্রণও একই কবিতায় লক্ষণীয়। যেমন 'তার', 'জেগে', 'নিয়ে', 'ফিরে', 'মতো' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ কিংবা তাঁর অগ্রজ কবি-কথাশিল্পীদেরও রচনায় এই সাধু ও চলিত ভাষার ব্যবহার প্রচলিত রীতিরই অনুবর্তী বলে মনে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*সহ যে সব উপন্যাস ও ছোটগল্পের বর্ণনা সাধু ভাষায় রচিত, তার সবগুলোতেই এই মিশ্রণ দৃষ্টিগোচর হয়। এ থেকে ধারণা করতে হয় যে, সে সময় একই বর্ণনা ও বিবৃতিতে সাধু-চলিত উভয় ভাষায় সমান্তরালে ব্যবহৃত হতো। সেটাই তখনকার সাহিত্য রচনারীতি বলে সর্বজন স্বীকৃত ছিলো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের কবিতায় এই মিশ্রণ এবং অন্ত্যমিল চোখে পড়ে।

---

৩৫ *তদেব*, পৃ. ৫৩।
৩৬ *তদেব*, পৃ. ৫৭।
৩৭ *তদেব*, পৃ. ৬৪।

কবিতার মূল বিষয় শিল্প-সৌন্দর্য সৃষ্টি। বাক্যের সমান্তরালে রস সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিরা বলেছেন, 'নিঃসঙ্গ যে বাক্য রস তার মধ্যে অনুসৃত নয়। রসের অধিষ্ঠান ঘটে যখন বাক্য রসসম্পৃক্ত হয়ে ওঠে।'[৩৮] শব্দ কেবল কবিতার রস সঞ্চারে এককভাবে ক্রিয়াশীল নয়। কবিতার বিষয়বস্তু, ভাব-কল্পনা আর অলংকারও তার সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। কবিতা যদি রাজনৈতিক শ্লোগানধর্মী হয়, কিংবা নিছক প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে, তাহলে তার শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ হয়। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের অনেক কবিতা তাই শিল্পসম্মত কবিতা হয়ে ওঠেনি। কবিতার ভাষা এবং বিষয় এই দুইয়ের যথার্থ সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পারলে তার শিল্পমান বিঘ্নিত হবেই। কারণ 'কাব্য ধ্বনিসুষমার, ধ্বনি-কৌশলের আশ্রয়, অন্যদিকে আবার তা, বাব বিনিময়ের বাহন। ভাষা একাধারে কাজের ভাষা, আবার তা সঙ্গীতের ভাষা ; একদিকে যেমন তার সুর আছে, অন্যদিকে আবার তার তর্কশাস্ত্রসম্মত রূপও আছে। সেই জন্য সাহিত্যের দুটি রূপ পরস্পরকে তির্যক ভঙ্গিতে ছুঁয়ে চলে গেছে।'[৩৯]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে এই শিল্পগুণটি প্রত্যক্ষ নয়। চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে অনেকের কবিতায় এই দীর্ঘস্থায়ী গুণ বিশ্বাসের প্রতি অনাস্থা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিল্পের চেয়ে তাঁরা কি সমাজ বাস্তবতা কিংবা সামাজিক দায় পালনটাকে প্রধান করে দেখেছেন ? 'কবিদের কবি বিবেকের চেয়ে সামাজিক বিবেক প্রখর। সেখানেই তাঁদের শক্তির উৎস এবং দুর্বলতার।'[৪০]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়সহ তাঁর সমসাময়িক বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী কবিদের কবিতায় এই দায় সম্পাদনটাই যেন প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। সমর সেন, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলেশ্বর ঘোষ, ভাস্কর চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ কবির অনেক কবিতা যতোটা না শিল্পসমৃদ্ধ তার চেয়ে বেশি বক্তব্যধর্মী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কবি-শিল্পীরাই ছিলেন শোষিত-লাঞ্ছিত জনতার জোট বেঁধে অশুভ শক্তিকে উৎখাতের প্রেরণা ও দিকনির্দেশনার প্রধান শক্তি হিসেবে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকেও তাই গান আর কবিতা লিখে রাজপথে প্রতিবাদী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে হয়। তাঁর গান আর কবিতা হয়ে ওঠে প্রেরণাদায়ক এক অটুট শক্তির আধার। কাজী নজরুলের উদ্দীপনাময় গান-কবিতা তো ইংরেজ শাসকরা বারংবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। চেতনার এই মৌল পথ রেখায় কবিতা নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা। এখন প্রশ্ন সেগুলো শব্দে-ছন্দে আর বিষয় ভাবনায় যাকে কবিতা বলা হয়, সেই কবিতা হয়ে উঠেছে কিনা। কেউ কেউ সেগুলো উৎকৃষ্ট কবিতা হিসেবে মানতে চাননি। ইতিপূর্বে সে তথ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কবিদের সামাজের চিন্তা-চেতনায় অন্যদের তুলনায় অগ্রসর। তাই সমাজ-রাষ্ট্রের নানা অসঙ্গতি, উৎপীড়ন-অনাচার তাঁদের দৃষ্টিতেই প্রথমে প্রতিফলিত হয়। তাঁরাই সে কারণে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে জনসাধারণকে আহ্বান জানান। রাজপথে নামেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সামাজিক দায়িত্ব পালনে কেবল কথাসাহিত্য নিয়ে উপস্থিত হননি, কবিতার শব্দ-ছন্দ-সুর নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

৬. শেষ কথা

সাহিত্য চর্চার সূচনালগ্নে কবি কখনো শব্দ ব্যবহার আর আবেগ সংযম করেছেন। কিন্তু সেগুলো যে আদৌ কবিতা হয়নি-এমন মূল্যায়ন উপেক্ষারই সমতুল্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে নিতাই বসুর মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'সবুজে পাখি ও হলুদে পাখি, শেফালি, সূর্যমুখী, জবা বা রূপকথা কবিতাগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পর্যায়ের রচনা। এসব কবিতায় মানিকের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।'[৪১] অথচ পরবর্তীকালে একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি হয়ে

---

[৩৮] সুধীরকুমার নন্দী, *নন্দনতত্ত্ব* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, ৩য় প্রকাশ-১৯৯৬), পৃ. ৮৫।

[৩৯] *তদেব*, পৃ. ৮৫।

[৪০] অশ্রুকুমার সিকদার, *কবির কথা কবিতার কথা* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, মাঘ-১৪০০), পৃ. ৯৫।

[৪১] নিতাই বসু, পৃ. ২৮৮।

ওঠেন নির্ভেজাল অলঙ্কার বর্জিত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ যুক্তিবাদী সেইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন লেখক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে সরোজমোহন মিত্রও সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে: 'সেই প্রচলিত ভাব ভাবনা ছন্দ।'[৪২] কথাটি সামগ্রিক বিচারে যথার্থ নয় এ কারণে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের প্রচলিত শব্দভাবনা ও ছন্দের অনুসারী। কিন্তু পরবর্তীকালের কবিতা প্রসঙ্গে এ মন্তব্য তাঁর কবিতার প্রতি উপেক্ষার সমতুল্য। তাঁর এমন অনেক কবিতা রয়েছে, যা তাঁকে কবি খেতাব প্রাপ্তদের সারিতে দাঁড় করানো হয়তো যাবে না, কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য নির্মাণে সেই কবিতাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তাঁর কবিতায় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদসহ ফ্যাসিবাদের অনুচর হিটলারকে পর্যন্ত তির্যক ভাষায় আক্রমণ করেছেন। গান্ধি, নেহেরু, জিন্নাহ্, ভারত বিভাগ, দেশের মানুষের শোষণ-বঞ্চনার চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথাসাহিত্যের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কবিতাতেও। মানুষের প্রতি তাঁর দরদি মন এবং দায়িত্ববোধের তাগিদটিও তিনি অনুভব করেছেন। লেখককে লেখার মতো প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিতে হবে বলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করতেন এবং নিজেও তিনি বরাবরই রাজপথের সংগ্রামে সাহসের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। রাজপথই যে প্রয়োগের সে নির্দিষ্ট স্থান তা বোধহয় কাউকে বলে দিতে হবে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক হিসেবে এবং রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে কখনোই সংগ্রামরত জনতাকে পেছনে ফেলে পিছুটান দেননি। এখানেও ব্যক্তি মানিক অন্যান্য কবি-শিল্পীদের থেকে স্বতন্ত্র। একরকম লিখবেন আর করবেন অন্য, তা মানিকের চরিত্রে ছিলো না। রুশ বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন বলেছিলেন, An artist great must have reflected in his work at least some essential aspects of his revolution.[৪৩] লেখক মানিক লেনিনের এই জীবন বীক্ষণসমৃদ্ধ বক্তব্যের প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সাম্প্রদায়িকত দাঙ্গা, মঙ্গা-পীড়িত জনতা, যুদ্ধবিরোধী প্রচারে তিনি ছিলেন অকুতোভয় সৈনিক।

আত্মস্বীকৃতির মধ্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিকৃতিকে মূল্যায়ন করতে হবে। তিনি মনেপ্রাণে মার্কসীয় রাজনীতির প্রতি ছিলেন বিশ্বস্ত। তাই তাঁর কবিতা রাজনৈতিক শ্লোগানধর্মী হলেও শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতি জাগরণের দায়িত্ব পালনে আপোসহীন হাতিয়ার হিসেবে প্রতিভাত হয়। তিনি হয়তো জনসাধারনের কাছে শিক্ষা নিয়েই সাহিত্যানুশীলনে মনঃস্থির করেছিলেন। আর মনে রেখেছিলেন, 'Learn from the masses, try to comprehend their action ; carefully study the practical exprience of the masses.' তাঁর ডায়েরিতে লেনিনের এই বিখ্যাত উক্তিটি লিখেও রেখেছিলেন। মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ওই ম্যাসেজের অতিরিক্ত সাহিত্যগুণের দাবি করতে পারে কি ? যেমন:

এবার চাষ করো,
গজাও
গজাও বিদ্রোহ ,
রাশি রাশি,
সবাই বাঁচুক–বিদ্রোহে।[৪৪]

শোষণ-বঞ্চনা অবসানের পথ নির্দেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লিখিত শব্দগুলো উচ্চারণ করে সমাজ ও নিপীড়িত জনতার প্রতি নিঃসন্দেহে একজন মহৎ কবির কেবল নয়, মানবতাবাদী মানুষের দায়িত্ব পালন করেছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি সস্তা জনপ্রিয়তার দিকে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলে ধরেছেন।

---

[৪২] সরোজমোহন মিত্র, পৃ. ১৯২।

[৪৩] V.I.Lenin-এর এই উক্তি মোস্তফা আলী তাঁর *মানিক চেতনা* গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। (ঢাকা: ঋত্বিক, ১৯৯১)।

[৪৪] *মানিক গ্রন্থাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৪৯।

কেননা সংকটে সাহসের সঙ্গে অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলাই মহৎ শিল্পীর দায়িত্ব। রুশো, ভলতেয়র, পুশকিন, গোর্কি, অস্ত্রভস্কি, সলঝিনিৎসিন, পাস্টারনক, লোরকা, প্রমুখ বিশ্বখ্যাত তাদের দেশের এই রকম সংকটকালে লেখনীকেই দুঃশাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সংগঠিত করেছেন জনমত। তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্র ও জীবন ব্যবস্থার চিত্র এবং আগামী করণীয়কে। এই বোধের উন্মেষের সঙ্গে মানিকের কল্পনাপ্রিয়তার সাবলীল বিরোধ দেখা যায়। সে কারণে তাঁর কবিতার সৌন্দর্যধর্ম, রসগ্রাহিতা আর শিল্পমান গদ্যের নিরেট অবয়বে পরিণত হয়েছে। শিল্পীর কল্পনায় যুক্ত হয়ে কবিতাগুলি আর সত্যিকারেই কবিতা হয়ে ওঠেনি। হয়েছে কবির নিজস্ব বক্তব্যের প্রচারধর্মী এক একটি অভেদ্য লিফলেট। লিফলেট কখনো কবিতা নয় বলে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু সেগুলো যে সময়ের সাহসী উচ্চারণ তা অস্বীকার করার কোনো উপায় আছে কি ? তাহলে সুকান্ত কিংবা নজরুলের কবিতা আর অনেক গানকেই তো লিফলেট হিসেবে পরিত্যাগ করতে হয়। এই কবিতাগুলো অনেক সময়ে—বিশেষ করে দেশের সংকটে প্রেরণা ও মুক্তির ত্রাতা হয়ে ওঠে। তবে মানিকের মধ্যে হয়তো স্বতঃস্ফূর্ততার প্রচণ্ড অনুপস্থিতি এবং অস্থির মানসিকতারই প্রকাশভঙ্গি দেখা যায়। তাঁর কবিতার মধ্যে সে উপাদান বিদ্যমান। তবু তাঁর কৈশোরের জীবন বীক্ষণ, পরিণত সময়ের রাষ্ট্র আর সমাজ ও মানুষ পর্যবেক্ষণ এই কবিতাগুলির মূল বক্তব্য। তাঁর কথাসাহিত্যে এই একই বক্তব্য এবং ভাষা সদম্ভে উপস্থিত। কবিতার জগতে মানিক গদ্যশিল্পীরই অনুকৃতি। একই মুদ্রার অপর পিঠ তাঁর কবিতা—অনেকেই এ কথার সঙ্গে একমত হবেন বলে আশা করি।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

মুরশিদি গানে গুরুবাদী দর্শন

প্রণবানন্দ সাহা*

Abstract: Bangladesh is a country of songs. With the passage of time various types of songs evolved here and continues to be sung. Among folksongs of Bangladesh Mursidi song is known as spiritual song and it has some characteristics of spiritual features. This article explains the historical and philosophical value of the song's spirit, language and utterance, method of conveyance, methods of practice, theme, *guru* and philosophical foundation of *Guruism*.

ভূমিকা

আধুনিককালে আমরা যে সব গান উপভোগ করে থাকি তার মধ্যে বাংলাদেশের লোকসংগীত এক শ্রেণীর সমৃদ্ধ গান। লোকসংগীতগুলোর পরিবেশন পদ্ধতি, বিষয়গত তাৎপর্য প্রভৃতি দিক থেকে বিশেষজ্ঞগণ লোকসংগীতের নানা শ্রেণীবিভাগ করে দেখিয়েছেন যে, তত্ত্বসংগীত এক বিশেষ ধরনের লোকসংগীত। তত্ত্বসংগীতে মুরশিদি গান বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মুরশিদ শব্দের অর্থ গুরু। আরবিতে এই শব্দের অর্থ পথ প্রদর্শক। ফারসি ভাষায় এর অর্থ পীর।[১] উপমহাদেশে এই অর্থে পীর শব্দটি বেশি প্রচলিত। তাই যেসব গানে গানের বক্তব্যের মধ্যে গুরু বা মুরশিদই প্রাধান্য পায় তাকে মুরশিদি গান বলে। মুরশিদি গানে মুরশিদকে কেন্দ্র করে ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস উদ্‌গলিত হয়। গুরুবাদ এখানে বিশিষ্ট মাত্রা অর্জন করে।

বাঙালির লৌকিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটে তার লোকসংগীতে। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই মুরশিদি গানের প্রচলন আছে। মুরশিদি গানে দেশজ তান্ত্রিক ধারার রসতত্ত্ব জড়িত। যুগে যুগে স্থান-কাল ভেদে নানা প্রকার গান মানুষের কৃষ্টিকর্মে, সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে এলেও ইতিহাস থেকে দেখা যায় সাধারণ মানুষের হাতেই মুরশিদি গান পালিত ও পুষ্ট হয়। মুরশিদি গানের আসরে কিংবা শ্রোতা সমাজের দৃষ্টিতে মুরশিদি গানে এক গুরুবাদী প্রভাব লক্ষ করা যায়। বর্তমান নিবন্ধে প্রধানত মুরশিদি গান হিসেবে পরিচিত গানগুলোর মধ্যকার গুরুবাদী দর্শনকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

---

*পিএইচ.ডি. গবেষক, আই বি এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৪৮১।

মুরশিদি গানের বৈশিষ্ট্য

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, খাজা মইনুউদ্দিন চিশতি ভারতবর্ষে সোমা বা অধ্যাত্ম গানের প্রচলন করেন।[২] তারপর আমির খসরু, নুর কুতুবুলা আলম, ফরিদ উদ্দীন, গঞ্জে শোকের, নিজাম উদ্দীন আওলিয়া প্রমুখ তাপস এদেশে অধ্যাত্ম সঙ্গীতের ধারা চালু রাখেন। মুরশিদি গান কতদিন আগে থেকে বা কতদিনের পুরনো এ সম্পর্কে নিশ্চয় করে বলার যথেষ্ট প্রমাণ নেই। জসীমউদ্‌দীনের মতে, নাথপন্থিদের গুরু পরম্পরায় মুরশিদি গান বর্তমান রূপ লাভ করেছে।[৩] অন্যদিকে দেখা যায় মুরশিদি গানের অস্তিত্ব আনুমানিক তিনশত বছর পূর্বেও ছিল। ইতিহাস আমাদের আরো জানাচ্ছে যে, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছর পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যম যে মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই মায়াবাদের শেষ নিদর্শন মুরশিদি গানের ধারায় বর্তমান রয়েছে। এছাড়া লুই সিদ্ধায়ের গুরুবাদও মুরশিদি গানে অস্তিত্বশীল। এ গান গুরুবাদেরই রূপান্তর।

লোকসংগীত সংগ্রাহক ও বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন মুরশিদি গানের উদ্ভবের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : বৌদ্ধ-বৈষ্ণব ভাবধারার মিশেলে গুরুবাদী অধ্যাত্ম সাধনা এ দেশে আগে থেকেই ছিল। পরে ধর্মান্তরিত মুসলমান মরমিয়া সাধনায় সুফিবাদের প্রভাবে 'মুরশিদিবাদ' গড়ে ওঠে। চিশতিয়া তরিকার প্রবর্তক মঈনুদ্দিন চিশতির ফরাসি গজলে গুরুবাদী সাধন তত্ত্বের নিদর্শন আছে। মঈনুদ্দিন চিশতিসহ এ দেশের অনেক সুফি সাধক গান বাজনা পছন্দ করতেন। এদেরই সংগীত পন্থা অবলম্বন করে তথাকথিত বেশরা ফকিরেরা বাংলাদেশে মুরশিদি গানের জন্ম দেয়।[৪]

মুরশিদি গানের জন্ম ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুরশিদি গান অধ্যাত্ম প্রেমপ্রধান লোকসংগীতের একটি বিশিষ্ট ধারা। মুরশিদি গান আবার ভাবগান নামেও পরিচিত। ভাবগানগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মানব জীবনের পূর্বাপর অবস্থা, জীবন লাভের উদ্দেশ্য, কর্তব্য, সাধনের উপায়, কর্মফল, স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্ক, দেহ আত্মা, মন, শাস্ত্রীয় বিষয়াদির পর্যালোচনা প্রভৃতি অজানা বস্তুনিচয়ের গবেষণা ও ভাবচিন্তা। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম গুরুর চরণে নিবেদিত ভক্ত হৃদয়ের প্রেমাকুলতা থেকেই এ গানের জন্ম হয়েছে।[৫] কবি জসীমউদ্‌দীন অনুমান করেছেন যে, মধ্যযুগে সুদূর তুরস্ক থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে যেসব ভাবধর্মী কবি ও ধর্মনেতার আবির্ভাব হয়েছিল তাদের সাধন পদ্ধতি ও ভাবমার্গের সঙ্গে মুরশিদি গানের একটা যোগসূত্র আছে।

আমাদের দেশে নানাবিধ লোকসংগীতের মধ্যে যে সব গানে অধ্যাত্ম চেতনা, আধ্যাত্মিক সাধনা, রিপু সংযম, অন্তরের পবিত্রতা ও জিকির শিক্ষার মাধ্যমে এক পরম সত্তার কাছে ভক্ত হৃদয়ের আকুতি মিনতি করা হয় সেগুলোকে মুরশিদি গানের পর্যায়ে ফেলা হয় এবং এই গানের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মুরশিদি গানগুলি সাহিত্য বোধে, পরিবেশন পদ্ধতিতে, কথা ও ভাষায়, ছন্দে তালে, প্রকৃতিতে, প্রভৃতিতে এক অধ্যাত্ম জগতের আত্মসমর্পণমূলক পরিণতি লক্ষ করা যায়।

ক. কথা ও ভাষা: মুরশিদি গানের কথাগুলি কবিত্বে ভরপুর । তারপরও সব গানের কথা কবিত্ব হয়ে সবার হৃদয়ে দেখা দেয় না। এক রহস্যময় ভাষার আবর্তন মুরশিদি গানে প্রচ্ছন্ন ভাবে বজায় থাকে।

---

[২] আলমগীর জলিল সম্পাদিত, *বাংলাদেশে লোকসংগীত পরিচিতি : ভাবগান*, চতুর্দশ খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬), পৃ. ২০৫।

[৩] জসীমউদ্‌দীন, *মুর্শীদা গান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭),পৃ. ৪৬।

[৪] মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত হারামনি, *লোকসংগীত সংগ্রহ* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯), পৃ. ৯৫-৯৬।

[৫] আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীতে প্রেম চেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৫৫।

অনেক সময়ে অনেক সাধারণ লোক তো নয়ই এমন কি অনেক পণ্ডিত লোকও এর অর্থ বুঝতে পারেন না। আবার অনেক সময়ে দেখা যায় অতি সাধারণ মানুষই এ গানের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন। এসব গানের মূল ব্যাপার হলো যে, এর একটা নির্দিষ্ট শিক্ষালয় রয়েছে যে শিক্ষালয়ের গণ্ডির মধ্যে সর্বত্র এক আধ্যাত্মিক সত্তার পরম চেতনা বিরাজমান।

অনেকের কাছেই মুরশিদি গানের ভাষা এক বোবার ভাষা মনে হয়। সব ধরনের শ্রোতারা এ গানের ভাষা বুঝতে সক্ষম হন না, কারণ যে কোনো ধরনের শ্রোতার জন্য এ গানের ভাষা বোধগম্য নয়। এ গানের তাত্ত্বিক কথার এক ছন্দোবদ্ধ পরিবেশনা এক পরম সত্তার অস্তিত্ব ও তাৎপর্য নির্দেশ করে । এর দার্শনিক উপলব্ধি সকলের জন্য সহজবোধ্য নয়। যেমন:

তত্ত্ব জানিয়া লও রে মন
তত্ত্ব জানিয়া লও।
কোথায় গুনা আইল রে ফকির মাংস
নাই তার গায়।
হাড়ের উপর নাইকারে মাংস
রক্ত ভাইসা যায়।
তিলির মদ্দি ত্যাল ওরে ভাসে
দুগ্ধর মদ্দি রনি
ডান চক্ষিনি কইতে পারে
বাম চক্ষির কাহিনী।
ডানে আল্লা বামেরে রসুল
বইছেন একঠাঁই
রসূল কাঁন্দিয়া বলে
আমি আল্লা দেখি নাই।[৬]

এমন একটা গানের শব্দগত অর্থ কোনো কোনো অংশে স্পষ্ট হলেও সমগ্র গানে রহস্যময়। নিগূঢ় রহস্য সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না। এই ধরনের গানে সাংকেতিক ভাষার রহস্য ভাঙতে পারে মুরশিদ বা গুরু।

খ. পরিবেশন পদ্ধতি : আমাদের দেশের গ্রামে মুরশিদি গানের আসর বসে। গ্রামের গায়কদল সারারাত ভরে এই গান গায়। শ্রোতাদের কাছে মুরশিদি গান শোনা একটা নেশায় পরিণত হয়। গভীর রাতে এক শান্ত পরিবেশে ভক্ত গানের মাধ্যমে গুরুর চরণ বন্দনা করে। আগে বন্দনা রীতিতে বিভিন্ন ধর্মের গুরু, দরবেশ, পীর প্রভৃতির প্রার্থনা করা হয় তাই মুরশিদি গানের বন্দন রীতি একটি সর্বজনীন বিষয় হয়। মুরশিদি গানে যে সাহিত্য তা হলো বাউল সাহিত্য। গানের মাধ্যমে বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি, এ জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়কেই একত্র করেছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি ; এই মিলনে গান জেগেছে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচিত হয়েছে। এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।[৭] অকৃত্রিম ভক্তি ও ভণ্ডামিবিহীন মুরশিদি গানের আসরগুলি অসাম্প্রয়িক হয়ে থাকে। মুরশিদি গানের আসরে যে বন্দনা গান পরিবেশন করা হয় তা ভক্তিগীতি বা প্রার্থনা গানের মতো। এ গানে

---

৬ জসীমউদ্‌দীন, *মুর্শীদা গান*, পৃ. ১০৫-১০৬।
৭ চৌধুরী, *লোকসংগীতে প্রেমচেতনা* , পৃ. ৫৬।

গুরুর চরণে প্রার্থনা করা হয় গুরুর কৃপা লাভের জন্য। অনেক সময় আসরের মঞ্চে দুইজন প্রতিপক্ষ গায়ক প্রতিযোগিতামূলক ভাবেও মুরশিদি গান গেয়ে থাকেন। পীরের দরবারে, মাজারে এ গান গাওয়া হয়। এ গানে গায়কের নির্দিষ্ট কোনো পোশাক নাই। খেরকাধারী ফকিরের খেরকা এবং বৈষ্ণবেরা গেরুয়া বসন পড়ে এ গান গেয়ে থাকে।[৮] এই গান একই গায়কের নিকট সময়ের গতিতে রূপ বদলায়। ভাবে তালে সময়ের গতিতে ভক্তের আবেগে এই গানের বিবর্তন ঘটে এবং রচনায় নতুন কথা এসে যোগ দেয়।

গ. সাধন পদ্ধতি: দেহতাত্ত্বিক মুরশিদি গানে দেহের বাইরে কোনো সাধন পদ্ধতি নেই। তাদের মতে দেহ একটি ভাণ্ড–তাই তারা মনে করেন যা নাই ভাণ্ডে তা নাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে। তাদের মতে দেহের মধ্যেই আলেক নূর বা পরম আত্মার বাস। গানের সাধক শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই অছে। হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য ও মুসলমান গুরুর হিন্দু সাগরেদ গ্রহণের কোনো দ্বিধা বা বাধা নেই। এদের সাধন পদ্ধতি প্রধানত দেহ ভিত্তিক। এদের সাধনা একটি নির্দিষ্ট যোগমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি ও পুরুষের মৈথুনতত্ত্বের মধ্য দিয়ে তাদের সাধনা। যোগ সাধনার মাধ্যমে তারা দেহকে ইচ্ছাধীন করতে সমর্থ হয়। তাদের সাধনার পথ ও জীবন যাপনের প্রথাপদ্ধতিতে সমাজের সাধরণ মানুষের সাথে কোনো মিল নেই। সাধনমার্গের মধ্য দিয়ে সর্বদাই মুরশিদি বাউলেরা সর্বদাই নিজেদের আত্মগোপন করে রাখে।

ঘ. ভাব ও সুর : মুরশিদি গানে ভাব ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গান একটা লোকসংগীত বলে এর কথা ও সুর দিনে দিনে পরিবর্তিত হচ্ছে। অন্যান্য গানের নির্দিষ্ট রচয়িতা আছে, গীতিকার, সুরকার আছে কিন্তু মুরশিদি গানে কোনো গীতিকার ও সুরকার পাওয়া হয় না। কখনো কখনো কোনো কোনো গানের গীতিকার পাওয়া গেলেও কালের বিবর্তনে দেখা যায় যে, ঐ গানের পরিবেশন পদ্ধতি পূর্ববৎ বলবৎ থাকে না। বিশিষ্ট লোকসংগীত বিশেষজ্ঞ সুকুমার রায় মনে করেন মুরশিদি গানের মাধ্যমে যে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় তা মূলত গুরুর কৃপা লাভের জন্য। এ গানে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে নিংড়ানো ভালবাসা এবং ভক্তি যোগে গুরুর নিকট প্রার্থনা করা হয়। এমন একটি ভক্তিমূলক গান হলো:

গুরু কি দিয়া ভজিব তোমারে
আমার দিক বিদিক নাই
আকূলে ভাসিয়া বেড়াই
আর কোন শান্তি নাই আমার কপালে।
ছিল হরিশচন্দ্র রায়
ভজন পুত্র বেইটারে দিল গুরুর দক্ষিণায়।
ছিল দাতা কর্ণ
দানেতে নাই হইলো ধন্য
আপন পুত্র কাইটা মাংস নিয়া
দেয় তারে।[৯]

---

[৮] করুণাময় গোস্বামী , "গত শতকের বাংলা গান " *ভারত বিচিত্রা* , ফেব্রুয়ারি, ২০০১।

৯ জসীমউদ্‌দীন, *মুর্শীদা গান*, পৃ. ১১৭।

ঙ. আধ্যাত্মিকতা : মুরশিদি গানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্মার্থ হলো সহজ অধ্যাত্মপনা। এই গান সজীব গভীর ভাবসম্পদে ভরপুর। এই গানের সুর ও কথাতে যে মাদকতা এবং এর পাশাপাশি তরঙ্গায়িত যে আধ্যাত্মিক উন্মাদনা তা ভক্তহৃদয়ের শিরায় উপশিরায় অনুভূত হয়ে থাকে পরম চেতনার আলোকে আধ্যাত্মিক গুরু দর্শনের নেশায়। এই গানের সুরে ও বাণীতে চরম ও পরম আধ্যাত্মিক চেতনা প্রবহমান। বেশিরভাগ গান গুলিতে মানব জীবনকে সর্বোচ্চ মূল্যে মূল্যায়িত করে তোলার চেষ্টা নিয়ত থাকে। এই মানব জীবন যে দেহ লাভ করা হয়েছে সেটাই আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র এবং এই দেহতেই "মনের মানুষ" "আলেক সাঁই" বা পরম পুরুষের বাস। গানের মাধ্যমে তারা নিজেদের অত্মপরিচয় লাভে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তারা মনে করে যে নিজেকে চিনলেই পরম পুরুষের স্বরূপ জানা যাবে। সাধকেরা আরো মনে করেন এই স্বরূপের সাধনায় একমাত্র মানুষই যিনি সাধনার সাধ্যমে স্বরূপের দেখা পেয়েছেন। তিনিই গুরু। দেহের সার বস্তু শুক্রকে অর্থাৎ 'গুরুধন' 'মহাজনের মাল' বা পুঁজি অথবা বিন্দুকে ধারণ করার পথ দেখাতে একমাত্র গুরুই সক্ষম।[১০]

মুরশিদি গানে গ্রাম্যতা, তার সংযত আবেগ এবং অধ্যাত্ম চেতনার আকর্ষণকারী সদ্‌গুণে ভরপুর। এই অধ্যাত্মপনার ভাবসম্পদ এবং শালীনতার সূক্ষ্ম কারুকার্য অন্যান্য গান থেকে একে সহজেই পৃথক করেছে। এ গানের প্রভাব আমরা অনেক গানেই লক্ষ করি। ড. করুণাময় গোস্বামীর মতে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদি বাউলের পরিচয় না হতো ; ওঁদের ধর্ম, দর্শন ও সংগীত দ্বারা প্রভাবিত না হতেন, তাহলে যেমনভাবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাচ্ছি তেমনভাবে আমরা পেতাম না, তিনি অন্যরকমের রবীন্দ্রনাথ হতেন, কী রকমের হতেন তা বলা শক্ত।[১১]

চ. গুরুতত্ত্ব : যেহেতু মুরশিদি গান একটি অধ্যাত্মপ্রেম প্রধান লোকসংগীত সেহেতু এই গানের বিশেষত্ব হচ্ছে ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য কিংবা তার সাক্ষাৎ লাভের জন্য মাধ্যম হিসেবে গুরু,পীর, মুরশিদের শরণাপন্ন হওয়া। অনেকের মতে যে মুরশিদি গানের বিশেষত্ব গুরুবাদী দৃষ্টিঙ্গি সে মুরশিদি গান প্রায় তিনশত বছর আগে চালু ছিল। এ গানের মাধ্যমে যে আরাধনা এবং আরত্যশুদ্ধির কথা বলা হয় তাতে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। এ গানের সার কথা হলো ভোগ বিলাস ত্যাগ করে গুরুপদে সর্বস্ব সমর্পণ। বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ক্রমে ক্রমে সাধারণ লোকের মনে স্বাভাবিকভাবে এ গুরুবাদী চিন্তা চেতনার উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়।[১২] বাউল সম্প্রদায়ে গুরুকে সাঁই বলে সম্বোধন করা হয়। সুফিরাও পীর বা মুরশিদের অনুসারী। মুসলমান, সুফি ও বৌদ্ধ শ্রমণ একইভাবে গুরুকে শ্রদ্ধা করে। মুরশিদি গানে কথার মালা গেঁথে যে ভাবে সাঁই, দরবেশ বাবা, মুরশিদ, গুরু প্রভৃতি সম্বোধন করে ইহজাগতিক কৃপা লাভের চেষ্টা করা হয় তাতে দেখা যায় যে, গুরুর কৃপা বিনে কোনো গতি নাই। গুরুপদে শরণ দিয়ে ভবনদী পাড়ি দিতে হবে। একজন মুরশিদ ভক্ত পাগলা কানাই বলেন, সত্যিকার প্রেমরসিক হয়ে গুরুভজনা করতে পারলে গুরু নিজেই হবে ভবতরী এবং শিষ্য হবে কর্ণধার। ভক্ত মনে করে যে, গুরু কোনো অসাধারণ মানুষ নন ; গুরু হচ্ছে পরম পুরুষকে পাওয়ার মাধ্যম। গুরু পরম তত্ত্ব জ্ঞানী আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্ত মানুষ। পীর মুরশিদের আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধিলাভের একমাত্র পথ। ভক্তরা মনে করে যে, আল্লাহ যেহেতু

---

[১০] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৪), পৃ. ৩০৭

[১১] গোস্বামী, *ভারত বিচিত্রা*, ফেব্রুয়ারি, ২০০১।

[১২] কাজী মোতাহের হোসেন, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃ. ৩৩।

নিরাকার তাই মুরশিদ রূপ ভাবনার ভিতর তাকে খুঁজতে হবে। তাদের ধারণা যিনি মুরশিদ তিনিই নবী, তিনিই খোদা মুরশিদকে পেলেই পরম সত্তাকে পাওয়া যায়। লালন বলেন:

মুরশিদ বিনে কি ধন আছে এই জগতে।
আপনে খোদা আপনে নবী,
আপনি সেই আদম ছবি
আপ্তরূপে করছে ধারণ
কে জানে তার লীলা কারণ
নিরাকার হয় হাকিম নিরঞ্জন
মুরশিদ রূপ ভাবনা তাইতে ॥
মুরশিদের চরণ-সুধা পান করিলে সারে ক্ষিধা
ছাড়ো রে মন মনের গিদা
ভজ এই নাম হৃদয়ে বইসে।[১৩]

ছ. গুরু প্রভাব : মুসলমান ফকিরদের আদিগুরু স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহই প্রথম বন্ধু, পথ প্রদর্শক। এ গুরুকে বাউলরা সাঁই, গোঁসাই, মুরশিদ, নবী, নুর নবী, অচিন মানুষ, পীরের পীর দস্তগির, মুরশিদের মুরশিদ, দয়াল পীর ইত্যাদি নামে ডাকে।[১৪] গুরু সর্বেসর্বা, কারণ গুরুর সঙ্গে পরম স্রষ্টার অভিন্ন সম্পর্ক বর্তমান। ঠিক তেমনি গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্কও অভিন্ন। গুরু মানব দেহ। কোনো অলৌকিক সত্তা নয়। গুরু-যিনি সাধন প্রণালীর মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের পথে পরম সত্য লাভ করে সৃষ্ট অভিজ্ঞতায় ভক্তবৃন্দের মুক্তির পথ দেখান । মানব জীবনের অবয়বে গুরু মানব দেহধারী তাই গুরু সান্নিধ্য সহজতর হলেও গুরু কৃপা লাভে পরম মুক্তি পাওয়া সাধনমার্গের মূল উদ্দেশ্য। অদৃশ্য অনন্ত ঈশ্বর গুরুর মধ্যে বিরাজ করেন, গুরু ভজনার মাধ্যমেই মিলবে ঈশ্বরের সন্ধান। গুরু হবে দেহতরীর কাণ্ডারী, গুরুর কৃপায় ভর করে অনায়াসে সম্ভব হবে ভবপারে যাওয়া। গুরু যার কাণ্ডারী হবে সেই অনায়াসে হবে পার। এক নিরিখে থাকলে পরেও তুফান বলে ভয় কি তার। সব মুরশিদি গানেই আছে অধ্যাত্ম গুরুর উদ্দেশ্য গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন। ইরানি সুফিদের যেমন সাকি, বাংলাদেশের ভাবের গানে তেমন মুরশিদি।[১৫]

অধিকাংশ মুরশিদি গানে মুরশিদকে দেখার জন্য বিরহী ভক্তের মর্মবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। তারা গুরুকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা জ্ঞান করে। সাধকরা মনে করে যে, গুরু মানব দেহধারী হলেও তিনিই স্বয়ং আত্মা। গুরু হলেন সুধানদী। প্রকৃত সাধন ভজনের মাধ্যমে সে সুধা নদীর পাড়ি দিয়ে অমর হওয়া যায়। দেহতাত্ত্বিক সাধনার মাধ্যমে প্রাপ্ত পরম গুরুর পরশে অমরত্ব লাভ হয় । গুরুবাদী সাধন তত্ত্বের এ দৃঢ় বিশ্বাস। তাই লালন এবং তার ভাবানুসারী পাঞ্জু শাহ দেহের অতি সূক্ষ্ম লতিকা গুলোর বিকাশ ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা এগুলোর যথাযথ বিকাশ সাধনের মাধ্যমেই মনের মানুষের সন্ধান মেলে এবং এভাবেই পরম তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়।[১৬]

---

[১৩] চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীতে প্রেমচেতনা*, পৃ. ২৫৬-২৫৭।
[১৪] মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, *বাংলার বাউল দর্শন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ২১৩।
[১৫] আব্দুল কাদির, *সুফি সাহিত্য ও দর্শন* (ঢাকা : মুক্তধারা ১৯৭৬), পৃ. ২৬০।
[১৬] খোন্দকার রিয়াজুল হক, *পাঞ্জুশাহ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৯১।

মুরশিদ বা গুরুপ্রেমের ঢেউ একবার যার অন্তরে লাগে সে মুরশিদ মুরশিদ বলে পাগল হয়ে যায়। সে দালান কোঠা, বেহেস্ত, কিছুই চায় না। সে শুধু মুরশিদের চরণ চায়। মুরশিদ বিহনে জপতপেও তার মন বসে না। মুরশিদ হলেন প্রাণের ধন, জীবনের জীবন। ভক্ত যখন তাঁর প্রেমে পড়ে তখন আকাশে বাতাসে তার গুরুজীর নাম শুনতে পায়। গুরুপদ হয় সকল ভক্তের তীর্থ স্থান । ভক্তরা বলে:

কাজ কি আমার তীর্থ বাসে
গুরুপদ সকল তীর্থবাস
তীর্থরাজ শ্রীগুরুচরণ গো
পাব গয়া গঙ্গা গুরুপদে
কেন করব অন্বেষণ... ।[১৭]

গুরু, পীর বা মুরশিদের জন্য এই যে আহাজারি, এর মূল কারণ হিসেবে অধ্যাৰ ভক্ত সাধকগণ মনে করে যে, একমাত্র গুরু কৃপাতে ঘটবে ভক্তের মুক্তি। গুরু হলেন দিব্যজ্ঞানী বা সিদ্ধ সাধক ,গুরু পথ প্রদর্শক, গুরু দুঃখের দুঃখী, সখা পথ দ্রষ্টা , গুরুই পারেন নানা রিপুর তাড়না থেকে পথভ্রষ্টদের রক্ষা করতে। তিনিই পারেন পরম পুরুষের সাথে ভক্তের মিলন ঘটাতে। আর এ কারণেই আমরা দেখতে পাই সিদ্ধ সাধকের করুণা লাভের জন্য ভক্তের আর্তি সকরুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে মুরশিদিসহ অন্যান্য তত্ত্বগানে।[১৮]

২. মুরশিদি গানে গুরুবাদ

যাঁরা সাধনার মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করেন তাঁরাই গুরু ।[১৯] গুরুর নিকট হতে একটি অক্ষর লাভ করলে পৃথিবীতে এমন কোনো দ্রব্য নাই যার দ্বারা গুরুর ঋণ হতে মুক্ত হওয়া যায়। তন্ত্রমতে গুরু দেবস্বরূপ, গুরুকে মানুষ মনে করলে নরকগামী হতে হয়। চলতি ভাষায় গুরুকে ইষ্টদেব বলা হয়। বাউল ধর্মে তত্ত্ব দর্শন বা জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের বা সাধনার গুরুত্ব অত্যধিক বলে গুরুবাদে গুরুকে অত্যধিক স্থান দেওয়া হয়। গুরু বলতে বাউলেরা মানব গুরুকে বোঝে। তবে এই মানব গুরুকে আবার তারা ঈশ্বর রূপেও কল্পনা করে। এই গুরু শিষ্যের রাগের আচার-পদ্ধতির শিক্ষা দেন এবং কখনো পুরুষ প্রকৃত ঘটিত কোনো যোগ সাধনার সময় নিজে উপস্থিত থেকে এই সাধন প্রণালীর অতি গুহ্য বিষয়ে উপদেশ দেন। সাধক সাধিকার অন্তজীবন ও বাহ্য জীবন গুরুর নিকট সদা উন্মুক্ত। গুরু শিষ্যের এই সম্পর্ক বাউল সাধনার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।[২০] গুরুপূজা ও গুরুমন্ত্রজপ নিত্য কর্ম। গুরুর উপস্থিতিতে নিত্যপূজা না করে গুরুর পদ পূজা করতে হয়। গুরুর মৃত্যুতে অশৌচপালন ও হবিষ্যান্ন গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। সমস্ত হৃদয় দিয়ে গুরুর আরাধনা কর্তব্য। গুরু কষ্ট পেলে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। গুরু হচ্ছে পরম প্রাণময় তাঁর কাছে কোনো জাতিবিচার নেই। গুরুর রূপ কি সেই সম্পর্কে লালন বলেন:

---

১৭ *ব্যক্তিগত সংগ্রহ, মুরশিদি গানের গায়ক আবুল কালাম*, কর্মচারী, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮ চৌধুরী, *লোকসঙ্গীতে প্রেম চেতনা*, পৃ. ২৭৪।

১৯ হাসনা বেগম, "বাউল দর্শন", *বাঙালির দর্শন চিন্তা*, ওয়াকিল অহমদ সম্পা., ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১১৮।

২০ *তদেব*।

গুরু রূপের ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে
ও তার কিসের আবার ভজন-সাধন লোক জানিত করে।[২১]

বাউল সম্প্রদায় গুরুবাদী এবং বাউল ধর্মে গুরুকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা জ্ঞান করা হয়।[২২] যে শাস্ত্রে গুরু রূপে ভজন সাধন রীতি প্রচলিত আছে এবং যে শাস্ত্রে জীবনের সব কিছুতে গুরুকে এবং গুরুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ জীবনের মূল চালিকা শক্তির কারণ জ্ঞান করা হয় তাকে গুরুবাদ বলে। গুরুবাদে গুরু প্রধান সত্তা। মুরশিদি গানের মাধ্যমে যারা সাধনা করেন তারা একটা ধর্মীয় জ্ঞান দর্শন নিয়ে ব্যবহারিক ও ক্রিয়ামূলক সাধনার সাধক হন। এই ক্রিয়ামূলক সাধনার দ্বারা মুরশিদরা তাদের আরাধনার পথে সত্য উপলব্ধি করে থাকেন। এক্ষেত্রে যাঁরা ক্রিয়া এবং সাধনার দ্বারা নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা, আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করেছেন ; তাঁরা সেই ধর্মের তত্ত্ব বিষয়ক, মর্মজ্ঞ এবং ক্রিয়াজ্ঞ। এঁরাই গুরু এঁরাই অন্যকে তাঁদের মত ও পথে চালিত করতে পারেন। ভক্তরা মনে করেন যে গুরু ব্যতীত ধর্মের মূল রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। সেই সূচনালগ্ন হতে মুরশিদি গানে গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। গুরুর প্রতি আনুগত্য, গুরু কৃপায় কাঙাল, গুরুধর্ম সেরা ধর্ম, গুরু নিন্দা মহাপাপ, গুরু যপতপ মূল মন্ত্র, গুরু পথ প্রদর্শক, গুরুকে আর কোন কিছুর সাথে তুলনা করা চলে না। গুরুতত্ত্বের এই বোধ বা চর্চাই মুরশিদি গানে গুরুবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

দয়াল গুরুকে পাবার জন্য ভক্তের আকুলতা এমনই যে, গুরুকে ছাড়া সে কবরেও যাবে না। বেহেস্তের সুখের আশাও করে না। গুরুই তার বেহেস্ত। আবার দয়াল গুরুকে সশরীরে না পেলেও ভক্ত তার প্রথম পরশ পেতে চেয়েছে গুরুর ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী ও চরণধুলার পরশে:

আমি আর কোন ধন চাই না দয়াল
যাইতে আমায় সাথে নিও।
আমার মরণের পরে ঝাড়ের বাঁশ না কাটিও
আমার মুরশিদ চাঁন্দের লাঠি আমার কবরে দিও
আমার মরণের পরে আতর গোলাপ না মাখাও
আমার দয়াল চাঁন্দের ওজুর পানি আমার
অঙ্গ ছিটাও।
আমার মরণের পরে চোখে সুরমা না পরাও
আমার মুরশিদ চাঁন্দের চরণধূলি আমর চোখে দিও।[২৩]

মুরশিদি গানের ভাষার যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে তা শিষ্যরা জীবনে উপলব্ধি করেছে। শিল্পীর কণ্ঠে মুরশিদি গানের পরিবেশনা ধর্মতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মুরশিদি গানের ভাষায়, তত্ত্বে কোনো অলৌকিকতা নেই বরং এ যেন জীবনের মধ্যে অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বারা পরীক্ষিত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ চরম আধ্যাত্মিক সত্য। এ গানের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি মিলেই পরমসত্তা বা গুরুর করুণা লাভের চেষ্টা এবং ভক্তি বিনয়ী নিবেদন। মুরশিদি গান যেন একটা ধর্মীয় জ্ঞানে পরিণত হয়েছে, যার দর্শন একটা ব্যবহারিক ও ক্রিয়ামূলক সাধনাংশ হিসাবে ভক্তদের কাছে পরিগণিত আছে। মুরশিদপন্থিদের মধ্যে গুরুর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। গুরু বিনে কেনো গতি নাই। পরম সত্তাকে পেতে হলে গুরুর উপদেশ

---

[২১] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৪), পৃ. ৩০৬।

[২২] *তদেব*, পৃ. ২৬৯।

[২৩] *তদেব*, পৃ. ২৭৪।

বা সাহচর্য অপরিহার্য। এই ক্ষণিক জীবনের সমস্ত সময় ব্যেপে চাতক পাখির মতো গুরুর আশায় বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। গুরুর চরণে তাই নিবেদন:

আমি রে তোর চরণ পাবার আশায়
রইলাম সোনার মুরশিদ রে
যেমন চাতক রইলো মেঘের আশে
মেঘ ভাইসা যায় অন্য দেশে
ও আমার দয়াল রে।
আমি নালিশ করি আল্লাজির কাছে
নালিশের নি বিচার আছে রে
আমার দয়াল রে।
ও আমার দয়াল রে
আর আমার নালিশের জাগা নাই রে।
আমি নালিশ করি রসুলের কাছে
নালিশের নি বিচার আছে রে
ও আমার দয়াল রে।[২৪]

যে সব ধর্মে তত্ত্বদর্শন বা জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের প্রাধান্য বেশি সেসব ধর্মে গুরুর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। মুরশিদি গানে গুরুর স্থান সর্বোচ্চ আসনে আসীন। মুরশিদি গানে গায়ক, শ্রোতা, ভক্ত, অনুরাগী সকলেই এক তন্ত্রধর্মের অনুরাগী এবং তাদের দর্শন গুরু সাধনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মুরশিদগণের মধ্যে ধ্যানধারণা এবং কিছু যোগমূলক ক্রিয়া আছে এ পর্বেও গুরুর আসন অতি উচ্চে।

বাংলার বাউল ধর্মে দেখা যায় যে, বাউলেরা গুরুকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। তাছাড়া আর যত লোকসংগীত আছে তার মধ্যে সকল ভাব গান, ভক্তিমূলক গান হিসাবে মুরশিদি গানে দেখা যায় যে, সেখানে তারা গুরুকে দুই ভাবে দেখে। এক অর্থে তারা গুরুকে মনে করে মানবগুরু আবার অন্য অর্থে তারা গুরুকে মনে করে পরমগুরু । মুরশিদি গানে এই দুই রূপ গুরুরই নির্দেশ পাওয়া যায়। তারা মনে করে যে, মানব গুরুর প্রতি ভক্তিনিষ্ঠ না হলে সর্বোচ্চ গুরু ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। মানব গুরুর কাছে দিক্ষা নিলে এই জীবনে সকল সাধন সিদ্ধ হয়। বাংলার মরমি সাধক লালন সাঁই যথার্থই লিখেছেন:

সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার
ভবে মানুষ গুরু দীক্ষা যার...।[২৫]

ভক্তরা মনে করে যে, মানবগুরু সেই পরম গুরুর প্রতিনিধি, মুরশিদ বাউলদের গুরুভক্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, মুরশিদ বাউল সম্প্রদায়ের মতো গুরুবাদী সম্প্রদায় অন্য আর একটি আছে কিনা সন্দেহ অন্তত বাংলায় যে নেই, এটা ঠিক। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুভক্তি এতই প্রবল যে, অনেক সময়ে এদের গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠা বিচার বিবর্জিত, অন্ধ, হাস্যকর ও চরম মূর্খতার পরিচায়ক বলে মনে হয়েছে। অথচ মুরশিদপন্থিদের মধ্যে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক এতই নিবিড় যে, গুরু শিষ্যের এরূপ দৃঢ় বন্ধন সহজে দৃষ্টিগোচর নয়। মুরশিদি

---

[২৪] জসীমউদ্‌দীন, *মুর্শীদা গান*, পৃ. ১৮৯।
[২৫] *তদেব*।

গানের নামকরণের মধ্য দিয়ে এই সম্প্রদায়ের গুরুবাদ প্রতিষ্ঠিত এবং এর নামকরণের সার্থকতা বিরাজমান। গুরুনিন্দা মহাপাপ এবং শত দোষ থাকা সত্ত্বেও গুরু পরম গুরু:

যদ্যপি মোর গুরু বেশ্যা বাড়ি যায়।
তদ্যপি মোর গুরু নিত্যানন্দ রায়[২৬]

দেখা যায় যে, মুরশিদি গান মানে গুরুর গান; যে গানের স্থায়ী রচনা হয় গুরুবন্দনা করে, অন্তরাতে গুরু প্রশংসা এবং সঞ্চারীতে গুরুচরণে প্রার্থনা। এ গানের প্রধান আহ্বান হলো গুরু কৃপাহি কেবলম্। এ জীবন দুঃখে ভরপুর । ষড়রিপুর প্রভাবে জীবন দুঃখময়। সবই যেন ফাঁকি এবং মায়ার বন্ধন। গুরুছাড়া জীবনের উপায় কেউ বলতে পারে না:

গুরু আমার উপায় বলো না
ভবে জনম দুঃখী আমি যে একজনা।
গর্ভে থুইয়া মইল পিতা
শিশু থুইয়া মইল মাতা
চোখে দেখলাম না।
কে করিবে লালন পালন
কে দিবে দিবেরে সান্ত্বনা।
এসেছিলাম ভবের বাজারে
ছয় চোরা যুক্তি কইরা বানলো আমারে
চোরারা সব খালাস পাইল
আমায় দিল জেলখানায়।[২৭]

ভক্তরা মনে করে যে, গুরু এদের কেবল পরমার্থিক বিষয়েই পরিচালিত করে না ; লৌকিক বা ব্যবহারিক বিষয়েও পরামর্শ দেয়। শিষ্যদের মধ্যে কোনো মতদ্বৈধ থাকলে গুরুকেই তা মীমাংসা করতে দেখা যায়। কোনো কোনো বিশিষ্ট গুরু প্রকৃতি-পুরুষ ঘটিত যোগ সাধনার সময়ে স্বয়ং উপস্থিত থেকে কখন কিভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া করতে হবে, কখন কোনো মুদ্রা অবলম্বন করতে হবে প্রভৃতি উপদেশ দেন। তাঁদের অনন্ত জীবন এবং বর্হিজীবন গুরুর নিকট সদা উন্মুক্ত।

মুরশিদি গানের কথায় গুরুর প্রাধান্য এত বেশি যে গুরু বা মুরশিদ যে, এ জগতে পরম সম্পদ এবং ভগবান যে গুরুরূপে শিষ্যকে সাধনপথে পরিচালিত করছেন এ বিশ্বাসের প্রতি তাদের কোনো তর্ক বা সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ঈশ্বর, ভগবান, খোদা আমাদের পরম বন্ধু ও পথ প্রদর্শক। সেই নিরঞ্জন-নিরাকার, হাকিম-খোদা, মুরশিদরূপে সাধন পথে আমাদিগকে পরিচালিত করছেন। ভগবান নানা রূপে বিরাজ করে, তার সমস্ত জ্ঞান প্রেম ও শক্তির প্রকাশ মুহম্মদে। সেই সমস্ত শক্তিই আদমে রূপায়িত।[২৮] মুরশিদরা মনে করে যে, মানুষের অন্তর্নিহিত আল্লা (রুহ্) রূপে সর্বমানবে তাঁর উপস্থিতি। সুতরাং আল্লা, নবী, আদম অর্থাৎ সকল মানবকুল এক ; কেবল সাধনার পথ ভিন্ন ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে ভগবানই গুরু রূপে মানুষকে সাধনপথে পরিচালিত করেন। যেমন :

---

[২৬] *তদেব*, পৃ. ১৫৬।
[২৭] *তদেব*, পৃ. ১৪২।
[২৮] ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* , পৃ. ৩০৫।

আগমে নিগমে কয়
গুরু রূপে দীন দয়াময়
অসময়ে সকাশে হয়
যে তারে ভজিবে ॥
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যার
অধঃপাতে গতি হয় তার।[২৯]

ভক্তদের মধ্যে গুরু চেতনা এবং গুরুর কৃপা লাভের জন্য তন্ত্র সাধনা অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টসাধ্য কাজ। সকল সাধারণ মানুষ এ পথে সার্থকতা লাভ করতে পারে না। রিপু সংযম ব্যতীত মুরশিদ বা গুরু হওয়া যায় না। যদি কোনো সময়ে প্রকৃত সাধনপথ থেকে বিচ্যুতি হওয়া যায় তবে আর গুরুর কৃপা লাভ করা সম্ভব হয় না। গুরু বিনে কোনো উপায় নাই, গুরুর ইচ্ছায় সব হয়ে থাকে। গুরু যদি আশীর্বাদ না করে তবে তন্ত্র মন্ত্র সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। গানের ভাষায় ভক্তরা বলে:

গুরু তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেন॥
আমার জন্ম-অন্ধ মন নয়ন
গুরু তুমি নিত্য সচেতন,
চরণ দেখব আশায় কয় লালন
জ্ঞান অঞ্জন নেও নয়ন॥
গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার
লও গো সুপথে
তোমার দয়া বিনে তোমার সাধন কি মতে।[৩০]

মুরশিদি গানের মাঝে অনেক সময় দেখা যায় যে গুরুবস্তু, গুরুধন, মহাজনের মাল, পুঁজি ইত্যাদি। দেহের সারবস্তুকে তারা গুরুধন, গুরুবস্তু, মহাজনের মাল, পুঁজি প্রভৃতি বলে থাকে। তাঁদের কাছে দেহের সারবস্তু বিন্দু, এটিই মানুষের পরম সম্পদ, এটি শ্রীগুরু বা ভগবানের স্বরূপ। এই বিন্দু বা গুরুধনকে সযত্নে রক্ষা করে চলাই তাদের ব্রত। ভক্তরা আরো মনে করে যে, মহাজন এই মাল বা পুঁজি দিয়ে সংসারের ব্যবসা ক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন। এই পুঁজিকে রক্ষা করা না গেল ব্যবসার মূলধন ধ্বংস হয়ে যাবে। মুরশিদদের বিশ্বাস যে, নানা রিপুর উত্তেজনায় গুরুবস্তু নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায়, তাতেই সাধন ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানব গুরুরাও এই বিন্দু রক্ষার জন্য উপদেশ দেন। এটাই তাঁদের সাধন নির্দেশ। লৌকিক দিক দিয়েও এটাই ভক্তর গুরুবস্তু বা গুরুধন। এই বিন্দু রক্ষাই তাঁদের সাধনার মূল ভিত্তি।
ফরিদপুরের এক বাউল গুরু চণ্ডি গোঁসাই বলেছেন:

গুরুর মুখ পদ্ম বাক্য
যার হয়েছে হৃদে ঐক্য
তার কাছে নাই বিচার তর্ক
গুরুর বাক্য সার।[৩১]

---

[২৯] *তদেব*।
[৩০] *তদেব*. পৃ. ৩০৬

আরো একটি গানে :

গুরু গীতাতন্ত্র, গুরু যজ্ঞমন্ত্র, গুরু যে পরম গতি
গুরুবিনে ভাই বন্ধু কেহ নাই, গুরু বন্ধু, পিতা, পতি
জ্যোতির্ময়দেহ মানুষ-বিগ্রহ চিন্ত হৃদানন্দকাননে
নহে গুরু তুল্য রতন অমূল্য, রাখিও হৃদয়ে যতনে॥[৩২]

উত্তরবঙ্গের এক বাউল মুরশিদের কাছে বলেছেন:

আর আমার কেউ নাই, আর আমার কেউ নাই
মুরশিদ তোমা বিনে।
একবার দয়া করে চাওগো মুরশিদ
দীনহীনের পানে...।[৩৩]

মধ্যবঙ্গের বিখ্যাত ফকির শাহ পরম দয়াল মুরশিদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন:

তুমি আমারে ফেলোনা মুরশিদ দয়াল হয়ে
আমি চাতকিনীর মত আছি তোমার চরণ পানে চেয়ে...।[৩৪]

বাউলরা মুরশিদকে অর্থাৎ মানব গুরুকে পরম গুরু মনে করে। নবদ্বীপের চণ্ডিগোসাঁই বলেন:

দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, ইহার পরে আছে গুরু
সেই গুরু কল্পতরু, রাগেরী আশ্রয়
আর কত আছে গুরু পথের পরিচয়।
তিমির-অন্ধ বিনাশিলে নিজ গুরু যায় তা চিনা।[৩৫]

গানে সারবস্তু হলো দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু বা ভক্তবৈষ্ণব পরমগুরুই প্রতিনিধি। এই সব মানব গুরুকে শেষে পরমগুরুতে পর্যবসিত করে সাধনা করতে হবে। মুরশিদ ভক্তদের কাছে:

ধ্যানে গুরু, জ্ঞানে গুরু
অন্তরে বাহিরে গুরু
রূপ নেহারে গুরু
গুরু রূপে রূপে মিশায়।

মুরশিদপন্থি বাউলরা স্থানকেন্দ্রিক নয়; গুরুকেন্দ্রিক। তাঁরা গুরুকে কেন্দ্র করেই গোষ্ঠী সৃষ্টি করে থাকেন।[৩৬] এ ব্যাপারে হিন্দু মুসলিম ধর্মভেদ ও সম্প্রদায় নির্ণায়ক মানদণ্ড প্রযোজ্য নয়। বাউলগণ নিজেরা অসম্প্রদায়িক। হিন্দু বাউলদের মুসলমান শিষ্য এবং মুসলমান বাউলদের হিন্দু শিষ্য অনেক দেখা যায়।

---

[৩১] *তদেব*, পৃ. ৩০৭।
[৩২] *তদেব*, পৃ. ৩০৭-৩০৮।
[৩৩] *তদেব*, পৃ. ৩০৯।
[৩৪] *তদেব*, পৃ. ৩০৯।
[৩৫] *তদেব*।
[৩৬] এস. এম. লুৎফর রহমান, "বাউল সাধনার বিবিধ রীতি" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা*, ত্রিশংবর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৯৩)।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, লালনোত্তর বাউল সাধনা মূলত চার স্তরে বিভক্ত: ১. স্থূল, ২. প্রবর্ত, ৩. সাধক ৪. সিদ্ধ।[৩৭]

স্থূল: মুরশিদ হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য সাধনার প্রয়োজন। সাধক জীবন প্রস্তুতির পর্ব, দীক্ষা গ্রহণ, নাম পরিবর্তন, প্রচলিত সংস্কার, রুচি, নীতি, মূল্যবোধ শাস্ত্র, সমাজ, সংসার, পোশাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ; সমদর্শন, সংযত জীবনযাপন, গুরুর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং গুরুসেবাই এ স্তরের বিশেষ সাধনা। দৈহিক ক্রিয়ারূপে এ সময়ে যোগাভ্যাস, সূত্রধারণ ও তা অল্পে অল্পে বিসর্জনের অনুশীলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রবর্ত : স্থূল স্তরে আচরিত সমস্ত সাধনা এ স্তরেও অব্যাহত থাকে। তবে তা পূর্বাপেক্ষা আরো দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। এ পর্বে বিবাহিত বা অবিবাহিতা শিষ্য কিংবা শিষ্যকে সাধন সঙ্গীর সাহচর্য গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় না। প্রবর্ত স্তরে বিবাহিত দম্পতিদেরও দেহ ভজনার বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদান করা হয়। সাধক সাধিকা এ পর্যায়ে আপন শরীর ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা লাভ করে। আলোচ্য পর্বে গুরুসেবা দাস্যভাব প্রাপ্ত হয়।

সাধক : মুরশিদ বা গুরু কৃপা লাভের জন্য সাধনার স্তরগুলির মধ্যে এ স্তরের সাধক সাধিকা সাধন ভজনের অতি দুর্গম জটিল ও বিপদসঙ্কুল পথ পরিক্রমায় অবতীর্ণ হন। সকল সম্প্রদায়ের বাউলদের মধ্যে আলোচ্য পর্যায়ের সাধনা সামগ্রিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধন ভজনের ক্ষেত্রে এ পর্ব অতি দীর্ঘ, ক্লান্তিকর ও কষ্টদায়ক। শিষ্য ভক্তরা গুরু কৃপা লাভের জন্য গুরু নির্দেশে কষ্টসাধ্য ব্রত পালন করে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন মুসলমান জাতির বাউল বা ফকিরেরা কোনো মন্ত্রপাঠ করে না, তবে অনেকে আলেকজান বা মুরশিদ জান বা খোদা নিরঞ্জন বা জয়গুরু উচ্চারণ করে।[৩৮] বাউলরা সাধন ভজন করার জন্য গুরুর আখড়ায় একত্রিত হয় এবং সংগীত, নৃত্য, মদ্য, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি সহযোগে সাধন-ভজন করে।

সিদ্ধ : সিদ্ধ সাধক ধর্ম পালনে আড়ম্বর ত্যাগ করেন। তখন আর অতিশয় সাবধানতা, কঠিন পরিশ্রম ও কঠোর সংযমের আবশ্যকতা থাকে না। এ সব তখন স্বভাবানুগ হয়ে ওঠে। সে সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই সাধক বিভিন্ন আসন, মুদ্রা, রেচক, পূরক, কুম্ভক ইত্যাদি ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। সাধক কেবল আত্মদৈন্য ও প্রার্থনামূলক সংগীতে সাধন-ভজনে রত থাকেন। তখন গুরু বা মনের মানুষের নিকট তার আর আত্মহারা ভাব নয়; আত্মহারার পর আর জাগরণের অবস্থা। সুফি পরিভাষায় একেই বাকা বিল্লাহ (to live in Him) বলে।[৩৯]

মুরশিদি গানে সাধক সাধিকার মধ্যে বিশেষ প্রকারের গোপন সাধনরীতির আভাস পাওয়া যায়। গভীর ও সর্বাঙ্গীণ প্রেম মিলনের দ্বারা যে অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি হয় তাই মহাভাব। এটাই প্রেমের চরম ও পরম অবস্থা। এই অপূর্ব আনন্দময় সত্তাই মানবাত্মা বা প্রকৃত গুরুর স্বরূপ। মুরশিদদের সাধনা মানবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনা। মুরশিদি গানে আধ্যাত্মিকতা এবং এর সাধনায় গুরু ছাড়া

---

[৩৭] শাহ লতীফ আফী আনহু, *বাউল দর্শন ও বাউল গানের সংজ্ঞা নিরূপণ* (ঢাকা : সমকাল, শ্রাবণ, ১৩৬৭)।

[৩৮] ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ৩১৭।

[৩৯] A.I. Arberry, Sufism, *An Account of the Mysties of Islam* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1956), p. 58G.

গত্যন্তর নাই। সাধনা যতই সূক্ষ্ম ও জটিল ক্রিয়াত্মক ততই গুরুর উপর নির্ভরশীলতা বেশি। গানের মাধ্যমে মুরশিদ, পীর, এরা সকলে তন্ত্র ধর্ম সাধনা করে থাকেন। তন্ত্রধর্ম সাধনা ছাড়া উপায় নাই। গুরু হলো সমস্ত চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। গানের মধ্যে গুরুতত্ত্ব ,গুরু লক্ষণ, গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য, গুরুর মহিমা কার্য, গুরুর ক্ষমতা, দক্ষতা এবং সর্বজ্ঞতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গুরুই সমস্ত আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল।

মুরশিদি গানে গীতিকার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মার, গুরু, পীর বা মুরশিদের সঙ্গে শিষ্যের, সাধারণ ভক্তের সঙ্গে নবী -রাসুল পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এর মূলে প্রধানত রয়েছে পরম স্রষ্টার সাক্ষাৎ লাভের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, আছে নবী পয়গম্বর বা পীবের অনুগ্রহ লাভের আর্তি। আছে পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে চির অমরত্ব লাভের মোহ।[৪০]

লোক সাহিত্যের সব শাখাতেই অধ্যাত্মচেতনা একটা নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। লোকসংগীতে বিশেষ করে মুরশিদি গানে আমরা যে, অধ্যাত্ম ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বময় প্রেমের স্ফুরণ ঘটতে দেখি তার ভিত্তিভূমি উল্লিখিত দর্শন তথা আধ্যত্ম প্রেমদর্শন ও প্রেমতত্ত্ব। ভক্তরা যদিও মনে করে যে, পরম পুরুষ বা পরমসত্তা এক অতীন্দ্রিয় জগতের বাসিন্দা তবু তারা তাঁকে অনুভব করতে চেয়েছেন দেহের মানবের মধ্যেই। তাই দেহের যাবতীয় অন্ধিসন্ধি ও প্রেম খেলার কায়দা কানুন শেখার জন্য তাদের দরকার হয় গুরু, পীর বা মুরশিদের। মরমি সাধকদের স্থির বিশ্বাস যে, আগে গুরুর প্রেমে মজতে হবে। গুরুকে সত্যিকার ভাবে ভজতে পারলেই তাঁর মাধ্যমেই সেই পরমকে পাওয়া যাবে। এ ধারণা থেকে লোকসংগীতে গুরুপ্রেম বা গুরুভজনার কথা বলা হয়েছে। আবার অধ্যাত্মপ্রেম মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। রক্তমাংসের মানুষের মধ্যেই আছেন মানুষ গুরু বা মনের মানুষ। ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকাম বলেন "আচার্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্টং প্রাপয়তীতি।

আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত অর্থাৎ গুরুর নিকট হতে বিদ্যা শিখলে সেই বিদ্যা সর্বাপেক্ষা উপকারী হয়।[৪১]"

আবার মুণ্ডকোপনিষদে আছে:

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম।।[৪২]

আত্মাকে জানার জন্য গুরুর নিকট যেতে হবে।

ভক্তরা গানের মাধ্যমে যে সাধনা করে তা এক বিস্ময়কর সাধনা। তারা জাতি ধর্মভেদ ছিন্ন করে সাধনার পথে অগ্রসর হয়। চোখের জলে বাঁধনহারা ধারায় সিক্ত সুরে ভক্তরা মুরশিদের দরবারে, আখড়ায় গান করে থাকে। তাদের কান্নার সাধনা অন্তরের গুরুকে জাগিয়ে তোলে। তারা একতারায় সুর তুলে গায়:

তুমি দ্যাও দেখা সোনার চাঁন রে আমার
তুমি কও কথা দয়াল চান রে আমার
তোরে না দেখিলে প্রাণ আমার বাঁচেনারে...।[৪৩]

---

[৪০] চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীতে প্রেমচেতনা*, পৃ. ২২৭।
[৪১] ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪/৮/৩।
[৪২] মুণ্ডকোপনিষৎ ১/২/১২।
[৪৩] ব্যক্তিগত সংগ্রহ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, ২০০১।

৩. মুরশিদি গানে প্রতিফলিত গুরুবাদের দার্শনিক ভিত্তি

মুরশিদি গান এক ধরনের বাউল দর্শন। এই দর্শনের কোনো লিখিত শাস্ত্র নাই, ইতিহাস নাই , গুরুবাদই এই গানের প্রধান দর্শন।[৪৪]এদের জীবন দর্শন প্রকাশ পায় তাদের গানের মাধ্যমে নানা প্রকার রূপক ও অস্পষ্ট ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার দ্বারা। অপ্রকাশ থাকে তাদের জীবন দর্শনের বাস্তব প্রয়োগের সাধন পদ্ধতি। চিন্তাশীল হওয়া মানুষ জাতির সাধারণ ধর্ম বলে হৃদয়ের ব্যাকুলতা, অন্তর্দৃষ্টি, আবেগ, অনুভূতি মানুষ প্রকাশ করে ভাষার মাধ্যমে। ভাষারই তাল-ছন্দ মিলিত রূপ হয় গান। সব শ্রেণীর গানের মাধ্যমেই হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়। ভক্তরা গুরুর প্রশংসা করার জন্য গান পরিবেশন করে। এভাবে গুরুর প্রশংসা করার জন্য মুরশিদি গান সূচনা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। তাই মুরশিদি গান হলো এক প্রকার ভাবগান যার প্রধান উপাদান হলো গুরুভক্তির সুর ও বাণীর মালা গেথে গুরুর সান্নিধ্য লাভ, গুরুর কৃপা পাবার ব্যাকুলতা।

বহু মুরশিদি গানে বৌদ্ধদের মায়াবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। তার কারণ হলো, আমাদের গ্রাম গঞ্জের লোকেরা বহুদিন পূর্বে বৌদ্ধ ছিল।[৪৫] পরে মুসলমান ও হিন্দু হয়ে এদের বাইরের কাঠমোটি বদলালেও অন্তরের বৌদ্ধ ভাবটি ছাড়তে পারেনি। অনেক মুরশিদি গানের কথাতে নশ্বর জগতের ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষকে গুরুরূপে ভজন করা মুরশিদি গান ছাড়া অন্য কোনো গানে আছে বলে মনে হয় না। মুরশিদ ভক্তরা সারারাত গুরুর কাছে ঈশ্বর আরাধনা করে সকাল বেলা ঘরে ফেরে। এক মুরশিদ ভক্ত ফকির তার নাম শাহলাল। অনেকে তাকে শানাল বলে জানে। তিনি তার ধর্মজীবন শুরু করেন প্রসিদ্ধ ফকির দাগুসিদ্ধায়ের কাছে। শানাল পদ্মার উন্মত্ত ঢেউ উপেক্ষা করে ছোট ডিঙ্গি বেয়ে গুরুর বাড়ি যেতেন। যদি কোনো দিন গুরুর নিকট যেতে না পারতেন সেদিন পদ্মার তীরে বসে সারিন্দা বাজিয়ে কেঁদে কেঁদে গাইতেন:

ও পার আমার মুরশিদের বাড়ি
এ পার বইস্যা আমি কান্দি রে
বিধি যদি দিত রে পাখা
উইড়্যা যায়া দিতাম দেখা
উইড়্যা পড়তাম দাগুসার পায় রে।[৪৬]

মুরশিদরা গুরুর আসনে এতই ক্ষমতাধর যে, শিষ্যরা তাদের জীবনের অনেক কার্যের কারণ বলে মনে করে। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে এখনও বৃষ্টি না হলে হিন্দু মুসলিম সকল জাতি মুরশিদি গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুরুর কৃপা প্রার্থনা করে। কথিত আছে যে, এমন এক ঘটনায় দাগুসিদ্ধায়ের আরাধনার পরও যখন বৃষ্টি হলো না তখন অন্য লোকেরা ভক্তদের নানা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। ধ্যানবলে শাহলাল তা জানতে পেরে ১২ মাইল পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করে ভক্তদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। তারপর সিজদায় বসে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। তার কান্নার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ শূন্য আকাশ হতে অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ে মাঠ ঘাঠ ভেসে যায়। তখন গুরুকে কাঁধে করে শাহলাল বাড়ি ফিরে আসে। এই ঘটনার পর থেকে তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মুরশিদ ভক্তদের মধ্যে এ ধারণাও প্রতিষ্ঠিত আছে যে, মুরশিদের কৃপায় মৃত জীব জীবন ফিরে পায়। ভক্তদের ধারণা মুরশিদরা সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান। শিষ্যদের বিশ্বাস গুরুকে না ভজিলে

---

[৪৪] হাসনা বেগম, "বাংলার বাউল", পৃ. ১১৫।

[৪৫] জসীমউদ্‌দীন, *মুর্শীদা গান*, পৃ. ২৫৯।

৪৬ *তদেব*, পৃ. ২৫৬।

ভগবানকে পাওয়া যায় না। মুরশিদ মানে গুরু, গুরু মানে ভগবান। তাই তারা মুরশিদি গান করে। বাস্তবিক পক্ষে মুরশিদি গানে ঈশ্বর সম্বন্ধেও বহু গান পাওয়া যায় এবং অনেকে মুরশিদ অর্থে ভগবানকেই মনে করে। 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' শব্দের অর্থ তেজ বুঝায় অতএব অজ্ঞানতা নাশক ব্রহ্মই গুরু এতে সন্দেহ নাই।

মুরশিদি গানে প্রেমিক ভক্তদের কাছে শাহলাল ওরফে শানাল একজন বড় মাপের গুরু। শিষ্যদের চোখে শানাল হল একজন যাদুকর। তার যাদুর টানে কঠোর সমাজ-শাসন উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান গুরু শানালের প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করছে। গুরুর প্রতি শিষ্যের এত নিখাদ ভক্তি আর অন্য কোথায় আছে বলে মনে হয় না। এ ভক্তি কোনো দেবতায় নয়, কিংবা সম্মানিত কোনো বিদ্বানের জন্যও নয় শহর হতে অনেক দূরে মূর্খ বাঙাল এক বাউল কবির জন্য, যার সম্বলের ভিতর ছিল এক চোখের জল আর কয়েকটি মুরশিদি গান।

মুরশিদি গান একপ্রকার প্রার্থনা গান। গ্রামে কোনো সংক্রামক রোগ দেখা দিলে গ্রামের লোকেরা সকলে মিলে মুরশিদি গানের বৈঠক দেয়। লক্ষ একটাই, বিপদে সাঁই গুরুর কৃপা লাভ। গুরুর চরণে গানের ভাষা নিবেদন করত শিষ্যরা রিপু সংযমের মাধ্যমে গুরুর কাছে প্রার্থনা করে।

গুরু ডুবে যেন থাকে,
তোমার রূপেতে আঁখি
মনেতে আমার চাহে অনিবার,চরণ দুটি হৃদয়ে রাখি-এ
সাজিয়ে রেখেছি হৃদয়কুঞ্জ,
তোমার আশাতে থাকি-এ
শয়নে স্বপনে, নিশি জাগরণে
সদায় যেন তোমাকে দেখি-এ
কোথায় থাক তুমি, আমি নাহি জানি,
কিভাবে তোমাকে ডাকি-এ।[৪৭]

মুরশিদি গানে গুরু রূপে মাতৃসাধনার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিষ্যরা মনে করে মা হলো জগতের গুরু। দশ মাস দশ দিন মায়ের গর্ভে অবস্থান করার পর এই দুঃখের সাগরে মানবকুলে জন্ম হয়েছে। এ জগৎ দুঃখময়, দুঃখকে বরণ করা এবং গুরুকৃপা লাভের মাধ্যমে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। মুরশিদি গানে রিপু সংযমের মাধ্যমে গুরুসাধনা এবং গুরুকৃপার মাধ্যমে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য দর্শনে সোপেনহওয়ারে দুঃখবাদের সাথে মুরশিদ শিষ্যদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সোপেনহওয়ার জীবনকে দুঃখময় বলে দুঃখকে জীবনের আত্মসমর্পণমূলক পরিণতি হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। মুরশিদি গানে জীবনের আত্মসমর্পণমূলক দর্শন সুস্পষ্ট। এই আত্মসমর্পণ একান্তই জগৎ মাতা, গুরু মুরশিদের চরণে:

মা বিনে দুঃখ আর অন্যে জানে না
মা হইল জগতের গুরু
আমি তারে চিনলাম না।
হাপন যদি মা ধন হইতো
ওমায় ফেইলা যেতো না
ও আমার দুঃখ হইত না।[৪৮]

---

[৪৭] *তদেব*, পৃ. ২৫৮।
[৪৮] *তদেব*, পৃ. ১৯৯।

মুরশিদি গানে গুরুবাদ এতই প্রবল যে, গুরুর স্থান সর্বোচ্চে এবং শিক্ষা-দীক্ষা, তন্ত্রে -মন্ত্রে আচার্য গুরুর কর্তৃত্বহীন লোক থেকে উচ্চে। শিষ্যরা বিশ্বাস করে যে, আচার্য গুরু দ্বারা দীক্ষিত না হলে আত্মা সুবিজ্ঞের হয় না। মুরশিদদের এই বিশ্বাসের এক ধর্মীয় ভিত্তি আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

ব্রহ্মাত্মা গুরুর চরণে প্রণামপূর্বক প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা আত্মজ্ঞান শিক্ষা কর। জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করবেন।[৪৯]

অনেকে মনে করে যে, মুরশিদি গানে গুরুবাদটা অনেকটা হিন্দু তন্ত্র শাস্ত্র থেকে গৃহীত হয়েছে। হিন্দু তন্ত্রে সাধনার মূলই গুরু এবং গুরু ইষ্টদেবতা বা ঈশ্বরে কোনো প্রভেদ নেই। ঈশ্বর গুরুরূপে সাধককে পরিচালিত করেন:

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বরঃ
গুরুদেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ॥

গুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর। যিনি আমার নাথ তিনিই জগতের নাথ, যিনি আমার গুরু তিনিই জগতের গুরু এবং যিনি আমার আত্মা তিনিই সর্বভূতের আত্মা, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। হিন্দু তন্ত্রে চার প্রকার গুরুর উল্লেখ আছে : গুরু, পরম গুরু, পরমেষ্টি গুরু, ও পরাৎপর গুরু। কিন্তু মুরশিদি ফকিরদের মধ্যে দেখা যায় যে, মানবগুরু শ্রেষ্ঠ গুরু এবং এ গুরুর তুলনায় কোনো গুরু নাই । হিন্দু তন্ত্রে গুরু উপদেশ লঙ্ঘনে গুরুর অভিশাপ এবং সেক্ষেত্রে শিষ্যের বিনাশ বিধান সংবলিত ব্যাখ্যা শ্রুত হয় । কিন্তু মুরশিদি গানে যে গুরু-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় তাতে দেখা যায় এ গুরু এতই মহানুভব যে, শিষ্যের সাথে একাকার হয়ে যায়। গুরু শিষ্যের সাথে কোনো পার্থক্য থাকে না। গুরু শিষ্য এক আত্মা, এক প্রাণ। এ গুরু আধ্যাত্মিক ; অন্য জগতের গুরু নয়। এ গুরু একান্তই আত্মার আত্মীয় প্রতিবেশী মানবগুরু। এ গুরুর শুধু দান আছে। কৃপা দান করা এ গুরুর মহত্ত্ব। এ গুরু কোনো প্রতিদান করে না অভিশাপ দেওয়া এ গুরুর তন্ত্রে অনুপস্থিত। তাই মুরশিদি গানে গুরুবাদ প্রবল হয়ে আছে।

উপসংহার

সংগীতের যে কোনো প্রসঙ্গেই একথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকার্য হয়ে পড়ে যে, আমাদের সংগীত কলা ও কৌশলের এক বিস্ময়কর সমাহার। বাংলাদেশে প্রচলিত গান গুলির মধ্যে মুরশিদি গান সামগ্রিক অর্থে নান্দনিক বোধ এবং দার্শনিক চিন্তায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মুরশিদি গান মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক ও ভক্তিমার্গের দর্শন প্রতিষ্ঠা করে। কালের বিবর্তনে নানা দেশে নানা স্থানে এ গানের প্রভাব পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে সংগীত রচনায় বিশ্বখ্যাত হয়েছেন তিনিও একসময়ে মুরশিদপন্থি বাউলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সংগীতের নতুন ধারা সূচনা করেন যে, গানগুলিতে বাউলের বৈশিষ্ট্য

---

[৪৯] *গীতা* ৪/৩৪।

আছে; অথচ সুরের বৈচিত্র্য পেয়েছে। আজও গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে মুরশিদি গান সকল গান ছেড়ে অমৃতের খনি। আধুনিক সভ্যতার বিবর্তনের ফলে গানের ভুবনে নিত্যনতুন সংযোজন, নিত্যনতুন বাদ্য যন্ত্রের সমাহার ঘটছে। ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে একদিকে যেমন সংক্রমিত হচ্ছে বিকৃত সুর, উগ্রতা, উন্মাদনা তেমনি ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মুরশিদি গানের সুর, ভাষা, তত্ত্বসার। লোকসংগীতের আধ্যাত্মিক সাধনমার্গে মুরশিদি গানের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হলেও আজ হয়ত তেমন দাবি করার পরিবেশ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১৩

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যাত্রাগানের প্রভাব

তপন বাগচী*

Abstract: The storyline of films are being drawn mainly from three distinctive sources. The first relates to the creativity of playwrights, the second adopts from popular fictions and the third is from folktales or folkpays. This research work has shown how the *jatra*, one of the major folkplays in Bangladesh, have influence the development of films. The paper also focuses on the *jatra*, which have been cinematographed and the role of directors of those films in this regard. The quality and quantity of the *jatra*-influenced films in Bangladeshi showbiz are also outlined in the paper.

ভূমিকা

চলচ্চিত্রের নিজস্ব যে ভাষা, তা দেশকালসীমার উর্ধ্বে। যোগাযোগকলার যত রকমের মাধ্যম প্রচলিত রয়েছে বিশ্বজুড়ে, চলচ্চিত্র তার প্রায় সকল মাধ্যমকে ধারণ করে পূর্ণাঙ্গ শিল্প হিসেবে নিজের অবস্থানকে পোক্ত করে নিয়েছে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ছবি পাই, শব্দ পাই, সুর পাই, কবিতা পাই, গল্প পাই, নাটক পাই, নৃত্য পাই, পাই শিল্পসাহিত্যসংস্কৃতির সকল প্রকরণ। বিপরীতক্রমে একথাও সত্য যে, সমন্বিত এ শিল্পমাধ্যম একক ও স্বয়ম্ভু নয়। একে নির্ভর করতে হয় অপরাপর শিল্প-উপাদানের প্রতি· চিত্রায়ণের আগে পরিচালক বা প্রযোজক একটি পরিকল্পিত কাঠামোর কথা ভাবেন, যা চিত্রনাট্যের রূপ পায়। এই চিত্রনাট্যের প্রেরণা কিংবা অবলম্বন হতে পারে নতুন ও মৌলিক কোনো কাহিনী কিংবা গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাস-রূপকথার রূপান্তর। তাই চিত্রনাট্যকে সাহিত্য বা টেক্সট হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৩), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১), জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকের সাহিত্যকর্মের মতো সমকালীন লেখক আশরাফ সিদ্দিকী (জ. ১৯২৭), আলাউদ্দিন আল আজাদ (জ. ১৯৩২), নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫), সেলিনা হোসেন (জ. ১৯৪৭), সেলিম আল দীন (জ. ১৯৪৮), হুমায়ুন আহমেদ (জ. ১৯৪৮), মুহাম্মদ জাফর ইকবাল (জ. ১৯৫২) প্রমুখের সাহিত্যকর্মও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। সাহিত্যের পাশাপাশি আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকগাথা ও লোককাহিনী ষাটের দশক থেকেই হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের বড় অবলম্বন। এর পেছনের কারণ ঐতিহ্যপ্রীতি হতে পারে, বাণিজ্যলিপ্সাও হতে পারে-সে

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। গবেষক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি), ঢাকা।

বিষয়ে অনুসন্ধান আমাদের বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। যাত্রার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানো কিংবা যাত্রার কাহিনীর চিত্রায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র কতটা প্রভাবিত হয়েছে, তা অনুসন্ধান করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচনা পর্ব

বিশিষ্ট পরিচালক সালাহউদ্দিন (১৯২৬-২০০৩) চলচ্চিত্রের জন্যে লোককাহিনীকে প্রথম বিবেচনা করেন। তাঁর পরিচালনায় ১৯৬৫ সালের ৫ নবেম্বর মুক্তি পায় 'রূপবান' ছবিটি। এর আগে ১৯৫৫ সালের দিকে 'মহুয়া' পালাকে যাত্রায় রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মহুয়া-চরিত্রে রানী সরকারকে বিবেচনা করে সামিরা স্টুডিওর মালিক জনাব আলী এই ছবির প্রযোজনায় এগিয়ে আসেন। তিনি চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শেখ লতিফ (জ. ১৯৩২) যুক্ত ছিলেন এর প্রোডাকশনের সঙ্গে।[১] কিন্তু এ ছবি আর মুক্তি পায়নি। লোককাহিনীকে কিংবা যাত্রার কাহিনীকে চলচ্চিত্রায়ণের এটিই প্রথম প্রচেষ্টা।

ষাটের দশকের শুরু থেকে যাত্রামঞ্চে 'রূপবান' পালাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু 'রূপবান' যাত্রা অভিনয়ের জন্যেই বেশকিছু যাত্রাদল গড়ে ওঠে। বিক্রমপুরের 'খালপাড়ের দল' নামে পরিচিত একটি যাত্রাদল 'রূপবান' পালার জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে 'রূপবান' যাত্রার গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয় এবং তার বিক্রির পরিমাণও অবিশ্বাস্য। কবি জসীমউদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) ভাষ্যমতে:

> শুনিতে পাইলাম গত কয়েক মাসে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) রেকর্ড বিক্রি হইয়াছে। গ্রামদেশের পথে-ঘাটে বিচরণ করিলে পাঠক শুনিতে পাইবেন কোথাও না কোথাও হইতে কেহ না কেহ রূপবান যাত্রার কোন গান গাহিয়া চলিয়াছে। একাধিক জায়গায় রূপবান যাত্রার অভিনয় দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। তাহাতে দেখিয়াছি, ২০/২৫ হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সারারাত জাগিয়া এই গান উপভোগ করিয়াছে। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে এই গান বাঙালির মনে কতটা স্থান লাভ করিয়াছে।[২]

রূপবান যাত্রার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে অজ্ঞাত কোনও মহল তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খানের কাছে অভিযোগ করে যে, এতে ইসলাম-বিরোধী বক্তব্য আছে। এই ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ১৯৬২ সালে মোনায়েম খান সরকারি ঘোষণায় যাত্রাদলে নারীশিল্পীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এর ফলে 'রূপবান যাত্রা'ও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দেশের ঐতিহ্যবাহী যাত্রাদল 'বাবুল অপেরা'র মালিক বিশিষ্ট যাত্রাব্যক্তিত্ব আমীন শরীফ চৌধুরী মামলা দায়ের করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন কবি জসীমউদ্‌দীন। প্রখ্যাত আইনজীবী হামিদুল হক চৌধুরী (১৯০১-১৯৯২) মামলা পরিচালনা করেন। তিন মাসের মধ্যে আদালতের নির্দেশে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।[৩] রূপবান যাত্রার জয়যাত্রা এতে অব্যাহত থাকে। মামলা-জয়ের পরে 'রূপবান' তথা যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই জনপ্রিয়তাই প্রভাব বিস্তার করে

---

[১] অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস* (ঢাকা: বিএফডিসি, ১৯৮৭), পৃ. ৩৮।

[২] জসীমউদ্‌দীন, 'রূপবান যাত্রা', *জসীমউদ্‌দীনের প্রবন্ধ* (ঢাকা: পলাশ প্রকাশনী, ১৯৯৭)।

[৩] কামাল লোহানী, "বাংলার লোকঐতিহ্য : প্রসঙ্গ যাত্রাশিল্প" '*বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প* সৈকত আসগর (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২), পৃ. ২৫০।

আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পে। এ-ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-গবেষক অনুপম হায়াৎ-এর (জ. ১৯৫০) মন্তব্যে:

> ষাট দশকের প্রারম্ভে উর্দুছবির প্রচণ্ড দাপটের মধ্যে পরিচালক সালাহউদ্দিন তৈরি করেন 'রূপবান' (১৯৬৫)। ওই সময় 'রূপবান' যাত্রা বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। চিত্রকর্মী সফদার আলী ভূঁইয়ার অনুপ্রেরণায় সালাহউদ্দিন 'রূপবান'কে চলচ্চিত্রায়িত করেন। ছবিটি সুপারহিট হয় যাত্রা-নাটকের মতোই। 'রূপবান'-এর সাফল্য অন্যান্য চিত্রনির্মাতাকে উর্দুভাষার বদলে লোকগাথাভিত্তিক ছবি নির্মাণে প্রেরণা দেয়।[৪]

'রূপবান' ছবির মুক্তির প্রকৃত তারিখ ১৯৬৫ সালের ৫ই নবেম্বর। নায়িকা সুজাতা (তন্দ্রা মজুমদার) অভিনীত এই ছবির সাড়ম্বর শুভমুক্তি ঘটে একসঙ্গে ঢাকার ৬টি সিনেমা হলে। ঢাকার পত্রপত্রিকায় এই ছবি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা প্রকাশিত হয়। আমানুল্লাহ খান নামের এক দর্শকের একটি মন্তব্য সে-সময়ে প্রকাশিত হয় 'দৈনিক আজাদে'। তিনি লেখেন:

> সালাহউদ্দিন প্রযোজিত ও পরিচালিত দ্বিভাষিক ছায়াছবি 'রূপবান' বাংলা ছায়াছবির ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনা করেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ঢাকা শহরের ছয়টি প্রেক্ষাগৃহে একযোগে একটি বাংলাছবির মুক্তিলাভ একটি স্মরণীয় ঘটনা। ... পূর্বপাকিস্তানের লোকগাথা অবলম্বনে রচিত 'রূপবান'-এর কাহিনী জানে না, এমন লোকের সংখ্যা নগণ্য। ... ছবিটিতে যাত্রার ঢঙের আশ্রয় নেওয়াতে আবেদন এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি বলে আমাদের বিশ্বাস। ... ছবিটিতে সার্থক ও সুন্দর অভিনয়ের জন্যে সুজাতা, সিরাজ, চন্দনা ও মনসুরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।[৫]

'রূপবান' বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে মূল্য পাওয়ার যোগ্য। এটি চলচ্চিত্রপাড়ার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই বদলে দেয়। চলচ্চিত্রের দর্শক তো বটেই, সমালোচক ও গবেষকদের কাছে এটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই ছবির প্রতি যাত্রাগানের প্রভাবকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। 'রূপবান' চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও গবেষক জাকির হোসেন রাজুর অভিমতও গ্রহণ করার মতো। তিনি বলেছেন:

> দশকের মাঝামাঝি ব্যবসাদার ছবি-নির্মাতারা দেখলেন যে উর্দু ছবি দিয়েও দর্শক টেনে আনা যাচ্ছে না। এবার শুরু হয় যাত্রাধর্মী লোককাহিনির উপর ভিত্তি করে ফ্যান্টাসী-ছবি নির্মাণ। ৬৫-তে সালাইদ্দিন পথ দেখালেন, তাঁর 'রূপবান' ছবির মাধ্যমে। পূর্ববাংলার প্রথম লোকছবি 'রূপবান' জনপ্রিয়তার রেকর্ড তৈরি করে এবং গ্রামবাংলার সিনেমা-দর্শক বৃদ্ধি করে।[৬]

বিস্তৃতি

যাত্রাকাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ-সাফল্যের পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে লোককাহিনীভিত্তিক ছবি নির্মাণের হিড়িক পড়ে যায়। এবছর মুক্তিপ্রাপ্ত ২৫টি ছবির মধ্যে ৪০% ভাগ অর্থাৎ ১০টি ছবির কাহিনী নেওয়া হয় সরাসরি যাত্রাপালা থেকে, কিংবা যাত্রামঞ্চে জনপ্রিয়তার নিরিখে সফল হওয়া কোনও লোককাহিনী থেকে। যাত্রাপ্রভাবিত যে সকল চলচ্চিত্র এই এক বছরে মুক্তি পায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'সারণি ১'-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়।

সারণি ১

---

[৪] অনুপম হায়াৎ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

[৫] আমানুল্লাহ খান, দর্শকের চোখে রূপবান, ফিলমিস্তান, '*দৈনিক আজাদ*', ঢাকা, ১৮ নভেম্বর ১৯৬৫।

[৬] জাকির হোসেন রাজু, *চলচ্চিত্রের চালচিত্র* (ঢাকা: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি, ১৯৯০), পৃ. ৮৪।

১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত যাত্রাপ্রভাবিত চলচ্চিত্রের তালিকা

মুক্তির তারিখ	ছবির নাম	পরিচালকের নাম
১৮.০৩.১৯৬৬	রহিম বাদশা ও রূপবান	সফদার আলী ভুঁইয়া
০৮.০৪.১৯৬৬	আবার বনবাসে রূপবান	ইবনে মিজান
২০.০৬.১৯৬৬	গুনাইবিবি	সৈয়দ আউয়াল
২৪.০৬.১৯৬৬	গুনাই	বজলুর রহমান
০৫.০৮.১৯৬৬	রূপবান (উর্দু)	সালাহউদ্দিন
১২.০৮.১৯৬৬	মহুয়া	আলী মনসুর
০২.০৯.১৯৬৬	ভাওয়াল সন্ন্যাসী	রওনক চৌধুরী
২৮.১০.১৯৬৬	বেহুলা	জহির রায়হান
১১.১১.১৯৬৬	আপন দুলাল	নজরুল ইসলাম
১৮.১১.১৯৬৬	জরিনা সুন্দরী	ইবনে মিজান

সূত্র : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভস

আমরা লক্ষ করি যে, 'রূপবান' ছবির প্রেরণাদানকারী সফদার আলী ভুঁইয়া (১৯৩০-১৯৮৪) একই কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ করেন নামটি একটু বদলে নিয়ে। 'রূপবান' ছবির পরিচালকও বসে থাকেননি। তিনি এর উর্দু সংস্করণ তৈরি করেন। পরিচালক ইবনে মিজান (জ. ১৯৩০) তাঁর ছবির নাম দেন 'আবার বনবাসে রূপবান'। কাহিনী প্রায় একই, পরিচালক-ভেদে ছবির নির্মাণে কিছুটা ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যাত্রাগানের এই প্রভাবকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। পরবর্তীকালে এই পথ ধরে আরও অনেক পরিচালক এগিয়ে এসেছেন। 'রূপবান' ছবির প্রভাব সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক মির্জা তারেকুল কাদেরের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:

> ১৯৬৬ সালে যেখানে ১২টি উর্দু ছবি (সর্বোচ্চ সংখ্যা) মুক্তি লাভ করে, ৩ বছরের ব্যবধানে এই সংখ্যা দ্রুত কমে এসে দাঁড়ায় মাত্র দুটিতে। অপরদিকে ১৯৬৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল মাত্র ৫টি বাংলা ছবি। লোককাহিনীভিত্তিক বাংলা ছবি রূপায়ণের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তাকে ভিত্তি করে পরবর্তীতে এই সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৭]

উর্দু ছবির আধিক্যের কালে লোককাহিনী ও যাত্রাকাহিনীর চিত্রায়ণ এবং বাংলা ছবির জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি প্রভৃতি অনুষঙ্গ পর্যবেক্ষণ এবং চলচ্চিত্র-গবেষকদের মূল্যায়ন বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, 'রূপবান' যাত্রার আগমন আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পকে তিনভাবে প্রভাবিত করেছে–

১. লোকঐতিহ্যের দিকে অর্থাৎ শেকড়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পেরেছে।
২. যাত্রার জনপ্রিয় কাহিনীকে চিত্রায়নের মাধ্যমে সাধারণ দর্শককে হলমুখী করতে সহায়তা করেছে।
৩. উর্দু ছবি নির্মাণের ব্যাপারে বাঙালি পরিচালকদের নিরুৎসাহিত করেছে।

১৯৬৫ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মধ্যে সরাসরি যাত্রাকাহিনী ও লোককাহিনী ভিত্তিক ছবির বিন্যাস (সারণি-২) দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, সংখ্যাবিচারে ১৯৬৬ সালে বেশি ছবি নির্মিত হয়েছে, তারপর ১৯৬৭ সালে, আর সবচেয়ে কম ছবি হয়েছে ১৯৭০ সালে। আবার ১৯৭১ সালে এ-ধরনের কোনও ছবি নির্মিত হয়নি। শতকরা হার বিবেচনায় বেশি ছবি হয়েছে

[৭] মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ১৩৯।

১৯৬৬ সালে ৪০%, তারপর ১৯৬৫ সালে ১৮.১৮%, তারপর ১৯৬৮ সালে ১৭.৩৯% এবং সবচেয়ে কম ১৯৭০ সালে ২.৪৪%।

সারণি ২

যাত্রাকাহিনী ও লোককাহিনী ভিত্তিক ছবির বিন্যাস

সাল	যাত্রা ও লোককাহিনী প্রভাবিত ছবি		অন্যান্য ছবি		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
১৯৬৫	০২	১৮.১৮	০৯	৮১.৮২	১১	১০০
১৯৬৬	১০	৪০.০০	১৫	৬০.০০	২৫	১০০
১৯৬৭	০৪	১৭.৩৯	১৯	৮২.৬১	২৩	১০০
১৯৬৮	০৩	০৮.৮২	৩১	৯১.১৮	৩৪	১০০
১৯৬৯	০৩	১০.৩৪	২৬	৮৯.৬৫	২৯	১০০
১৯৭০	০১	০২.৪৪	৪০	৯৭.৫৬	৪১	১০০
১৯৭১	০০	০০	০৮	১০০	০৮	১০০

সূত্র : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভস

১৯৬৭ সালে 'রহিম বাদশা ও রূপবান'-এর পরিচালক সফদার আলী ভুঁইয়া 'ঝুমুর যাত্রা'র জনপ্রিয় পালা 'কাঞ্চনমালা'র চলচ্চিত্র রূপ দেন। ঝুমুর যাত্রার আরেকটি জনপ্রিয় পালা 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল'-কে চলচ্চিত্রায়িত করেন পরিচালক আজিজুর রহমান (জ. ১৯৩৯)। খ্যাতিমান নায়ক ও পরিচালক খান আতা (১৯২৮-২০০১) এ-বছর 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' নামে বাংলা ও উর্দু ভাষায় দুটি ছবি নির্মাণ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা থিয়েটারে এবং যাত্রামঞ্চে অভিনীত হয়েছে যুগপৎ। যাত্রামঞ্চে একাধিক পালাকারের রচিত এই পালা এখনও প্রতিবছর শতশতর বার অভিনীত হয়। যাত্রার দর্শকদের কাছে 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা'র জনপ্রিয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে খান আতা এই ছবি নির্মাণে অগ্রসর হন, সে কথা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যাত্রা ও লোককাহিনী ভিত্তিক চলচ্চিত্রের গতিকে শ্লথ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার (বিএফডিসি) অসহযোগিতা রয়েছে। ১৯৬৬ সালে ইবনে মিজানের দুটি ছবি সুপারহিট হওয়ার পরেও বিএফডিসি তাঁর একটি ছবির শ্যুটিঙের অনুমতি দিতে অস্বীকার জানায়।[৮]

১৯৬৮ সালে আজিজুর রহমান নির্মাণ করেন ঝুমুর যাত্রার নন্দিত পালা 'মধুমালা' এবং ইবনে মিজান নির্মাণ করেন 'রাখালবন্ধু'। এবছর রূপবানের কাহিনী নিয়ে নতুন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন পরিচালক ই. আর. খান 'রূপবানের রূপকথা' নামে। ১৯৬৯ সালে ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনীভিত্তিক 'বেদের মেয়ে' ও 'মলুয়া' চিত্রায়িত হয়। এদুটি কাহিনী অনেক আগে থেকেই যাত্রামঞ্চে প্রশংসা অর্জন করেছে। 'রূপবান'-খ্যাত পরিচালক সালাহউদ্দিন চলচ্চিত্ররূপ দেন 'আলোমতি প্রেমকুমার' যাত্রাপালার কাহিনীকে। এটি মুক্তি পায় এ বছরের ২রা মে তারিখে। এ ছবিতে যাত্রার প্রভাব সম্পর্কে জানা যায় 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আলোমতির শুভমুক্তি' শীর্ষক সিঙ্গেল কলাম প্রতিবেদন থেকে:

> সালাহউদ্দিন পরিচালিত 'আলোমতি প্রেমকুমার' ছবিটি আগামীকাল প্রদেশব্যাপী মুক্তিলাভ করছে। পূর্বপাকিস্তানের একটি জনপ্রিয় যাত্রাকাহিনী অবলম্বনে এটি নির্মিত হয়েছে। এ ছবির ভূমিকায়

[৮] অনুপম হায়াৎ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

রয়েছেন সামিনা, বাদল, দেবী, মঞ্জুর, জয়শ্রী, ইনাম আহমেদ ও আনোয়ার হোসেন। চিত্রগ্রহণ করেছেন রফিকুল বারী চৌধুরী। সম্পাদনা করেছেন তালেব।[৯]

'আমীর সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী' চিত্রায়িত হয় ১৯৭০ সালে, ইবনে মিজানের হাতে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সঙ্গত কারণেই বেশি ছবি মুক্তি পায়নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে মোট ৮টি ছবি মুক্তি পেলেও যাত্রাপ্রভাবিত ছবি মুক্তি পায়নি। মোট ছবির তুলনায় যাত্রাপ্রভাবিত ছবির তুলনামূলক বিন্যাস চিত্র ১-এ দেখানো যায়।

চিত্র ১

যাত্রাপ্রভাবিত ছবির তুলনামূলক বিন্যাস

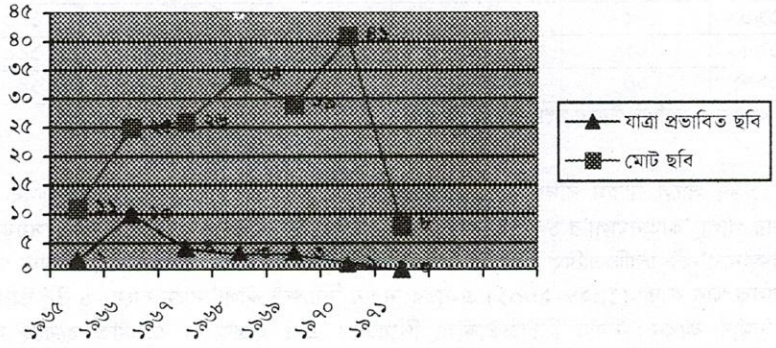

সূত্র : সারণি ২ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকের সমীক্ষা

অনুবর্তন পর্ব

মুক্তিযুদ্ধর পরে স্বাধীন বাংলাদেশে লোককাহিনী কিংবা যাত্রাকাহিনীর চিত্ররূপায়ণ আরও কিছুটা কমে আসে। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসের পরে সঙ্গত কারণেই কোনও ছবি মুক্ত পায়নি। ১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'নিমাই সন্ন্যাস' ও 'লালন ফকির' চলচ্চিত্রের কাহিনী যাত্রা-অপেরার মাধ্যমে সারাদেশে আগেই জনপ্রিয় ছিল। এদুটি চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে সিরাজুল ইসলাম (জ. ১৯৩৮) ও সৈয়দ হাসান ইমাম (জ. ১৯৩৫)। ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে যাত্রাকাহিনী নিয়ে কোনও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি। ১৯৭৬ সালে লোককাহিনী 'কাজলরেখা' চিত্রায়িত করেন সফদার আলী ভুঁইয়া। এ বছর চলচ্চিত্রশিল্পে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম হয়। মোহাম্মদ আলী মিন্টুর পরিচালনায় 'বর্গী এলো দেশে' যাত্রাপালার হুবহু চলচ্চিত্র রূপ দেওয়া হয়। মুস্তাফিজ প্রোডাকশন্স নিবেদিত 'বাংলাদেশে প্রথম চলচ্চিত্রায়িত যাত্রা!!' শিরোনামে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সচিত্র ঝিনুক পত্রিকার শেষ প্রচ্ছদে।[১০] এটির কাহিনী, সংলাপ ও সংগীত সরাসরি যাত্রাপালা থেকে সংগৃহীত। ১৯৭৭ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি

[৯] আলোমতির শুভমুক্তি, *'দৈনিক আজাদ'*, ঢাকা, ১ মে ১৯৬৯, পৃ. ০৮।

[১০] আসিরুদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) "শেষ প্রচ্ছদ" *সচিত্র ঝিনুক* ১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৭৬।

মুক্তি পায় 'সাগর ভাসা' নামের একটি ছবি। কবরী, রোজী, চঞ্চল, ইনাম আহমেদ, টেলিসামাদ অভিনীত[১১] এছবিটিও যাত্রাকাহিনীর রূপান্তর।

আমাদের যাত্রার দর্শকরাই আমাদের চলচ্চিত্রের মূল দর্শক। প্রযুক্তির সুবিধাহীন আমাদের দেশীয় অভিনয়-আঙ্গিক যাত্রায় কোনও সাজানো পটভূমি থাকে না বলে দর্শকরা খোলামঞ্চকেই বদ্ধঘর কিংবা গহীন জঙ্গল কল্পনা করে কাহিনীর মূল স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। চলচ্চিত্রের অনেক অসঙ্গতি তাই তারা খুঁজতে যায় না। ১৯৭৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত আবদুল্লাহ আল মামুনের (জ. ১৯৪৩) 'সারেং বউ' ছবির সমালোচনা-প্রসঙ্গে দর্শকদের যাত্রারুচির উল্লেখ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবির (জ. ১৯৫০)। তিনি লিখেছেন:

> একজন সচেতন দর্শক অবশ্যই প্রশ্ন করবেন 'সারেং বউ' ছবিতে যে গ্রাম দেখানো হয়েছে এ কি শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাসের গ্রাম? গ্রামের মানুষ সমুদ্র দেখে, কিন্তু সমুদ্রের মানুষ গ্রাম দেখে না। এ এমন এক গ্রাম যে গ্রামে পাখি ডাকে না, ব্যাঙের ডাক ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায় না, পুরনো বহু ব্যবহৃত স্টক শট আর পেছনে লাল পর্দা দেখে ধরে নিতে হবে ঝড় হচ্ছে। যাত্রা দেখে অভ্যস্ত এদেশের দর্শকরা এত বেশি সহিষ্ণু যে এগুলো নির্বিবাদে মেনে নেয়।[১২]

১৯৮৩ সাল পর্যন্ত লোককাহিনীভিত্তিক কয়েকটি ছবি নির্মিত হলেও তাতে যাত্রার তেমন প্রভাব ছিল না। ১৯৮৪ সালে সফদার আলী ভূঁইয়া নির্মাণ করেন 'রসের বাইদানী'। এটি যাত্রার জনপ্রিয় কাহিনী 'বেদের মেয়ে'র প্রভাবজাত। ১৯৮৪ সালেই চলচ্চিত্রশিল্পে যাত্রার প্রভাব ভিন্ন মাত্রায় প্রতিভাত হয়। যাত্রাশিল্পীর, বিশেষত এক নৃত্যশিল্পীর জীবনের আলো-অন্ধকার নিয়ে নির্মিত হয় 'প্রিন্সেস টিনা খান' নামের একটি ছবি। ফেব্রুয়ারির ১৭ তারিখে মুক্তি পাওয়া এ-ছবিটি সম্পর্কে মির্জা তারেকুল কাদের বলেন:

> এ-বছর মুক্তিপ্রাপ্ত 'প্রিন্সেস টিনা খান' ছবিটিতে নবাগত পরিচালক আখতারুজ্জামান যাত্রাজগতের মনোরঞ্জনকারীদের নেপথ্য দুঃখের কাহিনী বাস্তবতার সঙ্গে চলচ্চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেন। ব্যবসা-সফল না হলেও একটি পরিচ্ছন্ন ছবি হিসেবে এই ছবিটি সুস্থ ছবির দর্শক নন্দিত হয়।[১৩]

'প্রিন্সেস টিনা খান' ছবিটি ১৯৮৪ সালের বাচসাস পুরস্কারে ভূষিত হয়। এর নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন ফিরোজা খান টিনা (১৯৬২-১৯৮৯)। এ-ছবির প্রযোজিকাও তিনি। পরিচালক আখতারুজ্জামান (জ. ১৯৪৬), পার্শ্বচরিত্রাভিনেত্রী সুচন্দা (কোহিনূর আখতার, জ. ১৯৫৩), চিত্রগ্রাহক মাহফুজুর রহমান (জ. ১৯৫০), চিত্রসম্পাদক আনোয়ার হোসেন মন্টু (জ. ১৯৪৪) এবং এই ছবিরই 'আমি চিরকাল প্রেমেরই কাঙাল' গানের জন্যে এন্ড্রু কিশোরও বাচসাস পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ্য ১৯৮৯ সালের ২০শে জানুয়ারি বগুড়া থেকে ঢাকা ফেরার পথে ফেরিঘাটে নদীর মধ্যে গাড়ি পড়ে গেলে তিনি ও বিশিষ্ট পরিচালক আলমগীর কবির (১৯৩৮-১৯৮৯) মৃত্যুবরণ করেন। অভিনেত্রী ফিরোজা খান টিনাকে ১৯৮৮ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (জুরি বোর্ডের বিশেষ পুরস্কার) প্রদান করা হয়।

---

[১১] আসিরুদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) "দ্বিতীয় প্রচ্ছদ" *সচিত্র ঝিনুক*, ঢাকা, ১১ শ বর্ষ ১ম/২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭।

[১২] শাহরিয়ার কবির, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ৩০ জুন ১৯৭৮।

[১৩] মির্জা তারেকুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

১৯৮৫ সালে ৬৫টি ছবির মধ্যে চারটি ছবি ছিল যাত্রাপ্রভাবিত। এগুলো হলো আজিজুর রহমানের 'রঙিন রূপবান', মতিন রহমানের (জ. ১৯৫২) 'রাধাকৃষ্ণ', মহম্মদ হাননানের (জ. ১৯৪৯) 'রাইবিনোদিনী' এবং হারুনুর রশীদের (জ. ১৯৪০) 'গুনাইবিবি'। ১৯৮৬ সালে ৪টি, ১৯৮৭ সালে ৩টি, ১৯৮৮ সালে ২টি, ১৯৮৯ সালে ৬টি, ১৯৯০ সালে ১টি, ১৯৯১ সালে ৩টি এবং ১৯৯২ সালে ১টি ছবির মধ্যে যাত্রার প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়।

১৯৮৯ সাল বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত, মতিউর রহমান পানু (জ. ১৯৪০) প্রযোজিত এবং অঞ্জু ঘোষ (জ. ১৯৬৬) অভিনীত 'বেদের মেয়ে জোসনা' ছবিটি এই গুরুত্বের প্রধান কারণ। ছবিটি সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> উননব্বই সাল ছিল জোসনার বছর। 'বেদের মেয়ে জোসনা' চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে সকল সমীকরণ ওলাটপালট করে দিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ঢাকার চলচ্চিত্রের ৩২ বছরের ইতিহাসে এই ছবিটিই হচ্ছে একমাত্র, যে ছবি এককোটি টাকার সীমিত বাজার থেকে আয় করেছে পনের কোটি টাকা। ৯ জুন ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর সমকালীন সুপারহিট ছবিগুলোও ধরাশায়ী হতে শুরু করে। ... ছবিটির ৪৯টি প্রিন্ট দেশব্যাপী প্রদর্শিত হয়েছে।[১৪]

এই কাহিনীও আমাদের লোকনাট্য তথা যাত্রার প্রভাবজাত। যাত্রামঞ্চ থেকে আসা নায়িকা অঞ্জু ঘোষের অভিনয়েও যাত্রার ছাপ ছিল স্পষ্ট। গোটা চলচ্চিত্রটিই লোকনাট্যের বা যাত্রার কাঁচা আবেদনে ভরপুর। ছবিটি সম্পর্কে ভারতের চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্ব খাস্তু রোবের্জ তাই বলেছেন, 'আমি প্রকৃতপক্ষে একটি লোকনাট্যের অভিনয় উপভোগ করছি, যা সেলুলয়েডে ধারণকৃত'।[১৫]

উপসংহার

যাত্রার সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই সংযোগ নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক ব্যাপার ছিল। প্রতিটি দেশের সংস্কৃতির মূলধারার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির গভীর সংযোগ রয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের থিয়েটার এসেছে লোকনাট্য থেকে। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয়নি। আমাদের থিয়েটার এসেছে পাশ্চাত্য থেকে। লোকনাট্য কিংবা নিজস্ব অভিনয় আঙ্গিক যাত্রা থেকে আসেনি বলেই থিয়েটার সাধারণ মানুষের অবলম্বন হয়ে উঠতে পারেনি। মহিলা সমিতির মঞ্চে প্রতিদিন একশ দর্শক পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার প্রভাবে থিয়েটার কার্যত কতিপয় শহুরে মানুষের অনিয়মিত বিনোদনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। শেকড়ের সন্ধানে ব্যাপৃত থেকে থিয়েটার এখন অবশ্য লোকনাট্য এবং যাত্রার উপাদান গ্রহণ করে নবপ্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দাপটের কাছে থিয়েটারের প্রভাব নিস্প্রভ । আশার কথা এই যে, চলচ্চিত্র শুরুতেই লোকনাট্য এবং যাত্রার কাছ থেকে অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতি থেকেই উপাদান গ্রহণ করে সফলতা অর্জন করে। কিন্তু বর্তমানে সেই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। চলচ্চিত্রশিল্পে হিন্দি ছবির নকল করার প্রতিযোগিতা বড় দৃষ্টিকটু হয়ে পড়েছে। দর্শকরা দেশি ছবি দেখতে এখন আর হলমুখো হয় না। যে যাত্রা বা লোককাহিনী আমাদের দেশ থেকে আসল উর্দু ছবি হটিয়ে দিয়েছে, সেই যাত্রা বা লোককাহিনী কি নকল হিন্দি ছবি তাড়াতে পারবে না? ষাটের দশকের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আমরা অবশ্যই আশাবাদী হতে পারি।

---

[১৪] সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* (ঢাকা), বর্ষপত্র ১৯৯০, পৃ. ১৩১।

[১৫] মোরশেদুল ইসলাম (সম্পা.), *চলচ্চিত্রম* (ঢাকা), জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ১৫।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

হিজড়া ও সন্তান জন্মদানে অক্ষম ব্যক্তির উত্তরাধিকার

খবির উদ্দীন আহম্মদ*

Abstract: A hermaphrodite or *khonsa* is a person possessing of the parts of generation of both a man and a woman. According to traditional Hindu law they are excluded from succession because of physical defect whereas equivocal hermaphrodite is entitled to inherit under Muslim Law. No person is disqualified from succeeding to any property on the grounds of any disease, defect or deformity under the Hindu Succession Act, 1956 prevalent in India.The Succession Act, 1925 provides no rules of exclusion for the Christian hermaphrodite. Law of inheritance of hermaphrodite as well as persons unable to produce children is discussed in this article.

১. ভূমিকা

নারী ও পুরুষে বিভক্ত হলেও বিরলভাবে কোনো মানুষের মধ্যে এ উভয় লিঙ্গ বা লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। মূলত দৈহিক গড়ন এবং মনে তার প্রভাব বিস্তারকারী ফলাফল মানুষের এ শ্রেণীকে নারী ও পুরুষ থেকে পৃথক করেছে। বাংলাদেশে এ শ্রেণীর মানুষকে হিজড়া, খোজা, নপুংসক ইত্যাদি বলা হয়। এ ব্যক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য প্রতিশব্দ হলো Neuter, Eunuch, Hermaphrodite এবং খুনছা বা খুনসা। এরা সন্তান জন্মদানে অক্ষম।

হিন্দু আইনে পুরুষত্বহীন ও বন্ধ্যাত্বজনিত সন্তান জন্মদানের অক্ষমতা উত্তরাধিকার বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারন। খ্রিস্টানের উপর প্রযোজ্য ১৯২৫ সালের The Succession Act 1925-এ হিজড়ার উত্তরাধিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নীতি নাই। মুসলিম আইনে হিজড়ার উত্তরাধিকার অত্যন্ত পরিষ্কার।

হিজড়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান, বাংলাদেশের মুসলমান হিজড়ার উত্তরাধিকার নীতি এবং উত্তরাধিকার নিয়মে খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ হিজড়ার অবস্থান এবং সন্তান জন্মদানে অক্ষম নারী ও পুরুষের সাথে হিজড়ার তুলনাসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

২. মানুষের জন্ম

প্রজনন প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্মের বিষয়টি এখন আর রহস্যাবৃত নয়। নারী গর্ভে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলনে সৃষ্ট কোষকলা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে নারী বা পুরুষ হয়। কখনো ত্রুটির কারণে পূর্ণাঙ্গ নারী বা পুরুষ না হয়ে হিজড়া বা ত্রুটিপূর্ণ মানব হয়। মানব সৃষ্টির এ বিষয়টি ক্রোমোজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটি স্বাভাবিক কোষের নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়ায় ৪৬ টি ক্রোমোজম থাকে যার ২২

* ড. খবির উদ্দীন আহম্মদ, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জোড়ার ৪৪টি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গের এবং ১ জোড়ার ২টি লিঙ্গ নির্ধারণের কাজ করে। এই ক্রোমোজম X এবং Y দ্বারা চিহ্নিত। ২২ জোড়ার ৪৪টি ক্রোমোজম X এবং অপর জোড়ার ২টিই X হলে নারী এবং ১টি X এবং অপরটি Y হলে পুরুষ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সংখ্যায় ক্রোমোজম যখন ৪৪XX+২XX অর্থাৎ ৪৬XX তখন তা নারী এবং যখন ৪৪XX+২XY অর্থাৎ ৪৬XY তখন তা পুরুষ হয়। ক্রোমোজমের ভারসাম্যহীনতা পূর্ণাঙ্গ নারী বা পুরুষ সৃষ্টিকে বাধাগ্রস্ত করে।[১]

৩. ব্যক্তি সনাক্তকরণ

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গ্রন্থি, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ইত্যাদি দ্বারা নারী পুরুষ সনাক্তকরণ সম্ভব । সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নে আলোচিত হলো:

৩.১ পুরুষ

দৈহিক কাঠামোতে পুরুষ হয় আকৃতিতে বড়। নিতম্বের তুলনায় তার কাঁধ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। তার মুখমণ্ডল ও বুকে কম বেশি দাড়ি, চুল বা লোম থাকে। তার বীর্য ধারণকারী অণ্ডকোষ, প্রস্টেট ও শিশ্ন থাকে।[২] ভূমিষ্ঠের পর পরই বাহ্যিকভাবে শিশ্ন ও অণ্ডকোষ দ্বারা পুরুষ সনাক্তকরণ সহজ।

৩.২ নারী

দৈহিক কাঠামোতে নারী হয় অপেক্ষাকৃত ছোট। তার কাঁধ অপেক্ষা নিতম্ব প্রশস্ত। পূর্ণ বয়সে তার স্তন থাকে। তার গর্ভাশয়, ডিম্ববাহী নালী, যোনিদ্বার এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে রক্তক্ষরণকারী কার্যকর ডিম্বাশয় থাকে।[৩] ভূমিষ্ঠের পর পরই তাকে প্রধানত বাহ্যিকভাবে যৌনাঙ্গ দ্বারা সনাক্তকরণ সহজ।

৩.৩ হিজড়া

গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীতে পুনরুৎপাদনশীল নারী ও পুরুষের অঙ্গ ও গ্রন্থি বিশিষ্ট যে কোনো প্রাণী সত্তাকে Hermaphrodite বলা হয়। প্রাচীন গ্রীক দম্পতি Hermes (Mercury) এবং Aphrodite (Venus) এর পুত্র Hermaphroditos একই সাথে নারী ও পুরুষ ছিল। তার নামানুসারে হিজড়ার ধারণা Hermaphrodite আকারে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। তুলনামূলক জীববিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে পরিপূর্ণ নারী ও পুরুষের ধারণার বিপরীতে নারী ও পুরুষের মিশ্র যৌন জীবন চিহ্নিতকরণে Hermaphrodite পদটি গৃহীত হয়েছে। সংক্ষেপে এর অর্থ একই সাথে নারী ও পুরুষের যৌন বৈশিষ্ট্য ও লিঙ্গধারী ব্যক্তি।[৪] এ Hermaphrodite তথা হিজড়া হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে পরিপূর্ণ নারী বা পুরুষ নয়। অর্থাৎ বিশেষ লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ যার লৈঙ্গিক গঠন অনুপযোগী বা বিকলাঙ্গ অথবা উভয় লিঙ্গ বা খোজা পুরুষ, যে মানুষ না-নারী না-পুরুষ হিসেবে বিবেচিত।[৫] মুসলিম আইনে হিজড়া বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝায় যার নারী ও পুরুষ উভয়ের সন্তান জন্মদানের অঙ্গ

---

[১] ডাঃ কে.সি.গাঙ্গুলী ও বাসুদেব গাঙ্গুলী, *মেডিক্যাল আইন বিজ্ঞান* (ঢাকা: আলীগড় লাইব্রেরী, ১৯৯২), পৃঃ ৬৩।

[২] *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬২-৬৩ ; S.A. Halim. *Modi's Medical Jurisprudence and Toxicology*, (Lahore : PLD Publishers), pp. 22-23.

[৩] হুমায়ুন আজাদ, *নারী* (ঢাকা: নদী, ১৯৯১), পৃ. ১৫৮-১৬১।

[৪] *Taber's Cyclopedic Medical Dictionary* (New Delhi: Jaypee Brothers, 1990), S.V. Hermaphrodite: *Encyclopaedia Britanica*, Vol. 11, S.V. Hermaphrodite: Charles Hamilton, *The Hedaya*, 2nd ed., Reprint (Lahore: Premier Book House, 1963), pp. 704-705.

[৫] মোহাম্মদ সোলায়মান, হিজড়া, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১০ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৪৬২।

আছে।[৬] মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন নারী ও পুরুষ থেকে হিজড়াকে পৃথক করেছে। ইদানীং পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন হিজড়াদের ৫ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ে হরমোন প্রয়োগ করে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৭] চিকিৎসা বিজ্ঞানে পূর্ণাঙ্গ নারী ও পুরুষের বিপরীতে হিজড়াকে কয়েকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা:

১) খাঁটি হিজড়া (True Hermaphrodite); এবং
২) কৃত্রিম হিজড়া (Pseudohermaphrodite)।

৩.৩.১. ***খাঁটি হিজড়া*** (True Hermaphrodite)
এরূপ ব্যক্তির দেহে উভয় লিঙ্গের কোষ যথা অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ পৃথক পৃথকভাবে অথবা একত্রে অণ্ড-ডিম্বকোষ থাকে। এদের যৌনাঙ্গ ও বাহ্যিক যৌন বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকমের হয়। এদের ক্রোমোজমের ধারা কখনো কখনো XXY / XY অথবা XX / XY বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

৩.৩.২. ***কৃত্রিম হিজড়া*** (Pseudohermaphrodite)
এরূপ ব্যক্তি দুই প্রকারের হতে পারে। যথা: (১) কৃত্রিম পুরুষ হিজড়া (Male Pseudohermaphrodite) এবং (২) কৃত্রিম নারী হিজড়া (Female Pseudohermaphrodite)

৩.৩.২.১. ***কৃত্রিম পুরুষ হিজড়া*** (Male Pseudohermaphrodite)
এদের অণ্ডকোষ বা শুক্রাশয় থাকে। তবে তা যথাস্থানে নাও থাকতে পারে। এদের যৌনাঙ্গ প্রায়ই অসম্পূর্ণ হয় এবং অঙ্গে নারীর অনেক বৈশিষ্ট্য থাকে। ক্রোমোজমের ধারা হয় ৪৬ XY।

৩.৩.২.২. ***কৃত্রিম নারী হিজড়া*** (Female Pseudohermaphrodite)
এদের ডিম্বাশয় থাকে। কিন্তু বাহ্যিক যৌনাঙ্গ পুরোপুরি নারীর মতো হয় না। অনেকটা পুরুষের মতো হয়। এদের ক্রোমোজমের ধারা ৪৬XX ।

৩.৩.৩. ***যৌন কোষের অস্বাভাবিক গঠন*** (Gonodal Dysgenesis)
বাহ্যিক যৌন বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এরা পরিপূর্ণ পুরুষ বা নারী হয় না। বয়ঃসন্ধিকালে এদের ডিম্বাশয় বা অণ্ডকোষের বিকাশ ঘটে না। এরা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: (১) নারী প্রকৃতির অস্বাভাবিক গঠন (Female Type Of Dysgenesis); এবং (২) পুরুষ প্রকৃতির অস্বাভাবিক গঠন (Male Type Of Dysgenesis)।

৩.৩.৩.১. ***নারী প্রকৃতির অস্বাভাবিক গঠন*** (Female Type of Dysgenesis)
এরা প্রায়ই নারীর বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু পরিপূর্ণ নারী থাকে না। অনেক সময়ে এদের বড় ক্লাইটোরিস থাকে। মাসিক স্রাব কখনোই হয় না এবং ডিম্বাশয় ঠিকমতো বিকাশ লাভ করে না।

৩.৩.৩.২. ***পুরুষ প্রকৃতির অস্বাভাবিক গঠন*** (Male Type of Dysgenesis)
এরা বাহ্যিকভাবে পুরুষের মতো। তবে এদের স্তন থাকতে পারে। এদের লিঙ্গ স্বাভাবিক বা ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। অণ্ডকোষ পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে না। বীর্যে শুক্রাণু থাকে না।

৩.৩.৪. ***যৌন কোষের অনুপস্থিতি*** (Gonodal Agenesis)
এদের ডিম্বকোষ বা অণ্ডকোষ থাকে না। ভ্রূণ অবস্থার প্রারম্ভেই এদের ত্রুটি শুরু হয়।[৮]

---

[৬] *Hedaya*, p. 704.
[৭] আতাই গাজী মাহবুব, হিজড়া : জন্মই যাদের আজন্ম পাপ, *পূর্ণিমা*, অক্টোবর, ২৩, ২০০২, পৃ. ৫১।
[৮] গাঙ্গুলী, পৃ. ৬৩-৬৪।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে Medical Dictionary-তে হিজড়াকে বহুভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৯] যেমন:

১. Hermaphroditism True: এদের দেহে একই সাথে অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ থাকে।
২. Hermaphroditism Bilateral: এদের দেহের উভয় দিকে ডিম্বকোষ ও অণ্ডকোষ থাকে।
৩. Hermaphroditism False/Hermaphroditism Spurious/ Pseudohermaphroditism: এদের দেহে পুরুষ ও নারীর যৌন গ্রন্থি অথবা যৌনাঙ্গ (অণ্ডকোষ বা ডিম্বকোষ) এর উপস্থিতি সত্ত্বেও বিপরীত লিঙ্গ অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে নারী বা পুরুষের লিঙ্গের উপস্থিতিসহ গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য থাকে।
৪. Hermaphroditism Complex: এদের দেহে নারী ও পুরুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ থাকে।
৫. Hermaphroditism Dimidite/Hermaphroditism Lateral: এদের দেহের একদিকে ডিম্বকোষ ও অপর দিকে অণ্ডকোষ থাকে।
৬. Hermaphroditism Transverse: এদের দেহে বাহ্যিকভাবে পুরুষের অঙ্গ থাকলেও অভ্যন্তরীণভাবে নারী অঙ্গ বৈশিষ্ট্য থাকে।
৭. Hermaphroditism Unilateral: এদের দেহের একদিকে অণ্ডকোষ বা ডিম্বকোষ এবং অপর দিকে ডিম্বকোষ বা অণ্ডকোষ থাকে।

মুসলিম আইনে হিজড়া সনাক্তকরণ পদ্ধতি আছে। সে অনুযায়ী হিজড়া নারী, পুরুষ বা দ্ব্যর্থ হতে পারে। প্রস্রাব নির্গত হওয়ার ধরণ যথা: অগ্রাধিকার ও পরিমাণ দ্বারা এদের সাধারণত সনাক্ত করা যায়। সে অনুযায়ী যার প্রস্রাব পুংলিঙ্গ দ্বারা নির্গত হয় সে পুরুষ এবং যার স্ত্রী লিঙ্গ দ্বারা হয় সে নারী। সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্রাব নির্গত হওয়ার অঙ্গটি হচ্ছে প্রকৃত অঙ্গ, অন্যটি একটি ত্রুটি। দুইটি অঙ্গ দ্বারা প্রস্রাব নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে দেখতে হবে কোনটি দ্বারা প্রথমে নির্গত হচ্ছে। প্রথমে নির্গত হওয়া অঙ্গটি হচ্ছে প্রকৃত অঙ্গ। যে ব্যক্তির কোনো একটি লিঙ্গ দ্বারা প্রথমে ও অপরটি দ্বারা পরে না হয়ে যদি উভয় লিঙ্গ দ্বারা সমানভাবে একই সময় অথবা কোনো একটি লিঙ্গ দ্বারা বেশি ও অপরটি দ্বারা কম না হয়ে সমানভাবে একই সময় উভয় মূত্রনালী দ্বারা সমান পরিমাণে প্রস্রাব নির্গত হয় সে ব্যক্তিকে খুন্‌সা মুস্‌কিল তথা দ্ব্যর্থ হিজড়া বলা হয়।[১০]

৪. বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা

বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যার কোনো সরকারি পরিসংখ্যান নাই। বিভিন্ন আদম শুমারিতে নারী ও পুরুষ গণনা হলেও হিজড়ার গণনা হয়নি। সংবাদ পত্রের তথ্য অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ৩০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০।[১১] সাধারণ গণনায় ঢাকায় অবস্থিত হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১৫,০০০।[১২] বাংলাদেশের ৪র্থ আদম শুমারি অনুযায়ী ২২ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে সমন্বয় সাধনের পর বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২,৯২,৪৭,২৩৩ ; পুরুষ ৬,৫৮,৪১,৪১৯ এবং নারী ৬,৩৪,০৫,৮১৪; প্রতি ১০৩.৮ জন পুরুষের অনুপাতে ১০০ জন নারী।[১৩]

৫. যৌন অক্ষমতা ও বন্ধ্যাত্ব

সহবাসের শারীরিক অক্ষমতাকে যৌন অক্ষমতা এবং সন্তান জন্মদানের অক্ষমতা বন্ধ্য হিসেবে পরিচিত। নিম্নবর্ণিত কারণে এরূপ হয়ে থাকতে পারে:

---

[৯] *Taber's Cyclopedic Medical Dictionay*. S.V. Hermaphrodite.

[১০] *Hedaya*, pp. 704-705.

[১১] সোলায়মান, পৃ. ৪৬৩।

[১২] মাহবুব, পৃ. ৫১।

[১৩] Bangladesh Bureau of Statistics. *Population Cencus 2001 Preliminary Report (আদম শুমারি ২০০১ প্রাথমিক রিপোর্ট)* (Dhaka: Statistical Division, Ministry of Planning, Government of Bangaldesh, August 2001), pp. 4-5.

১. বয়স,
২. বিকৃতি বা ত্রুটিপূর্ণ গঠন,
৩. স্থানীয় রোগ বা জখম বা ক্ষত,
৪. সাধারণ রোগ,
৫. মানসিক কারণ, এবং
৬. অসময়ে সহবাস।

৫.১. *বয়স*

এ অঞ্চলে মেয়েরা ১৩ বা ১৪ বছর বয়সে বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয়। এদের প্রথম দিকের ঋতুস্রাবের ডিম্ব পরিস্ফুটনে অসহায়ত্বের কারণে প্রায়ই বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। পুরুষের শেষ বয়সে সাধারণত যৌন অক্ষমতা দেখা দেয়। পুরুষ ১৫ বা ১৬ বছর বয়সে বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয়। এ সময়ে সে হয় বীর্যবান। পুরুষের ১৩ বা ১৪ বছর বয়সে সহবাস সম্ভব।

৫.২. *বিকৃতি বা ত্রুটিপূর্ণ গঠন*

জন্মগতভাবে নারীর গঠন ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। যোনিদ্বারের মুখ না থাকা। Labia লেপ্টে থাকা, সতীচ্ছেদ পুরু ও ছিদ্রহীন থাকা, ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ গঠনের অন্তর্ভুক্ত। পুরুষের লিঙ্গ না থাকা বা তার পর্যাপ্ত বৃদ্ধি না হওয়া, ইত্যাদি যৌন অক্ষমতার অন্যতম কারণ।

৫.৩. *স্থানীয় রোগ বা জখম বা ক্ষত*

গর্ভাশয়, ডিম্বাশয় বা ডিম্বনালীর অসুস্থতা বা যোনি থেকে এ্যাসিড নিঃসরণ অনেক সময় নারীর বন্ধ্যত্বের কারণ হতে পারে। পুরুষের প্রকাণ্ড একশিরা, অণ্ডকোষের হার্নিয়া, গোদ ইত্যাদি সহবাসে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

৫.৪. *সাধারণ রোগ*

মেয়েদের মেয়েলী অসুখ আর ছেলেদের ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা, ইত্যাদি স্থায়ী বা অস্থায়ী বন্ধ্যত্ব ঘটাতে পারে।

৫.৫. *মানসিক কারণ*

ঘৃণা, ভয়, আবেগ, উৎকণ্ঠা, স্নায়ুবিক বিকার, লজ্জা, বিরক্তি, ইত্যাদি বন্ধ্যত্ব ঘটাতে পারে।[১৪]

৫.৬. *অসময়ে সহবাস*

নারীর ঋতুচক্রের ৯ম দিনের আগে ও ২০তম দিনের পরে গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা কম। ফলে ঐ সময়ের সহবাসে গর্ভে সন্তান আসে না।[১৫]

৬. উত্তরাধিকার

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে তার ত্যক্ত সম্পত্তির জীবিত আত্মীয় স্বজনের মালিকানা অর্জনকে উত্তরাধিকার বলা হয়। বাংলাদেশের মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানের নিজ নিজ উত্তরাধিকার আইন আছে। এ সব আইনে অংশীদারের অগ্রাধিকারের নিয়মের মত আত্মীয়ের বঞ্চিত হওয়ার নিয়মও আছে। সনাতন হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি আত্মীয় স্বজনের বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। তবে এরকম কোনো কারণে মুসলিম আইনে কেউ বঞ্চিত হয় না। The Succession Act 1925-এও কেনো খ্রিস্টান বঞ্চিত হয় না। মুসলিম আইনে হিজড়ার উত্তরাধিকার বিষয়ক সুস্পষ্ট নিয়ম আছে। অন্য আইনে সুস্পষ্ট নিয়ম নাই। সব সময়ে বণ্টনের সাধারণ নিয়মে বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়।

---

[১৪] Halim, pp. 306-309; গাঙ্গুলী, পৃ. ৪০৩-৪০৫।
[১৫] *আজাদ*, পৃ. ১৯৫।

সকল সম্প্রদায়ে মূলধনীর মৃত্যুর সময়ের জীবিত ও অস্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা তার অংশীদার। ঐ সময়ের অংশীদারের প্রকৃতি ত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ নির্ধারণ করে। পরবর্তীকালীন কোনো পরিবর্তন অংশে পরিবর্তন ঘটায় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে উত্তরাধিকার-সূত্রে হিজড়ার সম্পত্তি অর্জনসহ বণ্টন বিষয়ক প্রাসঙ্গিক নিয়ম নিম্নে আলোচিত হলো:

৬.১. *মুসলমান*

মুসলমানের উত্তরাধিকার আইনের মূল ভিত্তি হলো পবিত্র কোরান। এখানে অংশীদারের মধ্যে অংশের পরিমাণ ও অগ্রাধিকারের নীতি বর্ণিত হয়েছে যা ত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে। বণ্টনে হাদিসসহ ইসলামি আইনবিদ ও পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাও প্রয়োগ হয়ে থাকে। অংশ বণ্টনে তাসিব নীতি প্রয়োগ হয় যার অর্থ বৈপিত্রেয় সম্পর্কের নারী ও পুরুষ যেমন বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন এবং অন্য দুই একটি ক্ষেত্র ব্যতীত সকল সময় পুরুষের অংশ নারীর অংশের দ্বিগুণ। ফলস্বরূপ সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের অংশ অনুরূপ বোনের দ্বিগুণ। প্রত্যেক নারী ও পুরুষ ত্যক্ত সম্পত্তি বা তার অংশ প্রাপ্ত হয়। সুন্নি ও শিয়া নিয়মে অগ্রাধিকারে একত্রে স্বামী বা স্ত্রী এবং পিতা, মাতা, পুত্র ও কন্যা ত্যক্ত সম্পত্তি পেয়ে থাকে। প্রত্যেক অংশীদারের ভগ্নাংশ আকারে অংশ বরাদ্দ আছে। প্রয়োজনে তা সমন্বয় করা হয়।

মুসলমান সুন্নি ও শিয়া মতবাদে বিভক্ত। এ উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমান সুন্নি । এবং অধিকাংশ সুন্নি হানাফী। ফলে অনুমান করা হয় প্রায় সকল সুন্নি হানাফী নিয়মে শাসিত।[১৬] ইসলামী পণ্ডিতগণ উত্তরাধিকার বিষয়ে হিজড়াদের প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা পুরুষ ও নারী হিজড়া এবং দ্ব্যর্থ হিজড়া।

স্বাভাবিক নারী ও পুরুষের মতো দ্ব্যর্থ হিজড়ার উত্তরাধিকার নীতি মুসলিম আইনে অত্যন্ত পরিষ্কার। পুরুষ হিজড়া বা নারী হিজড়ার বণ্টনে পৃথক কোনো নীতি নেই। হিজড়াকে পুরুষ বা নারী হিসেবে সনাক্ত করা গেলে সে পুরুষ বা নারী গণ্যে অংশ পাবে।

৬.১.১. *দ্ব্যর্থ হিজড়ার উত্তরাধিকার*

ইসলামি পণ্ডিত ও আইনবিদ যথা আবু হানিফা, ইমাম মোহাম্মদ, আবু ইউসুফ, প্রমুখের মতামত ও ব্যাখ্যা দ্বারা হিজড়ার উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাদের মতে হিজড়া একজন নারীর সম পরিমাণ অংশ পাবে। তবে তাকে নারী বা পুরুষ ধরলে যাতে তার অংশ অপেক্ষাকৃত কম হয় তাই সে পাবে।[১৭]

উদাহরণ: কোনো ব্যক্তি এক পুত্র ও এক হিজড়া সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করলে আবু হানিফার মতে তার ত্যক্ত সম্পত্তি তিন ভাগে বিভক্ত হবে যার দুই ভাগ পাবে পুত্র এবং এক ভাগ হিজড়া সন্তান। তাঁর মতে হিজড়া নারী শ্রেণীভুক্ত। পক্ষান্তরে ব্যাখ্যাকারক শোব্বাইয়ার মতে এরূপ ক্ষেত্রে হিজড়া একজন পুরুষ অংশীদারের অর্ধেক এবং একজন নারী অংশীদারের অর্ধেক পাবে। এজন্য একবার তাকে পুরুষ এবং একবার নারী হিসেবে বণ্টন করে উভয় বণ্টনের অংশের সম্পত্তির অর্ধেক প্রদান করতে হবে।

---

[১৬] M. Hidayatullah, *Mulla Principles of Mahomedan Law*, 18th ed. (Bombay: N.M. Tripathi Private Ltd. 1977), p. 27.

[১৭] *Hedaya*, pp. 706-707; এ,কে,এম, মনিরুজ্জামান ও মিসেস মেহের জামান, *ফারায়েজ আইন (মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান) এবং সাকসেসন এ্যাক্ট, ১৯২৫* (ঢাকা : সামছ পাবলিকেশন্স, ২০০১), পৃ. ১০১-১০২।

১. পুরুষ হিসেবে বণ্টন

পুত্র	$^{১}/_{২}$	$= {}^{৩}/_{৬}$
হিজড়া (পুত্র)	$^{১}/_{২}$	$= {}^{৩}/_{৬}$

২. নারী হিসেবে বণ্টন

পুত্র	$^{২}/_{৩}$	$= {}^{৪}/_{৬}$
হিজড়া (কন্যা)	$^{১}/_{৩}$	$= {}^{২}/_{৬}$

উপরের উভয় বণ্টনে হিজড়ার অংশ $^{৩}/_{৬} + {}^{২}/_{৬} = {}^{৫}/_{৬}$

যার অর্ধেক $^{৫}/_{১২}$; হিজড়া পাবে $^{৫}/_{১২}$ এবং পুত্র $^{৭}/_{১২}$ ভাগ।

আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ এ অভিমত সমর্থন করেছেন। তবে অংশ বণ্টনে তাদের নিজ নিজ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন সম্পূর্ণ সম্পত্তি ১২ ভাগে বিভক্ত হবে যার ৭ ভাগ পাবে পুত্র এবং ৫ ভাগ হিজড়া। এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা হলো হিজড়াকে পুত্র ধরলে সম্পত্তি দুইভাগে বিভক্ত হয় যার একভাগ ($^{১}/_{২}$ অংশ) পায় পুত্র এবং অপর ভাগ ($^{১}/_{২}$ অংশ) হিজড়া। অপর দিকে হিজড়াকে কন্যা ধরলে সম্পত্তি তিনভাগে বিভক্ত হয় যার দুই ভাগ ($^{২}/_{৩}$ অংশ) পায় পুত্র এবং একভাগ ($^{১}/_{৩}$ অংশ) হিজড়া। এতে দেখা যায় ত্যক্ত সম্পত্তি একবার দুইভাগ ও আর একবার তিন ভাগে বিভক্ত হয় এবং সম্পত্তির বৃহৎ বিভক্তি হয় ২×৩ = ৬ ; প্রথমের পুরুষ গণ্যের বণ্টনে সম্পত্তি দুই ভাগে [($^{১}/_{২}$) = $^{৩}/_{৬}$ + ($^{১}/_{২}$) = $^{৩}/_{৬}$] বিভক্ত হয় যার $^{৩}/_{৬}$ পায় পুত্র এবং $^{৩}/_{৬}$ হিজড়া। শেষের নারী গণ্যের বণ্টনে সম্পত্তি তিন ভাগে [($^{২}/_{৩}$) = $^{৪}/_{৬}$ + ($^{১}/_{৩}$) = $^{২}/_{৬}$] বিভক্ত হয় যার $^{৪}/_{৬}$ পায় পুত্র ও $^{২}/_{৬}$ হিজড়া । উভয় বণ্টনে হিজড়ার সর্বনিম্ন অংশ হচ্ছে $^{২}/_{৬}$ ভাগ যা প্রশ্নের সম্মুখীন নয়। সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার বণ্টনে হিজড়া যে ($^{৩}/_{৬}$ - $^{২}/_{৬}$) = $^{১}/_{৬}$ ভাগ বেশি পেতো তা তাকে পুরোপুরি দেওয়া হচ্ছে না। কারণ তাতে বেশি দেওয়ার প্রশ্ন থাকে, এ জন্য ঐ অংশের ($^{১}/_{৬}$) অর্ধেক অর্থাৎ ($^{১}/_{৬} \div {}^{১}/_{২}$) = $^{১}/_{১২}$ ভাগ হিজড়াকে অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে। এতে তার অংশের পরিমাণ হয় [($^{২}/_{৬}$) = $^{৪}/_{১২}$ + $^{১}/_{১২}$] = $^{৫}/_{১২}$; বণ্টনের এ প্রক্রিয়াতে সম্পত্তি ১২ ভাগে বিভক্ত হচ্ছে যার ৫ ভাগ পায় হিজড়া এবং ৭ ভাগ পুত্র।

আবু ইউসুফ বলেছেন এক্ষেত্রে সম্পত্তি ৭ ভাগে বিভক্ত হবে যার ৪ ভাগ পাবে পুত্র এবং ৩ ভাগ হিজড়া। তাঁর বক্তব্য হলো পুত্র একা হলে সে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তথা $^{৪}/_{৪}$ অংশ এবং হিজড়া একা হলে হিজড়া $^{৩}/_{৪}$ অংশ পেতো। হিজড়ার $^{৩}/_{৪}$ অংশ প্রাপ্তির বণ্টনে তিনি বলেছেন হিজড়া যখন একা তখন পুরুষ হিসেবে সে পায় অর্ধেক অর্থাৎ $^{২}/_{৪}$; এবং নারী হিসেবে সে পায় পুরো অর্থাৎ $^{৪}/_{৪}$; উভয়ের সমষ্টি ($^{২}/_{৪}$ + $^{৪}/_{৪}$) = $^{৬}/_{৪}$ । $^{৬}/_{৪}$ এর $^{১}/_{২}$ হবে $^{৩}/_{৪}$। তাঁর মতে ত্যক্ত সম্পত্তিতে একজন পুত্র ও একজন হিজড়ার অংশের পরিমাণ $^{৪}/_{৪}$ + $^{৩}/_{৪}$ = $^{৭}/_{৪}$; সমন্বয় সাধনে লবের সমান হর হলে যা হয় $^{৭}/_{৭}$; এতে পুত্র পায় $^{৪}/_{৭}$ এবং হিজড়া $^{৩}/_{৭}$ ভাগ। এ নিয়মে সম্পত্তিকে ৭ ভাগে বিভক্ত করে পুত্রকে দেয়া হয় ৪ ভাগ এবং হিজড়াকে ৩ ভাগ।

উদাহরণ: একজন ব্যক্তি একপুত্র, এক কন্যা ও এক হিজড়া সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। বণ্টন হবে নিম্নরূপ:

পুত্র	: $^{২}/_{৪}$
কন্যা	: $^{১}/_{৪}$
হিজড়া (কন্যা)	: $^{১}/_{৪}$

হিজড়া সন্তানকে কন্যা ধরা হয়েছে। পুত্র ধরা হলে তার অংশ হতো $^{২}/_{৫}$, পুত্রের $^{২}/_{৫}$ এবং কন্যার $^{১}/_{৫}$; তাতে তার অংশ হতো পুত্রের সমান এবং কন্যার দ্বিগুণ। ফলে তার অংশ বেশি হতো এবং অন্যদের কম হতো। ন্যূনতম অংশ দেওয়ার জন্য তাকে কন্যা গণ্য করা হয়েছে।[১৮]

অধস্তন বংশধর ব্যতীত অন্য হিজড়া আত্মীয়ের অংশ প্রাপ্তি বিষয়ে আবু হানিফা সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। তাঁর মতে হিজড়াকে নারী গণ্য করে অংশ দিতে হবে। তবে তাতে তার অংশ বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তাকে পুরুষ গণ্য করতে হবে।[১৯]

উদাহরণ: একজন মহিলা তার স্বামী, মা ও একজন হিজড়া (সহোদর বোন) রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। বণ্টন হবে নিম্নরূপ:

স্বামী	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$
মা	: $^{১}/_{৩} = {}^{২}/_{৬}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$ অবশিষ্টাংশ

হিজড়াকে এখানে সহোদর ভাই গণ্য করা হয়েছে। এবং অবশিষ্টাংশ দেওয়া হয়েছে। তাকে বোন ধরলে বণ্টন হতো নিম্নরূপ ঃ

স্বামী	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$	বৃদ্ধি	: $^{৩}/_{৮}$
মা	: $^{১}/_{৩} = {}^{২}/_{৬}$	নীতি	: $^{২}/_{৮}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$	প্রয়োগে	: $^{৩}/_{৮}$
	$^{৮}/_{৬}$		$^{৮}/_{৮=১}$

এতে অন্য অংশীদার যথা স্বামী ও মায়ের অংশ হ্রাস পেতো এবংহজড়ার অংশ বেশি হতো।[২০] ন্যূনতম অংশ দেওয়ার জন্য তাকে ভাই ধরা হয়েছে।

উদাহরণ: একজন ব্যক্তি তার ১ স্ত্রী, ২ বৈপিত্রেয় ভাই এবং একজন হিজড়া (সহোদর বোন) রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। বণ্টন হবে নিম্নরূপ :

স্ত্রী	: $^{১}/_{৪} = {}^{৩}/_{১২}$
২ বৈপিত্রেয় ভাই	: $^{১}/_{৩} = {}^{৪}/_{১২}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{৫}/_{১২}$ অবশিষ্টাংশ

হিজড়াকে এখানে সহোদর ভাই গণ্য করা হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ দেওয়া হয়েছে।[২১] তাকে বোন ধরলে বণ্টন হতো নিম্নরূপ:

স্ত্রী	: $^{১}/_{৪} = {}^{৩}/_{১২}$	বৃদ্ধি	: $^{৩}/_{১৩}$
২ বৈপিত্রেয় ভাই	: $^{১}/_{৩} = {}^{৪}/_{১২}$	নীতি	: $^{৪}/_{১৩}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{১}/_{২} = {}^{৬}/_{১২}$	প্রয়োগে	: $^{৬}/_{১৩}$
	$^{১৩}/_{১২}$		$^{১৩}/_{১৩=১}$

---

[১৮] জামান, পৃ. ১০১; বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর, *আল-হিদায়া*, চতুর্থ (শেষ) খণ্ড, আবু তাহের মেজবাহ্ ও ইসহাক ফরিদী (অনুবাদ), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), পৃ. ৫৯৩-৫৯৪।

[১৯] *Hedaya*, pp. 706-707.

[২০] *আল হিদায়া*, চতুর্থ (শেষ) খণ্ড, পৃ. ৫৯৪।

[২১] *প্রাগুক্ত।*

হিজড়াকে বোন ধরা হলে অন্য সকল অংশীদারের অংশ হ্রাস পেতো, তার অংশ বেশি হতো, ফলে তাকে ভাই ধরা হয়েছে।

উদাহরণ: এক মহিলা তার স্বামী, মা, একজন বৈপিত্রেয় বোন ও একজন হিজড়া (সহোদর বোন) রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। বণ্টন হবে নিম্নরূপ :

স্বামী	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$	
মা	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$	
বৈপিত্রেয় বোন	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$	
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$	অবশিষ্টাংশ
	$^{৬}/_{৬=১}$	

হিজড়াকে এখানে সহোদর ভাই গণ্যে অবশিষ্টাংশ দেওয়া হয়েছে। তাকে বোন ধরলে বণ্টন হতো নিম্নরূপ:

স্বামী	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$	বৃদ্ধি	: $^{৩}/_{৮}$
মা	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$	নীতি	: $^{১}/_{৮}$
বৈপিত্রেয় বোন	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$	প্রয়োগে	: $^{১}/_{৮}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$		: $^{৩}/_{৮}$
	$^{৮}/_{৬}$		$^{৮}/_{৮=১}$

হিজড়াকে বোন হিসেবে বণ্টন করতে গেলে তার অংশ বেশি হতো, অন্যদের কম হতো, সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হতো। ফলে তাকে ভাই ধরা হয়েছে।[২২]

৬.২. *হিন্দু, বৌদ্ধ*

হিন্দু উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রের জন্য হিন্দু আইনের প্রধান দুই মতবাদ হলো মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ। বাংলাদেশে প্রচলিত আছে দায়ভাগ মতবাদ। বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারও হিন্দু আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[২৩] ত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের নিরঙ্কুশ ও নারীর সীমিত স্বত্ব ও স্বার্থ সৃষ্টি হওয়া সনাতন হিন্দু আইনের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। সে অনুযায়ী কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পেলে সে তাতে পুরোপুরি মালিকানা অর্জন করে। নারী যতদিন জীবিত থাকে ততদিন ঐরূপে প্রাপ্ত সম্পত্তি সে দখল ভোগ করে। তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি যার কাছ থেকে সে পেয়েছিল তার অন্য অংশীদারের মধ্যে বণ্টিত হয়। এ সম্পত্তিতে নারীর নিরঙ্কুশ স্বত্ব ও অধিকার অর্জিত হয় না। হিন্দু আইনে অধিকার বঞ্চিতের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। যথা: (১) অসতীত্ব, (২) শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি, এবং (৩) হত্যা। অসতীত্বের কারণে মিতাক্ষরা মতবাদ অনুযায়ী কেবল মূলধনীর বিধবা স্ত্রী বঞ্চিত হয়। দায়ভাগে ঐরূপ বিধবা স্ত্রীর পাশাপাশি অন্য নারী অংশীদার যথা মা, কন্যাও বঞ্চিত হয়। হিন্দু আইনে শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। বরং এজন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট শারীরিক বা মানসিক অবস্থা উল্লিখিত হয়েছে। যথা: (১) অনিরাময়যোগ্য জন্মগত অন্ধত্ব, বধিরতা এবং বাকশক্তিহীনতা, (২) জন্মগত অঙ্গহীনতা অর্থাৎ খোঁড়া এবং নাক ও জিহ্বা না থাকাসহ জন্মগত যৌন অক্ষমতা, (৩) উন্মত্ততা (Lunacy), জড়মতিত্ব (Idiocy), ইত্যাদি।[২৪] মূলধনীকে হত্যা করাও

---

[২২] জামান, পৃ. ১০১।

[২৩] করতালাল বিহার বনাম এইচ আর চৌধুরী *৪০ ডি এল আর* (আ বি) ১৩৭।

[২৪] Sunderlal T. Desai, *Mulla Principles of Hindu Law* (Bombay : N.M. Tripathi Private Limited, 1986). p.178; Satyajeet A Desai, *Mulla Principles of Hindu Law*, Vol. I, 17th ed. (New Delhi: Butterworths, 1999), p.191.

অধিকার বঞ্চিতের অন্যতম একটি কারণ। একারণে হত্যাকারীসহ তার মাধ্যমে দাবিদার অন্যরাও বঞ্চিত হয়।[২৫] সনাতন হিন্দু আইনে জন্মগত যৌন অক্ষমতার কারণে যেমন পুরুষ বঞ্চিত হয় বন্ধ্যত্বের কারণে তেমন নারী যথা কন্যাও বঞ্চিত হয়।[২৬]

ব্রিটিশ আমলে এ উপমহাদেশে The Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act, 1928[২৭] -এর মাধ্যমে প্রচলিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইন থেকে শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির কারণে বঞ্চিত করণের নীতি বিলুপ্ত করার চেষ্টা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ আইনে সীমাবদ্ধতা ছিল। এ আইন দ্বারা জন্মগত উন্মত্ততা এবং জড়মতিত্বকে বঞ্চিত করণে অযোগ্য গণ্য করা হয়নি। উপরন্তু আইনটিকে দায়ভাগ মতবাদে অপ্রযোজ্য রাখা হয়।[২৮] ফলে বাংলাদেশের হিন্দুদের বঞ্চিতকরণের প্রধান কারণগুলো বহাল থেকে যায়। মানসিক বা শারীরিক ত্রুটির কারণে উত্তরাধিকার বঞ্চিত ব্যক্তিরা অবশ্য খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী।

The Hindu Succession Act, 1956 কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম বঙ্গে দায়ভাগ এবং পশ্চিম বঙ্গ ব্যতীত ভারতের অন্য সকল স্থানে মিতাক্ষরা নীতি প্রচলিত ছিল। ১৯৫৬ সালের আইনটি চালু হওয়ায় সনাতন হিন্দু আইন ভারতে এখন অকার্যকর।

The Hindu Succession Act, 1956 দ্বারা শারীরিক ও মানসিক দিকের বঞ্চিত করণের সব কারণকে অযোগ্য করা হয়েছে। এ আইনে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া অন্য কোনো অসুখ, খুঁত, অঙ্গ বিকৃতি, ইত্যাদিতে কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকার বঞ্চিত হয় না। ঐ আইনের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ:

অসুখ, খুঁত ইত্যাদি অযোগ্য করবে না: কোনো ব্যক্তি কোনো অসুখ, খুঁত বা অঙ্গ বিকৃতিতে, অথবা এ আইনে উল্লিখিত কোনো কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে, অথবা অন্য কোনো কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য হবেন না।[২৯]

১৯৫৬ সালের উত্তরাধিকার আইনে বঞ্চিত করণের কিছু কারণ উল্লিখিত হয়েছে। যথা: উত্তরাধিকার শুরু হওয়ার পূর্বে কোনো কোনো বিধবার পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হওয়া[৩০] মূলধনীকে খুন করা[৩১] ধর্মান্তরিতের অহিন্দু পুত্র হওয়া[৩২] ইত্যাদি। এ আইনের কারণে শারীরিক, নৈতিক বা অন্য কোনো কারণে এখন আর কেউ বঞ্চিত হয় না।[৩৩] তবে হিজড়া প্রসঙ্গে এ আইনে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি এবং হিজড়াকে বঞ্চিতকরণে কোনো কারণ উল্লিখিত হয়নি। ফলে হিজড়া অংশ পাওয়ার অযোগ্য নয়।

৬.২. *খ্রিস্টান*

বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার The Succession Act, 1925 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ আইনে উত্তরাধিকার বিষয়ে অংশীদারের অগ্রাধিকার ব্যতীত নারী পুরুষে অংশের পার্থক্য দেখা যায় না। ফলে পুত্র ও কন্যার মতো ভাই ও বোন এক সাথে পায়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এরা সমান অংশ পায়। অধস্তন বংশধরের মধ্যে বণ্টনে সন্তান পদটি পুত্র কন্যায় বিভেদ করেনি। বরং পুত্র ও কন্যার

---

[২৫] Kenchava v. Girimallappa (1924). *51 I.A.* 368.

[২৬] T. Desai. p. 172.

[২৭] Act No. XII of 1928.

[২৮] *The Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act, 1928*, Section 1(3). 2.

[২৯] *The Hindu Succession Act, 1956* (Act No. XXX of 1956). Section 28.

[৩০] *তদেব*, ধারা ২৪।

[৩১] *তদেব*, ধারা ২৫।

[৩২] *তদেব*, ধারা ২৬।

[৩৩] Dr. Tahir Mahmood, *Hindu Law*, 2nd ed. (Allahabad: The Law Book Company (P) Ltd. 1986). pp. 135-137.

মধ্যে সমানভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা দিয়েছে।[৩৪] অন্য আরীয়ের মধ্যের বণ্টনে পুরুষ ও নারী চিহ্নিত করণের সুস্পষ্ট পদ যথা ভাই, বোন, ইত্যাদি ব্যবহৃত হলেও নারী ও পুরুষ ভেদে অংশের পরিমাণে কোনো তারতম্য করা হয়নি। মূলত নারী পুরুষ ভেদে এ আইনে বণ্টন অনুপস্থিত। সন্তান (পুত্র, কন্যা, নিম্নগামী পুত্র কন্যা), ভাই বোন, পিতা মাতা ব্যতীত অন্যদের মধ্যেও সমানভাবে একই নীতিতে সম্পত্তি বণ্টিত হয়।[৩৫] এ আইনে হিজড়া প্রসঙ্গে পৃথকভাবে কিছু বলা হয়নি। ফলত ধারণাটি এ আইনে অপ্রচলিত। অংশের ক্ষেত্রে নারী পুরুষে বিভেদ না থাকায় মূলধনীসহ তার পিতা মাতা বা অন্য কোনো আরীয়ের হিজড়া সন্তানকে অংশ প্রদানে কোন অসুবিধা নেই। তারা তা পেতে পারে।

৭. হিজড়ার অধিকারের তুলনামূলক আলোচনা ও সুপারিশ

সৃষ্টি বৈচিত্র্যে স্বাভাবিক নারী ও পুরুষ থেকেই হিজড়ার জন্ম। মাতৃ ও পিতৃকুলে তার সব রকমের আত্মীয় থাকে। জ্ঞাতসারে হিজড়ার বিবাহ হয় না বলে তার স্বামী বা স্ত্রী থাকে না। তার সন্তানাদি হয় না। হিজড়ার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আছে। পারস্পরিক অধিকারে হিজড়ার মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ে অংশ পাওয়ার তথা বণ্টন সংক্রান্ত পরিষ্কার কোনো নিয়ম নেই। সনাতন হিন্দু আইনসহ The Succession Act, 1925 এ হিজড়ার কোনো ধারণা প্রচলিত নেই। উপরন্তু হিন্দু আইনে সন্তান জন্মদানে অক্ষম ব্যক্তির অধিকার প্রত্যাখ্যাত আছে। হিন্দু আইনে অধিকারগত দিক থেকে পরিপূর্ণ নারী পুরুষেও ব্যাপক পার্থক্য আছে। নগণ্য সংখ্যক নারীর অধিকার সীমিতভাবে এখানে স্বীকৃত হলেও তারা অগ্রাধিকারে সম্মুখে নেই। অবশ্য যারা পায় তারা জীবন স্বত্বে এবং একাধিক হলে সমান সমান অংশে পায়। অন্যান্য কারণের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির কারণেও একজন হিন্দু আইনে বঞ্চিত হয়। ভারতে সনাতন নিয়মের স্থলে The Hindu Succession Act, 1956 চালু হয়েছে যা নারীর নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদানসহ হিজড়ার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যথা অসুখ, খুঁত, অঙ্গবিকৃতি ইত্যাদিকে উত্তরাধিকার বঞ্চিতের কারণ গণ্য করাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে এ আইনে হিজড়ার কারণে কারো বঞ্চিত না হওয়ার অবস্থা অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু অগ্রাধিকারে কোন স্থানে এদের অবস্থান তা স্পষ্ট নয়।

মুসলিম আইনে হিজড়ার অধিকার সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অংশে পার্থক্য থাকায় এখানে তাকে ন্যূনতম অংশ দেওয়া হয়েছে। এদের দাবি অন্যের অংশে ঘাটতি সৃষ্টি করে না। মুসলিম আইনে ও The Succession Act, 1925 এ সম পর্যায়ের নারী পুরুষ অংশ পেলে এক সাথে পায়। যেমন পুত্র কন্যা, ভাই বোন ইত্যাদি। সনাতন হিন্দু আইনে অগ্রাধিকারে পুরুষ ও নারীতে এরূপ সমতা নাই। The Succession Act, 1925 এ হিজড়ার বঞ্চিত হওয়ার সুস্পষ্ট কোনো বিধান এবং নারী পুরুষে অংশের পার্থক্য না থাকায় তারা আইনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। সম পর্যায়ের নারী বা পুরুষের সাথে তারা সমান অংশ পেতে পারে। বাংলাদেশে হিন্দু পরিবারের অবহেলিত সদস্যের উন্নয়নে কেবল হিন্দু আইনের সংস্কার হয়নি। দেশের সাধারণ আইনের সংস্কারের ফলে তারা কিছু সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু বৃহৎ হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশ ভারত হিন্দু স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় আইন সংস্কার করে চলেছে। উত্তরাধিকার বঞ্চিতকরণের অন্যতম কারণ অসুখ, খুঁত, অঙ্গ বিকৃতিকে বঞ্চিত করণের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করেছে। সীমিত স্বত্বের স্থলে নারীর নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়েছে। বিবাহে যৌতুক নিষিদ্ধ হওয়ায় নারীর জন্য উত্তরাধিকারে স্বত্ব সৃষ্টিমূলক আইন থাকা প্রয়োজন। হিন্দু আইন প্রযোজ্য সম্প্রদায়সমূহের পিছন থেকে সামনে আসা উচিত। উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য আলো প্রয়োজন। সংস্কারের কারণে কি ভারত অগ্রগতিতে পিছিয়েছে? বিশ্ব পরিবারে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কি তার মর্যাদা বাড়েনি? উত্তরাধিকার বঞ্চিতের খোরপোশ পাওয়ার অধিকার কি মূল সম্পত্তিকে দায়বদ্ধ করে না?

---

[৩৪] *The Succession Act, 1925*, Sections 36-40.

[৩৫] *তদেব*, ধারা ৪১-৪৮।

ত্রুটিপূর্ণ মানব সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা প্রয়োজন। হিজড়াকে প্রতিবন্ধী গণ্য করে তার অধিকার সৃষ্টি ও সুযোগ সুবিধা প্রদানে প্রয়োজনীয় আইন প্রণীত হতে পারে। উত্তরাধিকার পারস্পরিক অধিকার। হিজড়ার সম্পত্তি অন্যরা পায়। অন্যের সম্পত্তি পাওয়াও হিজড়ার অধিকার। সরকার আইন সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

৮. উপসংহার

একজন মানুষ নারী থাকে। একজন মানুষ পুরুষ থাকে। সৃষ্টি বৈচিত্র্যে আবার কখনো একজন মানুষ নারী থাকে না, পুরুষ থাকে না। কারো দেহে একই সাথে থাকে নারী ও পুরুষের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। আবার কখনো এ বৈশিষ্ট্য হয় অত্যন্ত অস্পষ্ট। এদের সংখ্যা কম। এরা স্বল্প। বিরল। এরা হিজড়া। এরা মানব সমাজে সংখ্যালঘু। সাধারণ নারী বা পুরুষের মতো এদের স্বাভাবিক জীবন থাকে না। এরা সন্তান জন্মদানে অক্ষম। দৈহিকভাবে এদের মতো না হওয়া সত্ত্বেও আবার কোনো নারী বা কোনো পুরুষ সন্তান জন্মদানে অক্ষম। এদের মাতা, পিতা, আত্মীয় স্বজন থাকে। অধস্তন বংশধর থাকে না। হিজড়ার ত্যক্ত সম্পত্তি সহজে অন্যদের মধ্যে বণ্টিত হয়। কিন্তু অন্যের সম্পত্তিতে এদের অংশীদারিত্ব সহজ নয়। উত্তরাধিকারের অধিকার পারস্পরিক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত বিধায় মুসলিম আইনে হিজড়ার পরিষ্কার উত্তরাধিকার স্বীকৃত। তারা ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পায়। সনাতন হিন্দু আইনে সেরূপ বিধান নেই। বরং সেখানে শারীরিক ত্রুটির কারণে তারা বঞ্চিত। ভারতে ১৯৫৬ সালে সনাতন উত্তরাধিকার আইনে সংস্কার আনা হয়েছে। ঐ আইনে কোনো শারীরিক বা মানসিক ত্রুটি বঞ্চিত করণের জন্য এখন আর কোনো কারণ নয়। The Succession Act, 1925 হিজড়া বিষয়ে নিশ্চুপ। তবে ঐ আইনে অংশ বণ্টনে নারী ও পুরুষে কোনো অংশগত পার্থক্য নেই। সহজে এ আইনে হিজড়াকে সম্পত্তি দেওয়া যেতে পারে। স্বাভাবিক নারী পুরুষের মতো তারা তা পেতে পারে। বাংলাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন আদম শুমারিতে এ পর্যন্ত হিজড়া গণনা করা হয়নি। পরিসংখ্যানে এ বিষয়ে কোন রিপোর্ট নেই। নারী ও পুরুষের মতো হিজড়ার পরিসংখ্যান থাকা উচিত। এছাড়া পরিপূর্ণ নারী বা পুরুষে রূপান্তরের লক্ষ্যে সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসা প্রদানসহ সকল সম্প্রদায়ে এদের পরিষ্কার উত্তরাধিকার নীতি এবং সে অনুযায়ী ত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে এদের অধিকার সচেতনতা করাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য অন্যান্যসহ সরকারের সঠিক পদক্ষেপ ও তৎপরতা কাম্য।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

সামাজিক পুঁজি হিসেবে জ্ঞাতিসম্পর্কের ব্যবহার : মুণ্ডা সম্প্রদায়ের উদাহরণ

মোঃ জাহাঙ্গীর কবির*

Abstract: Munda is one of the minor communities of Bangladesh, belonging a separate culture and tradition that helps to indentify them as indigenous community. Although they live in poverty situation, they have higher level of social capital, social network, trust and norms, which helps them to live across the miserable situation jointly. Kinship is a resource of Munda life.

ভূমিকা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে মুণ্ডা অন্যতম। এদের অধিকাংশের বাস রাজশাহী, সিলেট ও খুলনা বিভাগের কয়েকটি জেলায়। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ছিল ৩,১৪,০০০ জন। তবে উত্তরবঙ্গ আদিবাসী পরিষদের নেতাদের দাবি অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে ৩০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মোট সংখ্যা ১৫ লক্ষ জন।[১] ১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে ২১৩২ জন মুণ্ডা বসবাস করে। অন্য একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া ও সিলেট জেলাসমূহে এদের সংখ্যা ২৫,০০০ উল্লেখ করা হয়েছে।[২] আদমশুমারিতে মুণ্ডাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ধরে গণনা করা হয়েছে। তাই এদের সংখ্যা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। তবে রাজশাহী বিভাগে মুণ্ডাদের মোট জনসংখ্যা আনুমানিক দশ হাজার হবে বলে অনুমান করা যেতে পারে। এদের নিজস্ব ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতি রয়েছে, যা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে নেই। উল্লিখিত স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এদের আলাদা আত্মপরিচয়ে চিহ্নিত করে ।

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, আই. বি. এস., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] মেসবাহ কামাল, "গণতন্ত্র, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নাগরিক সমাজ: প্রেক্ষিত উত্তরবঙ্গ" *দৈনিক সংবাদ* ও এডাব আয়োজিত "গণতন্ত্র, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার ও নাগরিক সমাজ " শীর্ষক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ২৯শে জুন ২০০২, পৃ. ১।

[২] Father Stephen Gomes, "Tribal Identity, Places, They Live and Their Numerical Strength in Bangladesh" in Gomes, Father Stephen, Paul Dicosta, Azam Khan and Sanjeeb Drong, eds., "The Indegenous People Thirst for Solidarity". Unpublished Report (CARITAS, Bangladesh: COMDECA, 1995), p.3.

সাংস্কৃতিক যেসব স্বাতন্ত্র্য হিন্দুদের থেকে মুণ্ডাদের আলাদা করে রেখেছে তার মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্ক অন্যতম। সামাজিক সংস্কৃতি বা সামাজিক কাঠামোর একটি প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জ্ঞাতিসম্পর্ক। মূলত রক্ত, বিবাহ এবং পাতানো সম্পর্কের ভিত্তিতে জ্ঞাতিসম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিক রক্তকে জ্ঞাতিসম্পর্কের একমাত্র উপাদান বলেছেন।[৩] অন্যদিকে, অনেকে বিবাহ ও পাতানো সম্পর্ককে জ্ঞাতিত্বের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী।[৪] সাধারণত লক্ষ করা যায় যে, জ্ঞাতিসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে, যেমন—যে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের জাল সুদৃঢ়, সে সমাজে পরস্পরের প্রতি গভীর বিশ্বাস, সহযোগিতামূলক মনোভাব ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকে। অন্যদিকে যে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত দুর্বল, সেখানে অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও শোষণ প্রভৃতির উপস্থিতি দেখা যায়। পরস্পরের প্রতি গভীর বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, সহযোগিতামূলক মনোভাব ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টাকে সাম্প্রতিককালে "সামাজিক পুঁজি" বলে মনে করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞাতিসম্পর্ককেও সামাজিক পুঁজি অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। এই সামাজিক পুঁজির উপর ভিত্তি করেই সমাজের বাসিন্দারা একত্র হয় এবং সমষ্টিগতভাবে উন্নতি লাভ করে। একটি অনগ্রসর, প্রাচীন সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতি নির্ভর মুণ্ডা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এ যুক্তি কতটুকু সত্য তা গবেষণার দাবি রাখে। জ্ঞাতিসম্পর্কের উপর বাংলাদেশে অনেক গবেষণা করা হলেও সামাজিক পুঁজি হিসেবে মুণ্ডাদের জ্ঞাতিসম্পর্কের ব্যবহার বিষয়টির উপর কোনো গবেষণা করা হয়নি। অথচ এ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর যুগে মুণ্ডারা তাদের সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ধরে রাখার উপায় হিসেবে জ্ঞাতিসম্পর্ককে যেভাবে কাজে লাগায়, তা অবশ্যই আগ্রহব্যঞ্জক একটি বিষয়, যা সামাজিক পুঁজি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মুণ্ডাদের এই জ্ঞাতিসম্পর্ক সামাজিক পুঁজির মতোই তাদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর কোনো ভূমিকা রাখে কিনা, তা গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে।

আলোচ্য নিবন্ধে মুণ্ডাদের জ্ঞাতিসম্পর্ক ও তার ধরন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জ্ঞাতিসম্পর্ক আলোচনায় জ্ঞাতি বলতে রক্ত সম্পর্কিত, বৈবাহিক সম্পর্কিত ও পাতানো সম্পর্কিত জ্ঞাতিতে বর্গীকরণ করে আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মুণ্ডা সম্প্রদায়কে খানা, পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজ প্রভৃতি এককে বিভক্ত করে প্রতিটি এককের মধ্যে জ্ঞাতির উপরোক্ত শ্রেণীর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত মুণ্ডাদের জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে, সামাজিক পুঁজি হিসেবে জ্ঞাতিসম্পর্কের ব্যবহার বিশ্লেষণ করা এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। প্রসঙ্গত প্রবন্ধের দাবি অনুসারে মুণ্ডাদের পরিচয় ও গবেষণা এলাকার বিবরণ এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

---

[৩] Ira R. Buchler and Henry A. Selby, *Kinship and Social Organization: An Introduction to Theory and Method* (New York: The Macmillan Company, 1968), pp. 3 and 33-35.

[৪] R.H. Lowie, "The Matrilineal Complex" in *American Archaeology and Ethnology*, vol. 16 (Calfornia: University of California Publications, 1919), pp. 33-34. ; W.H.R. River, *Social Organization* (London: Kegan Paul, 1924), p. 27. ; Profulla C. Sarker, "Hindu Muslim Relation in Rural Bangladesh " in S. R. Chakravarty and Virendra Narain, eds, *Bangladesh History and Culture*, Vol. 1 (New York: South Asain Publishers), p.189.: A.H.M. Zehadul Karim, *The Pattern of Rural Leadership in a Agrarian Society* (New Delhi: Nothern Book Centre.1990), pp. 80-82.

গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আলোচ্য প্রবন্ধের জন্য সামাজিক জরিপ ও নিবিড় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক জরিপের ক্ষেত্রে কাঠামোগত ও অকাঠামোগত প্রশ্নমালা ব্যবহার এবং নমুনায়নের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নমুনা একক হিসেবে খানা প্রধানকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে উত্তরদাতা হিসেবে ৩৪ জন খানা প্রধানকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিবিড় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে সত্যতা যাচাই করা হয়েছে।

১.১. সামাজিক পুঁজি ও জ্ঞাতিসম্পর্ক

উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনায় "সামাজিক পুঁজি" একটি সাম্প্রতিক ধারণা।[৫] উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, কৌশল ও কর্মসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যান্য পুঁজির (ভৌত ও মানব পুঁজি) মতো সামাজিক পুঁজিকেও প্রায় সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। সামাজিক পুঁজি হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যথা: সম্পর্কের নেটওয়ার্ক, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা—যা সমাজের বাসিন্দাদের পারস্পরিক সুবিধার (যৌথ অর্জন) জন্য পরস্পরকে সমন্বয় ও সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করে।[৬] মূলত সামাজিক পুঁজি হলো সমাজের বাসিন্দাদের অনুভূমিক (Horizontal) সম্পৃক্ততায় সৃষ্ট নানা সংগঠন, যা সমাজের উৎপাদনশীলতার উপর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমাজের বাসিন্দাদের সম্পৃক্ততাকে অনুভূমিক বিবেচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে উল্লম্ব (Vertical) ভাবেও চিন্তা করা যায়। সেক্ষেত্রে, এই উল্লম্ব সম্পর্ক সামাজিক পুঁজির সংজ্ঞাকে আরো সম্প্রসারিত করে।[৭] অনেকেই সামাজিক পুঁজি প্রত্যয়টিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের আলোকে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী। তাঁদের মতে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সমাজের আদর্শ উন্নয়নে সহায়ক এবং সামাজিক কাঠামোর মানবিক রূপ দেয়। অনানুষ্ঠানিক-অনুভূমিক সম্পর্ক ও উল্লম্ব সম্পর্কের পাশাপাশি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক পুঁজির মধ্যে রয়েছে আনুষ্ঠানিক-প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ও কাঠামো, যেমন: সরকার, রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা, আইনের শাসন, আদালত ব্যবস্থা, নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

---

[৫] যদিও সামাজিক পুঁজি প্রত্যয়টির বৈশিষ্ট্যসমূহ বেশ আগে থেকেই ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার হয়ে আসছে, যেমন: সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি। হানিফান ১৯১৬ সালে সর্বপ্রথম প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করেন (Lada J. Hanifan, "The Rural Community Center", *Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1916, p.130*)। পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে রবার্ট পাটনাম (Robert Putnam) তার *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy* বইয়ে সামাজিক পুঁজি প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন এবং ইটালির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক পুঁজির ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন. এর ফলে ১৯৯৭ সালে বিশ্বব্যাংক এই প্রত্যয়টি তার উন্নয়ন শব্দকোষে অর্ন্তভুক্ত করে। মূলত তখন থেকেই সামাজিক পুঁজি প্রত্যয়টি অন্যান্য পুঁজির মতোই উন্নয়ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে।

[৬] Putnam, Robert *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993), pp. 167.

[৭] Coleman, S. James " Social Capital in Creation of Human Capital" in Dasgupta, Partha and Ismail Serageldin, eds., *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, (Washington D.C.: the World Bank, 2000), p. 16. তিনি সামাজিক পুঁজি বলতে উল্লম্ব সম্পর্ক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝিয়েছিলেন। তাঁর মতে "সমাজের সদস্যদের সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর মাঝেই সামাজিক পুঁজি বিদ্যমান থাকে। অন্যান্য পুঁজির ন্যায় এটিও উৎপাদনশীল সেই সাথে এটি যথাসম্ভব সুবিধা তৈরি করে এবং এর অনুপস্থিতি অসম্ভব"।

সামাজিক পুঁজির অত্যাবশ্যক উপাদানগুলো হলো সম্পর্কের নেটওয়ার্ক, পারস্পরিক আস্থা, ও সহযোগিতামূলক সামাজিক রীতিনীতি। সামাজিক নেটওয়ার্ক সমাজের বাসিন্দাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার উত্তরণ ঘটায়। ক্রমেই তা গণমানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং এক ধরনের সহযোগিতামূলক সামাজিক রীতিনীতি পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, পারস্পরিক আস্থা ও সামাজিক সম্পর্ক সামাজিক সহযোগিতাকে উদ্দীপ্ত ও সম্প্রসারিত করে। বলা যেতে পারে, একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস যতো বাড়ে, সহযোগিতার সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পায়। সহযোগিতা নিজেও সামাজিক রীতিনীতি ও সামাজিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করে । এর ফলে, সামাজিক পুঁজি (সম্পর্কের নেটওয়ার্ক, পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতামূলক সামাজিক রীতিনীতি) স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতাকে সহজ করে তোলে। সমাজের বাসিন্দাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার মাত্রা যত গভীর হয়, তত নিবিড়ভাবে তারা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে এবং একে অপরের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়। ফলে, তাদের মধ্যকার দূরত্ব কমে আসতে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরের আপন হয়ে যায়। মোট কথা, সামাজিক পুঁজির মজুত ও ক্রিয়াশীলতা নির্ভর করে কিভাবে সামাজিক পুঁজিকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর। পারস্পরিক সহায়তার অনুশীলন সামাজিক পুঁজিতে বিনিয়োগ নির্দেশ করে। সামাজিক পুঁজি ব্যবহারের ফলে যা কিছু অর্জিত হয়, তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত না হয়ে সমাজের সকল বাসিন্দারও সম্পদে পরিণত করে। সুতরাং, পারস্পরিক আস্থা, সামাজিক রীতিনীতি ও সম্পর্কের নেটওয়ার্কের মতোই সামাজিক পুঁজির বিশেষ চরিত্র হচ্ছে তা একটি গণদ্রব্য (Public goods), যা গতানুগতিক পুঁজির মতো ব্যক্তিগত দ্রব্য (Private goods) নয়। এইক্ষেত্রে, সামাজিক পুঁজির দুইটি রূপ রয়েছে: প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি (Institutional capital), যার ভিত্তি হচ্ছে লেনদেন এবং সম্পর্কগত পুঁজি (Relational capital), যার ভিত্তি হচ্ছে বিবিধ সামাজিক সম্পর্ক।

জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো একটি আদিম ও সমাজ কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংগঠন। মূলত সমাজের বাসিন্দারা জ্ঞাতিসম্পর্কিত সম্পর্কের মাধ্যমেই অনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্পর্ক ও সংগঠনে সম্পর্কিত থাকে। এর ফলে, জ্ঞাতিসম্পর্কের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের নেটওয়ার্ক, পারস্পরিক আস্থা ও সামাজিক রীতিনীতি বেশ ভালোভাবে বিরাজ করে এবং সুসংগঠিত হয়। সমাজের সদস্যদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে জ্ঞাতিসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞাতিসম্পর্ককে সামাজিক পুঁজি অভিধায়ও চিহ্নিত করা যায়।

১.২. মুণ্ডাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

নৃতাত্ত্বিকদিক থেকে মুণ্ডারা আদি অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত।[৮] বাংলা শব্দভাণ্ডারের বেশ বড় একটি অংশ মুণ্ডা ভাষা থেকে গৃহীত, যেগুলো অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[৯] মুণ্ডা শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে, যার অর্থ গ্রামের প্রধান। উপজাতি সদস্যগণ কর্তৃক উপাধি বা

---

[৮] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৪৯), পৃ. ৩১ ও ৪২। তিনি বলেন "পশ্চিম-ভারতে এবং উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশে যে সব লোকের স্থান হিন্দুবিন্যাসের প্রান্ততম সীমায় তাহারা, মধ্য-ভারতের কোল, ভীল, করোয়া, খারওয়ার, মুণ্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ি প্রভৃতি লোকেরা, দক্ষিণ-ভারতের চেঞ্চু, করুব, যেরুর প্রভৃতি লোকেরা, সকলেই আদি অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোক। ... বর্তমান বাংলাদেশের, বিশেষভাবে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, বাঁশফোর, মালপাহাড়ি প্রভৃতিরা যে আদি অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এ অনুমান নরতত্ত্ব বিরোধী নয়"।

[৯] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *শহীদুল্লাহ রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৫৬৩ ।

কর্মকাণ্ডের বিশেষণরূপে এ শব্দটি ব্যবহৃত হতো।[১০] সে দৃষ্টিকোণ থেকে মিন্‌জি, ভূমিজ, সরদার, জমাদ্দর, খাম্বু প্রভৃতিদেরকে মুণ্ডার অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। রিজলি দেখিয়েছেন মুণ্ডাদের ভিতর ১৩টি উপবিভাগ ও ৩৩৯ টি গোত্র রয়েছে।[১১] অপরদিকে মনোহর লাল মুণ্ডাদের মাহালি ও কোমপাট এই দুই ভাগে ভাগ করে প্রায় ১৫০টি গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।[১২] প্রতিটি গোত্রের নামকরণ করা হয় বিভিন্ন জীবজন্তু, পশু-পক্ষী ও বস্তুর নাম অনুসারে। নামকরণের এই পদ্ধতিটিকে টোটেম বলা হয়। টোটেম অনুসারে প্রতিটি গোত্রের উপর ট্যাবু আরোপ করা হয়। সাধারণত টোটেম শিকার, ভক্ষণ ও ব্যবহার করা টোটেমীয়দের নিষেধ থাকে।

ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুযায়ী মুণ্ডাদের বাস ছিলো ভারতের বিহার প্রদেশের ছোটনাগপুর এলাকায়। তাদের সর্বশেষ বসবাস ছিল মধ্যপ্রদেশের কৈমুর পাহাড়ের পূর্বপ্রান্তে রোহটাস নামক স্থানে। ছোটনাগপুরে পৌঁছানোর পর মুণ্ডারা অসুর নামক কোনো এক জাতিকে ছোটনাগপুরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ঠেলে দেয়। পরবর্তীকালে ওরাঁওদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে মুণ্ডারাও ক্রমে ছোটনাগপুরের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চলে আসে।[১৩]

মুণ্ডারা কখন এবং কি কারণে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এসেছিল তা প্রমাণ করা কঠিন। মুণ্ডাদের আগমনের একটি কারণ হতে পারে এ অঞ্চলের জমিদারদের প্রলোভন। সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতাব্দীতে জমিদাররা অনাবাদি জমি পরিষ্কার ও আবাদ করার জন্য অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় মুণ্ডাদের এ অঞ্চলে নিয়ে আসতে পারে। তৎকালে এক শ্রেণীর জমিদারদের পরিচয় "বনকাটি"থেকে উপরোক্ত ধারণা করা অসঙ্গত নয়।[১৪] জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা, অনাবাদি জমি আবাদি করা মুণ্ডাদের দৈনন্দিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। সুতরাং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুণ্ডারা ভারতের সাঁওতাল পরগণা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর তথা ঝাড়খণ্ড অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলে আগমন করে থাকতে পারে।

অপরদিকে ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন, জমিদারদের অত্যাচার, জমির খাজনা প্রদান প্রভৃতি নানা রকম সমস্যা মুণ্ডাদের উত্তরাঞ্চলে আগমনের অন্যতম কারণ হতে পারে। ১৯০১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দিনাজপুরের খাস জমি চাষের উপযোগী করার জন্য তৎকালীন জমিদাররা ইংরেজ সরকারের সম্মতিক্রমে পাইকারিভাবে মুণ্ডাদের এ অঞ্চলে আমদানি করে। মুণ্ডাদের আগমনের কারণ সম্পর্কে উল্লিখিত বিতর্ক সত্ত্বেও বলা যেতে পারে সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভিতর কোনো এক সময়ে মুণ্ডাদের এই দেশে আগমন ঘটেছিল।

মুণ্ডাদের শারীরিক গঠনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তাদের বর্ণ কালো, অধর মোটা, নাক প্রশস্ত , মুখে দাড়ি-গোঁফ অল্প এবং তারা বেশ শক্ত-সমর্থ।[১৫] যদিও আধুনিক যুগে অনেক মুণ্ডার ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। জলবায়ু, আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস, বিভিন্ন

---

[১০] H. H. Riseley, *the Tribe and Castes of Bengal*, Vol. II (Culcatta: Firma Mukhopadhyay, 1981), p. 101.

[১১] *Ibid*., Appendix 1, pp. 102-109.

[১২]Monohar Lal, "Munda" in Sachchidananda and R. R. Prasad, *Encyclopaedic Profile of Indian Tribe*, Vol. III (L-P) (New Delhi: Discovering Publishing House, 1996), p.719.

[১৩] *Ibid.*

[১৪] গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ* (কলিকাতা, ১৯৮৩), পৃ. ৫৬-৫৭।

[১৫] ডক্টর নিজাম উদ্দিন আহমেদ, *পৃথিবীর আদিম সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮২[প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭০]), পৃ. ১১।

রক্তের মিশ্রণ এর কারণ হতে পারে। মুণ্ডাদের রয়েছে এক ভিন্ন প্রকৃতির ধর্মসংস্কৃতি। তাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ধরা হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা প্রকৃতিপূজারী। নেলসন প্রতিবেদনে (১৯২৩) বলা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের শতকরা দুইভাগ লোক প্রকৃতিপূজারী। সিঙবোঙ্গা বা সূর্যকে তারা প্রধান দেবতা মনে করে, যিনি পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। এ ছাড়া এদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জীবজন্তু, গাছপালা ও জড়বস্তু বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। মুণ্ডাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য: এরা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে।[১৬] ধারণা করা হয়, নেশার মাধ্যমে মুণ্ডারা দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে শুদ্ধতা অর্জন করে। এরা এভাবেই সদ্য জন্মানো সন্তানের মতো পূত-পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং নেশাজাতীয় পানীয় ছাড়া মুণ্ডাদের কোনো আচার অনুষ্ঠান হয় না বললেই চলে।

এ ধরনের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহকে উপজাতি, ভূমিজ বা আদিবাসী প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, যা তাদের আত্মপরিচয়কে সংকটের মধ্যে ফেলতে পারে। সে কারণে এদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিশেষণ ব্যবহার অতীব জরুরি। জাতিসংঘের সংজ্ঞায় আদিবাসী বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে, যারা প্রাচীনকাল থেকে পূর্বপুরুষদের জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে এবং যারা সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় রক্ষণশীল এবং যাদের নিজস্ব ভাষা, দৈহিক গঠন ও অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আবার অন্য এক মতে, বিংশ শতাব্দীতে যাদের আচার-আচরণ, অনুষ্ঠানাদি আদিম পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়ে আসছে তারা আদিবাসী।[১৭] আদিকাল থেকে মানব সমাজ একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতো। অতএব, প্রাচীনকাল থেকে পূর্ব-পুরুষের জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করা কোনো জাতিগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং জাতিসংঘের মতানুযায়ী আদিবাসীর সংজ্ঞা সুস্পষ্ট নয় বরং দ্বিতীয় সংজ্ঞানুযায়ী মুণ্ডা জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী অভিধায় চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১.৩. গবেষণা এলাকার বিবরণ

এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার সময়কাল ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০০২। গবেষণা এলাকাটির নাম বটতলি, যা রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার অন্তর্গত গোগ্রাম ইউনিয়নে অবস্থিত। গ্রামটি চারটি পাড়ায় বিভক্ত, যথা: দোকান পাড়া, নাও (নিচের) পাড়া, শিয়ালিপাড়া ও দিঘিপাড়া। গ্রামের মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৪৬৮ জন। মোট পরিবারের সংখ্যা ৯০, যার মধ্যে মুণ্ডা পরিবারের সংখ্যা ৬৮ এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫৪ জন। গ্রামের পাড়াগুলি বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ গ্রামটি পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। এ গ্রামে বসরাতরত মুণ্ডারা প্রায় ১৩টি গোত্রে বিভক্ত। নিম্নে উত্তরদাতাদের গোত্র পরিচয় তুলে ধরা হলো:

---

[১৬] মুণ্ডারা নেশার জন্য নিজেদের তৈরি পানীয় ব্যবহার করে, যাকে তাঁরা স্থানীয় ভাষায় বড়িয়া বা পঁচানি বলে থাকে। সাধারণত প্রায় সাত ধরনের লতা বা গুল্মের শুকনো গুঁড়ো চাউলের গুঁড়ার সঙ্গে মিশিয়ে গাজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বড়িয়া তৈরি করে, যা পরবর্তীতে আধাসিদ্ধ ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে তিন বা চার দিন আবদ্ধ স্থানে রেখে দেওয়া হয়। পরে এটা থেকে পানীয় সংগ্রহ করে সবাই মিলে পান করে।

[১৭] Animesh Kanti Pal, "Notes on Santali Elements on Bangla in Tribal Culture in Bangladesh", Ph.D. Thesis submitted to Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1984.

সারণি ১

উত্তরদাতাদের গোত্র পরিচয় ও জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক সংখ্যা	গোত্রের নাম	সংখ্যা	জনসংখ্যা	পরিবারের গড় আকার (জন)
১.	টপ্পো	৬ (১৭.৬৫)	৪৩(২৩.২৪)	৭.১৭
২.	সপুয়ার	৫ (১৪.৭১)	২২(১১.৮৯)	৪.৪০
৩.	শ্যামদুয়ার	২ (৫.৮৮)	১১(৫.৯৫)	৫.৫০
৪.	হরদুয়ার	২ (৫.৮৮)	১০(৫.৪১)	৫.০
৫.	বরুয়ার	২ (৫.৮৮)	১২(৬.৪৯)	৬.০
৬.	সিন্ধিয়ার	৪ (১১.৭৭)	১৬(৮.৬৫)	৪.০
৭.	তমগড়িয়া	৫ (১৪.৭১)	৩২(১৭.৩০)	৬.৪
৮.	নৌগড়ুয়ার	১ (২.৯৪)	৫(২.৭০)	৫.০
৯.	সোনা	২ (৫.৮৮)	১০(৫.৪১)	৫.০
১০.	মীন	২ (৫.৮৮)	৯(৪.৮৬)	৪.৫০
১১.	কুমার	১ (২.৯৪)	৬(৩.২৪)	৬.০
১২.	বিলঝা	১ (২.৯৪)	৩(১.৬২)	৩.০
১৩.	কৌড়িয়া	১ (২.৯৪)	৬(৩.২৪)	৬.০
	মোট	৩৪(১০০)	১৮৫(১০০)	৫.৪৪

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

টীকা : বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে এবং বিবাহিত মেয়েকেও অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে।

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় ১৩টি গোত্রের মধ্যে ৪টি গোত্র, যথা: টপ্পো, সুপুয়ার, সিন্ধিয়ার এবং তমগড়িয়ার সংখ্যাধিক্য রয়েছে, যাদের অনুপাত যথাক্রমে শতকরা ১৭.৬৫, ১৪.৭১, ১১.৭৭ এবং ১৪.৭১ ভাগ। অন্যদিকে লোকসংখ্যার দিক থেকে উপরোক্ত গোত্রগুলোর অবস্থান যথাক্রমে শতকরা ২৩.২৪, ১১.৮৯, ৮.৬৫ এবং ১৭.৩০ ভাগ। একই সারণিতে লক্ষ করা যায়, মুণ্ডাদের গড় পরিবার আকৃতি ৫.৪৪ জন হওয়া সত্ত্বেও টেপ্পোর অবস্থান শীর্ষে (৭.১৭ জন)। এর পরই আছে তমগড়িয়ার অবস্থান (৬.৪ জন)। সুতরাং বটতলির মুণ্ডাদের মধ্যে টপ্পো ও তমগড়িয়া গোত্রের প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। একই সারণিতে ১২ জন মহিলা ও ১ জন পুরুষ সংযুক্ত অণু পরিবারে বাস করছে। এই ১৩ জন এবং ৩৪ X ২ = ৬৮ জন স্বামী-স্ত্রী বাদ দিলে সন্তানের সংখ্যা পাওয়া যায় ৯২। সুতরাং পরিবার প্রতি সন্তান সংখ্যা ২.৭১। নিম্নের সারণিতে সন্তানদের তথ্যাবলি দেখানো হলো। উত্তরদাতাদের মধ্যে সবাই বিবাহিত। তাদের মধ্যে ১৭ জন অর্থাৎ শতকরা ৫০জন নিরক্ষর। ৯ জন অর্থাৎ প্রায় ২৬.৪৭% এবং ৫ জন অর্থাৎ প্রায় ১৪.৭১% যথাক্রমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছিল। মাত্র ১ জন (২.৯৪%) উত্তরদাতা স্নাতক পাস।

সারণি ২

উত্তরদাতাদের অবিবাহিত সন্তানদের বয়স, লিঙ্গ ও শিক্ষাগত অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

	লিঙ্গ			শিক্ষাগত অবস্থান					
বয়স	ছেলে	মেয়ে	মোট	পড়ে না	প্রাথমিক	এস. এস.সি	এইচ.এ স.সি.	স্নাতক	মোট
০-৫	১০ (১০.৮৭)	১৪ (১৫.২২)	২৪ (২৬.০৯)	২৪ (২৬.১০)	০ (০)	০ (০)	০ (০)	০ (০)	২৪ (২৬.১০)
৫-১০	১১ (১১.৯৫)	১০ (১০.৮৭)	২১ (২২.৮২)	১১ (১১.৯৬)	১০ (১০.৮৮)	০ (০)	০ (০)	০ (০)	২১ (২২.৮৪)
১০-১৫	৮ (৮.৭০)	৫ (৫.৪৩)	১৩ (১৪.১৩)	১ (১.০৭)	৬ (৬.৫২)	৬ (৬.৫২)	০ (০)	০ (০)	১৩ (১৪.১১)
১৫-২০	১৪ (১৫.২১)	৪ (৪.৩৫)	১৮ (১৯.৫৬)	২ (২.১৭)	২ (২.১৭)	১৪ (১৫.২২)	০ (০)	০ (০)	১৮ (১৯.৫৬)
২০-২৫	৮ (৮.৭০)	৪ (৪.৩৫)	১২ (১৩.০৫)	১ (১.০৭)	২ (২.১৭)	৭ (৭.৬৩)	০ (০)	২ (২.১৭)	১২ (১৩.০৪)
২৫-৩০	৪ (৪.৩৫)	০ (০)	৪ (৪.৩৫)	৩ (৪.৩৫)	০ (০)	০ (০)	০ (০)	০ (০)	৪ (৪.৩৫)
মোট	৫৫ (৫৯.৭৮)	৩৭ (৪০.২২)	৯২ (১০০)	৪২ (৪৬.৭২)	২০ (২১.৭৪)	২৮ (২৯.৩৭)	০ (০)	২ (২.১৭)	৯২ (১০০)

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ। টীকা : বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণিতে দেখা যায়, মুণ্ডা সন্তানদের মধ্যে শতকরা ৫৯.৭৮, ও ৪০.২২ ভাগ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা। এদের মধ্যে নির্ভরশীল সন্তানদের (০-১৫ বৎসর) হার শতকরা ৬৩.০৪ ভাগ। যাদের মধ্যে শতকরা ৩১.৫২ জন পুরুষ এবং মহিলাদেরও একই হার। কর্মক্ষম সন্তানদের (১৫-৬০ বৎসর) হার শতকরা ৩৬.৯৬ ভাগ, এর মধ্যে ২৮.২৬% এবং ৮.৭০% যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা।

বয়সের ক্ষেত্রে দেখা যায় সন্তানদের গড় বয়স প্রায় ১১.১৭ বৎসর, যার মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের গড় বয়স যথাক্রমে ১৩.৫ ও ৮.৯৯ বৎসর (প্রায়)। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায়, শতকরা ৪৬.৭২ জন শিক্ষাগ্রহণ করে না। বাকি ৫৩.২৮% শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে শতকরা ২১.৭৪, ২৯.৩৭ ও ২.১৭ জন যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও ডিগ্রি স্তরে লেখাপড়া করছে। লক্ষণীয় বিষয়, মাত্র ২.১৭% ছাড়া কেউ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি বা করছে না। এক্ষেত্রে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ও দারিদ্র্য প্রধান কারণ বলে মুণ্ডারা মনে করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় মুণ্ডারা বেশি বয়সে স্কুলে যায়। যেমন তাদের মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার গড় বয়স প্রায় ১৭.৬৯ বৎসর। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এ গড় বয়স ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেশি। ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে এই গড় বয়স যথাক্রমে প্রায় ১৬.৪৭ ও ১৭.৯৫ বছর। তবে মুণ্ডা সন্তানেরা বেশির ভাগই সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। মাত্র ৭ জন (১০-৩০ বৎসর বয়সের) অর্থাৎ শতকরা ৭.৬১ জন সন্তান নিরক্ষর।

১.৪. অর্থনৈতিক অবস্থা

বটতলি গ্রামের মুণ্ডাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। অধিকাংশ লোক ভূমিহীন। তাদের প্রধান পেশা দিনমজুরি। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে। লিঙ্গভেদে

মজুরির পার্থক্য ঘটে। ছাত্র এবং ছাত্রীরা পড়াশুনার পাশাপাশি দিনমজুরি করে। নিম্নে সারণিতে বটতলি গ্রামের মুণ্ডাদের অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি ৩

বটতলি গ্রামের উত্তরদাতাদের ভূমি মালিকানা, পেশা, ও মাসিক খরচ সংক্রান্ত তথ্য

পেশা	গড় মাসিক খরচ (টাকা)	ভূমি মালিকানা		মোট
		ভূমিহীন	ভূস্বামী	
দিনমজুর	১২৭৪	১৭ (৫০)	০ (০)	১৭ (৫০)
দিনমজুর+ বর্গাদার	১৭৭৮	৭ (২০.৫৯)	৫ (১৪.৭১)	১২ (৩৫.৩০)
বর্গাদার+ কৃষক অন্যান্য	৩০০০	০ (০)	৪ (১১.৭৬)	৪ (১১.৭৬)
কৃষক+ অন্যান্য	৪০০০	০ (০)	১ (২.৯৪)	১ (২.৯৪)
মোট	১৭৩৫	২৪ (৭০.৫৯)	১০ (১৯.৪১)	৩৪ (১০০)

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

টীকা : বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩ থেকে মুণ্ডাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন তা বোঝা যায়। মাত্র ১০ জন অর্থাৎ প্রায় ২৯.৪১% লোকের জমি আছে। ভূস্বামীদের মধ্যে যথাক্রমে প্রায় ১৪.৭১%, ১১.৭৬% এবং ২.৯৪% যথাক্রমে দিনমজুরি-বর্গাদার, বর্গাদার-কৃষক এবং প্রধানত কৃষক পেশার সঙ্গে জড়িত। মুণ্ডাদের মধ্যে ভূমিহীনদের সংখ্যা শতকরা ৭০.৫৯ জন, এর মধ্যে ৫০% দিনমজুর এবং ২০.৫৯% যুগপৎ দিনমজুর ও বর্গাদার, অন্যদিকে মোট উত্তর দাতার মধ্যে দিনমজুর, দিনমজুর-বর্গাদার, বর্গাদার-কৃষক এবং প্রধানত কৃষক পেশায় নিয়োজিত মুণ্ডাদের হার যথাক্রমে শতকরা ৫০, ৩৫.৩০, ১১.৭৬ এবং ২.৯৪ জন। সুতরাং মুণ্ডাদের শতকরা প্রায় ৯৭.০৬ জন দিনমজুরি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল, অথচ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মুণ্ডা ভূমিহীন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যাদের জমি আছে, তাদের গড় জমির পরিমাণ মাত্র ২ বিঘা (প্রায়)।

মুণ্ডাদের মাসিক গড় খরচ লক্ষ করার মতো। প্রতি মাসে এরা গড়ে প্রায় ১৭৩৫ টাকা খরচ করে, অর্থাৎ প্রতিদিন প্রতি সদস্যের পিছনে খরচ করে প্রায় ১১.৩৮ টাকা।[১৮] কিন্তু এ খরচ প্রতি দিনমজুরের ক্ষেত্রে আরো কম (মাত্র ৮.৩৬ টাকা)। একইভাবে দিনমজুর-বর্গাদার, বর্গাদার-কৃষক ও প্রধানত কৃষক পরিবারের প্রত্যেক সদস্য বাবদ প্রতিদিন খরচ করে যথাক্রমে প্রায় ১১.৬৭, ১৯.৬৯ ও ২৬.২৫ টাকা। সুতরাং বলা যায় মুণ্ডাদের পেশার সঙ্গে খরচের সম্পর্ক রয়েছে, যদিও এ খরচ আধুনিক জীবনমানের তুলনায় খুবই কম।

বটতলি গ্রামের সামাজিক অবস্থা সামাজিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। মুণ্ডারা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করছে। গ্রামে স্থিতিশীল ও সৌহার্দ্যময় পরিবেশ বিরাজ করছে। এ গ্রামে একটি মাত্র আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি খাস পুকুর আছে। চিকিৎসার

[১৮] ১ নং সারণিতে অন্তর্ভুক্ত ১২ জন বিবাহিত মেয়েকে বাদ দিয়ে এ হিসেব করা হয়েছে, যেক্ষেত্রে গড় পারিবারিক আকার হয়েছে ৫.০৮ জন।

ক্ষেত্রে গ্রামের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী কবিরাজ এবং ঝাড়-ফুঁকের উপর নির্ভর করে। চিকিৎসালয়, মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও হাট-বাজার গ্রাম থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। গ্রামটিতে মাত্র ৪টি নলকূপ রয়েছে, যা থেকে গ্রামবাসীরা খাবার পানি সংগ্রহ করে। খোলা আকাশের নীচে মলমূত্র ত্যাগ করা বটতলি গ্রামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ পরিবারে কাঁচা বা পাকা কোনো ধরনের পায়খানাই নেই।

সামগ্রিকভাবে বটতলি গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নত নয়। মুণ্ডারা অধিক পরিশ্রম ও সৌহার্দ্যময় সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে টিকে আছে ও জীবন যাপন করে যাচ্ছে।

১. মুণ্ডাদের জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন

মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক অনুধাবনে জ্ঞাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন পরিসরে (পরিবার, গোত্র, সমাজ) আবাস ও পরিসর সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। রক্ত ও বিবাহ সম্পর্কিত জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবার বা বংশ এবং গোত্র বা গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাতানো সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবার, গোত্র এবং সমাজের ভূমিকা লক্ষণীয়। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে জ্ঞাতিগোষ্ঠী নিরূপণ করা ও তার গঠন প্রণালি নিয়ে বেশ আলোচনা করা হয়েছে। মুণ্ডাদের জ্ঞাতিসম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিবার, গোত্র, সমাজে মুণ্ডা সদস্যদের অবস্থান, অধিভুক্তি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করা দরকার।

২.১. পরিবার

পরিবারের ধরন ও ক্ষমতা-কাঠামো জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমাজের আদিম ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পরিবারের মধ্যে যেমন শান্তি ও নিরাপত্তা থাকে, তেমনি থাকে হিংসা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, বিরোধ ইত্যাদি। পরিবারে সাধারণত তিন ধরনের সম্পর্কের ধারা লক্ষ করা যায়, যথা:

(ক) পিতা ও মাতার মধ্যে সম্পর্ক ।
(খ) পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক ।
(গ) সন্তানদের সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক।

উপরিউক্ত সম্পর্কের যে কোনো একটির অবনতির ফলে পুরো পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। পরিবার গড়ে ওঠে খানার ভিত্তিতে। যখন পারিবারিক সদস্যরা এক চুলাতে রান্না করে খাবার গ্রহণ করে তখন পরিবারের শুরু হয়। এ কারণে কেউ কেউ পরিবার ও খানা আলাদা করার পক্ষপাতী। তবে মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক নির্ণয়ে খানা ও পরিবারকে এক করে দেখানো হয়েছে। পরিবারের দুই রকম ধারা বর্তমান, তা হলো : ধারাবাহিক ধারা ও উন্নয়ন ধারা।

প্রথমটির ক্ষেত্রে জ্ঞাতি গঠনের ভিত্তিতে পরিবারের দুইটি ভাগ রয়েছে, যথা : অণু পরিবার ও যৌথ পরিবার। অণু পরিবারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা : মৌলিক অণু পরিবার ও সংযুক্ত অণু পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তানরা যখন এক সঙ্গে বসবাস করে ও একই খানাতে খায়, তখন তাকে মৌলিক অণু পরিবার বলে। অন্যদিকে পিতা-মাতা ও তাদের অবিবাহিত সন্তানদের সঙ্গে এক বা একাধিক জ্ঞাতি বা অজ্ঞাতি সদস্যদের বসবাসকে সংযুক্ত অণু পরিবার বলে । ৪ নং সারণিতে দেখা যায় শতকরা প্রায় ৮২.৩৬ ভাগ পরিবার অণু পরিবারভুক্ত, যার মধ্যে ২৬.৪৭% পরিবার হলো সংযুক্ত অণু পরিবার। এই সংযুক্ত অণু পরিবারে ৯ জন বিধবা মহিলা (মাদের ২৩.৫৩%) বসবাস করছে।

অপরদিকে যৌথ পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা : মৌলিক যৌথ পরিবার ও সম্প্রসারিত যৌথ পরিবার। মৌলিক ও সম্প্রসারিত যৌথ পরিবারকে অনেক সময়ে এক করে দেখানো হয়। যদি দুই বা ততোধিক পরিবার একত্রে বসবাস করে এবং একই চুলাতে রান্না খাবার গ্রহণ করে, তাকে মৌলিক যৌথ পরিবার বলে। যেমন পিতা-মাতা ও তাদের অবিবাহিত সন্তান বা সন্তানসমূহ এবং বিবাহিত সন্তান বা সন্তানসমূহের পরিবার মিলে মৌলিক যৌথ পরিবার গঠিত হয়। সম্প্রসারিত যৌথ পরিবার হলো একদল অণু বা যৌথ পরিবার বা উভয় পরিবারের সমষ্টি, যার সকল সদস্যই তাত্ত্বিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন, কিন্তু একই স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে এবং অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবারের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ৪ নং সারণিতে লক্ষ করা যায় যে, শতকরা ১৭.৬৪ ভাগ পরিবার যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, এর মধ্যে মৌলিক ও সম্প্রসারিত যৌথ পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১১.৭৬ ও ৫.৮৮ ভাগ।

পরিবারের ক্ষমতাভোগকারীর উপর পরিবারের উন্নয়ন অনেকটা নির্ভর করে। পরিবারে ক্ষমতা যখন পুরুষের হাতে ন্যস্ত হয় তখন তা পুরুষতান্ত্রিক, আর মহিলাদের হাতে ন্যস্ত হলে মাতৃতান্ত্রিক এবং পুরুষ ও মহিলা উভয়ের কর্তৃত্ব থাকলে তাকে বলা হয় পিতৃ-মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। ৪ নং সারণি অনুযায়ী মুণ্ডাদের ভিতর পিতৃতান্ত্রিক, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃ-মাতৃতান্ত্রিক পরিবার যথাক্রমে শতকরা ৭৬.৪৭, ৮.৮২ ও ১৪.৭১ ভাগ।

সারণি ৪

পরিবারের ধরন ও ক্ষমতা-কাঠামো সম্পর্কিত তথ্য

ক্ষমতা-কাঠামো	পরিবারের ধরন				
	মৌলিক অণু পরিবার	সংযুক্ত অণু পরিবার	মৌলিক যৌথ পরিবার	সম্প্রসারিত যৌথ পরিবার	মোট
পিতৃতান্ত্রিক	১৪ (৪১.১৮)	৬ (১৭.৬৫)	৪ (১১.৭৬)	২ (৫.৮৮)	২৬ (৭৬.৪৭)
মাতৃতান্ত্রিক	০ (০)	৩ (৮.৮২)	০ (০)	০ (০)	৩ (৮.৮২)
পিতৃ-মাতৃতান্ত্রিক	৫ (১৪.৭১)	০ (০)	০ (০)	০ (০)	৫ (১৪.৭১)
মোট	১৯ (৫৫.৮৯)	৯ (২৬.৪৭)	৪ (১১.৭৬)	২ (৫.৮৮)	৩৪ (১০০)

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

টীকা : বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

ওপরের সারণি হতে দেখা যায়, মৌলিক ও সম্প্রসারিত যৌথ পরিবারে ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের হাতে রয়েছে। সংযুক্ত অণু পরিবারে মাত্র ৩টি (৮.৮২%) পরিবারে ক্ষমতা মহিলাদের হাতে এবং ৫টি অণু পরিবার অর্থাৎ শতকরা ১৪.৭১ ভাগ পরিবার পিতৃ-মাতৃতান্ত্রিক। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মুণ্ডাদের পরিবার কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক এবং পিতার মৃত্যুর পর সম্পদের উত্তরাধিকার পুত্র পেয়ে থাকে। তবে বিধবা মাতা ও নব দম্পতিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃ-মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর উপস্থিতি থাকতে পারে।

২.২. গোত্র/গোষ্ঠী

পরিবারের তুলনায় মুণ্ডা সমাজে গোত্র অধিকতর বড় জ্ঞাতিগোষ্ঠী। অনেকে গোষ্ঠী বা গোত্র শব্দটির পরিবর্তে বংশ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু গবেষক মনে করেন গোষ্ঠী বা বংশ

শব্দ দুটি পিতৃধারার সম্পর্ক বা রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে বোঝালেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শব্দ দুটি আলাদা। গবেষণায় দেখা গেছে, মুণ্ডা জনগোষ্ঠী গোষ্ঠী বা গোত্র বলতে বংশকেই মনে করে। পিতৃধারার বংশধরদের তারা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত সদস্য বলে ধরে। একই সঙ্গে এরা পূজারিয়া বলে একটি শব্দ ব্যবহার করে থাকে অর্থাৎ কিছু কিছু পূজার (যেমন শহরায়, বড় দেওতা পূজা ইত্যাদি) সময়ে যেসব সদস্যের একত্রে পূজা করতে হয় বা একত্রে পূজা করা বাধ্যতামূলক মুণ্ডারা তাদের পূজারিয়া বলে। এ সকল পূজায় পিতৃধারার বংশধরেরা একত্রে অংশগ্রহণ করে থাকে। সুতরাং বংশ বা গোত্রকে একই অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাধারণত কয়েকটি পরিবার মিলে একটি গোত্র গঠিত হয়ে থাকে। মুণ্ডাদের প্রত্যেকটি গোত্রের আলাদা আলাদা টোটেম থাকে, যা থেকে তাদের গোত্র পরিচয় বোঝা যায়। প্রতিটি টোটেমের অধিভুক্ত মুণ্ডারা মনে করে তাদের পূর্বপুরুষ এক। মুণ্ডাদের গোত্র সম্প্রীতির মূল কারণ হয়তো এখানেই নিহিত। ১ নং সারণিতে গবেষণা এলাকার ১৩টি গোত্রের কথা উল্লেখ করা গেছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিটি গোত্রের শতকরা হারও সেখানে প্রদর্শিত। এছাড়া প্রতিটি গোত্রে খানার শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, টপ্পো, সপুয়ার, সিদ্ধিয়ার এবং তমগড়িয়া গোত্রে পরিবার সংখ্যা বেশি এবং কুমার বিলঝা, কৌড়িয়া প্রভৃতি গোত্রে পরিবার সংখ্যা কম। সুতরাং উক্ত সারণি থেকে অনুমান করা যেতে পারে, সংখ্যালঘু গোত্র বটতলি গ্রামে পরে বসতি স্থাপন করেছে অথবা এ সকল গোত্রের সদস্যরা বিভিন্ন কারণে অন্যত্র স্থানান্তর করেছে। গোত্রের সদস্যরা সব সময়ে একই স্থানে বসবাস না করতেও পারে। বাড়ির সীমানায় জমি কম, সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া, দ্বন্দ্ব বা উত্তেজনা, ভুল বোঝাবুঝি, আর্থ-সামাজিক সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতি কারণে গোত্রের সদস্যরা অন্য পাড়া, অন্যগ্রাম বা অন্য কোথায় বাস করতে পারে। তবে বটতলি গ্রামে মুণ্ডারা দুই একটি উদাহরণ ছাড়া প্রায় সবাই নিজ গোত্রে বসবাস করে থাকে। নিজ গোত্রে বসবাস করা এবং না করার সঙ্গে পেশার একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে সারণিতে তা দেখানো হলো:

সারণি ৫

মুণ্ডাদের বাসস্থানের অবস্থান ও পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

পেশা	নিজের গোত্রে	গোত্রের বাইরে	মোট
দিনমজুর	১২(৩৫.২৯)	৫(১৪.৭১)	১৭(৫০)
দিনমজুর ও বর্গাদার	৭(২০.৫৯)	৫(১৪.৭১)	১২(৩৫.৩০)
বর্গাদার ও কৃষক	০৪(১১.৭৬)	০(০)	০৪(১১.৭৬)
প্রধানত কৃষক	০১(২.৯৪)	০(০)	০১(২.৯৪)
মোট	২৪(৭০.৫৮)	১০(২৯.৪২)	৩৪(১০০)

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

টীকা : বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

৫ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে, মুণ্ডাদের শতকরা ৭০.৫৮ ভাগ নিজের গোত্রে বসবাস করে এবং শতকরা ২৯.৪২ ভাগ অন্য গোত্রের সঙ্গে বসবাস করছে, যাদের অধিকাংশের পেশা দিনমজুরি (৫০%) ও দিনমজুরি বর্গাদার (৩৫.৩০%)। অধিকাংশ মুণ্ডা পরিবার ভূমিহীন হওয়া সত্ত্বেও শতকরা ২৯.৪২ ভাগ পরিবার মাত্র গোত্রের বাইরে অবস্থান করছে।

এছাড়া পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, যারা গোত্রের বাইরে অবস্থান করছে তাদের প্রায় ৪ জন (৪০%) বিবাহসূত্রে মুণ্ডা এলাকায় বসবাস করে। সুতরাং বলা যেতে পারে, মুণ্ডাদের মধ্যে গোত্র সম্প্রীতি প্রবল। মুণ্ডাদের মধ্যে সব গোত্রের প্রভাব ও ক্ষমতা এক রকম নয়। যদিও তারা মনে করে

তাদের মধ্যে সকল গোত্রের সমান প্রভাব ও ক্ষমতা রয়েছে। তবে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বটতলি গ্রামে টপ্পোদের সামাজিক ক্ষমতা ও প্রভাব বেশি রয়েছে। এর মূল কারণ হতে পারে টপ্পোদের সদস্য শক্তি (শতকরা ২৩.২৪%) ও উচ্চতর সংগঠনের (যেমন-প্রশাসন, থানা, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি) উপর প্রভাব । এর পরই তমগড়িয়া, সিন্ধিয়ার এবং সপুয়ার গোত্রের অবস্থান।

২.৩. বিবাহ

পরিবার, গোষ্ঠী বা গোত্র আলোচনায় লক্ষ করা গেছে, মুণ্ডা সমাজে পিতৃধারার জ্ঞাতিসম্পর্কের কাঠামো বেশ সুদৃঢ়। তবে উভয় ক্ষেত্রে বিবাহের একটি গুরুত্ব থাকে, যেমন পরিবার গঠন এবং পরিবারকে এক বিশেষ ক্ষেত্রে গোত্র বা গোষ্ঠীতে রূপান্তরের জন্য বিবাহের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক প্রথা, আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিবাহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী গ্রহণের উপর ভিত্তি করে বিবাহকে একপত্নী গ্রহণ ও বহুপত্নী গ্রহণ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অনেক সময়ে বিবাহকে আন্তঃকাজিন বিবাহ ও সমান্তরাল কাজিন বিবাহ বলে চিহ্নিত করা হয়। আন্তঃকাজিন বিবাহ হলো মামাতো ও খালাতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ, অন্যদিকে চাচাতো ও ফুপাতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহকে বলে সমান্তরাল কাজিন বিবাহ। আবার গোত্রের অভ্যন্তরে ও গোত্রের বাইরে সংঘটিত বিবাহকে আন্তর্গোত্র ও বহির্গোত্র বিবাহ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে কোনো কোনো সময়ে বিবাহকে পিতামাতার পছন্দ ও পাত্র-পাত্রীর পছন্দ (প্রেম) বিয়ে নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে অনেক সময়ে বিবাহকে জোরপূর্বক বিবাহ ও পালিয়ে বিবাহ বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

বিবাহ পদ্ধতিকে যেভাবেই বিন্যস্ত করা হোক না কেন, এর সঙ্গে সামাজিক সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিবাহের মাধ্যমে সমাজের আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অনুধাবন করা যায়। সাধারণত যে সমাজে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পালিয়ে বিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহের আধিক্য থাকে সাধারণত সে সমাজ স্থিতিশীলতা, সুশৃঙ্খলতা বা সামাজিক সুসম্পর্কের ইঙ্গিত দেয় না। নিম্নের সারণিতে বটতলি গ্রামের মুণ্ডাদের বিবাহের ধরন প্রদর্শিত হলো:

সারণি ৬

বিবাহের ধরন সম্পর্কিত তথ্য

ধরন	একপত্নী	বহুপত্নী	মোট
পিতামাতার পছন্দ	৩০(৮৮.২৪)	০(০)	৩০(৮৮.২৪)
পাত্র পাত্রীর পছন্দ	০৩(৮.৮২)	০১(২.৯৪)	০৪(১১.৭৬)
মোট	৩৩(৯৭.০৬)	০১(২.৯৪)	৩৪(১০০)

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

টীকা : বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

৬ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে মুণ্ডারা শতকরা ৯৭.০৬ জন একপত্নী গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে পিতামাতার পছন্দ ও পাত্র-পাত্রীর পছন্দ যথাক্রমে শতকরা ৮৮.২৪ ও ৮.৮২ ভাগ। মাত্র একজন উত্তরদাতা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, যার শতকরা হার ২.৯৪ ভাগ। সুতরাং মুণ্ডাদের একপত্নী গ্রহণ ও পিতা মাতার পছন্দ অনুযায়ী বিবাহের গুরুত্ব থেকে মনে হয়, এদের দাম্পত্য জীবনে এবং একই সঙ্গে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। মুণ্ডাদের বিবাহের ক্ষেত্রে গড়

বয়স তাৎপর্যপূর্ণ। ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ২৩.২৩ বৎসর এবং ১৯.২ বৎসর। নিম্নে সারণিতে বিবাহের বয়স ও দাম্পত্য জীবনের আয়ু প্রদর্শন করা হয়েছে:

সারণি ৭

উত্তর দাতার বর্তমান বয়স, বিবাহের বয়স এবং দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত তথ্য

বয়স (বৎসর)	উত্তরদাতার বর্তমান বয়স (বৎসর)	বিবাহের বয়স (বৎসর)		দাম্পত্য জীবনের আয়ু (বৎসর)
		স্বামী	স্ত্রী	
৫-১০	০(০)	০(০)	১(২.৯৪)	১৩(৩৮.২৪)
১০-১৫	০(০)	২(৫.৮৯)	৮(২৩.৫৩)	৮(২৩.৫৩)
১৫-২০	১(২.৯৪)	৮(২৩.৫৩)	১১(৩২.৩৫)	৩(৮.৮২)
২০-২৫	৩(৮.৮২)	১২(৩৫.২৯)	১০(২৯.৪২)	১(২.৯৪)
২৫-৩০	৪(১১.৭৬)	৮(২৩.৫৩)	৪(১১.৭২)	১(২.৯৪)
৩০-৩৫	১(২.৯৪)	৩(৮.৮২)	০(০)	৫(১৪.৭১)
৩৫-৪০	৮(২৩.৫৩)	১(২.৯৪)	০(০)	১(২.৯৪)
৪০-৪৫	৫(১৪.৭১)	০(০)	০(০)	০(০)
৪৫-৫০	৩(৮.৮২)	০(০)	০(০)	১(২.৯৪)
৫০+	৯(২৬.৪৮)	০(০)	০(০)	১(২.৯৪)
মোট	৩৪(১০০)	৩৪(০)	৩৪(১০০)	৩৪(১০০)

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

টীকা : বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণিতে প্রদত্ত তথ্য এবং শতকরা ৯৭.০৬ ভাগের (৬ নং সারণি) একপত্নী গ্রহণ, তাদের দাম্পত্য জীবনের সন্তোষজনক সম্পর্ককে নির্দেশ করে। এছাড়া মুণ্ডাদের গড় বিবাহের বয়স থেকে দেখা যায়, এ সমাজ বাল্যবিবাহকে যথেষ্ট উৎসাহিত করে না। এর কারণ হতে পারে ছেলে মেয়ে পরিণত বয়সে পরিবার গঠন করলে পরিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সার্বিকভাবে পালন করতে পারে। মুণ্ডাদের মধ্যে ১২ জন বিধবা মহিলা রয়েছেন, যাঁরা স্বামী মারা যাবার পর দ্বিতীয় বর গ্রহণ করেননি এবং পুত্রের পরিবারে বসবাস করছেন। মুণ্ডা সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ না করার প্রবণতা তাদের সমাজের সামাজিক সুবন্ধনের পরিচয় দেয়।

মুণ্ডাদের আন্তর্গোত্র বিবাহ অর্থাৎ নিজ গোত্রের অভ্যন্তরে বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী মুণ্ডাদের মধ্যে সমান্তরাল কাজিন বিবাহ হয় না, তবে আন্তঃকাজিন বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, আন্তঃকাজিন বিবাহের অনুশীলন মুণ্ডাদের নেই। তবে নিয়ম অনুযায়ী যদি দুটি গোত্রের মধ্যে বিনিময় বিবাহ হয়, সে ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের মধ্যে আন্তঃকাজিন বা বহির্গোত্র বিবাহ নিয়মানুযায়ী বিবাহ হয়। মুণ্ডাদের ভিতর এ ধরনের বিবাহ করা সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে কন্যার মাতার (পিতৃস্বসা) সঙ্গে পিতার রক্ত সম্পর্ক বিবেচ্য নয়, অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে এক গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের শুধু সম্পর্কের জাল সৃষ্টি করানো হয় এবং সন্তানদের পরিচয় নির্ধারিত হয় পিতার পরিচয়ে, যা মুণ্ডাদের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। সুতরাং এদের বিবাহ প্রথায় সঙ্গে পরিবার কাঠামো ও গোত্র কাঠামোর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলা যেতে পারে।

২. সামাজিক পুঁজি হিসেবে জ্ঞাতিসম্পর্কের ব্যবহার

মুণ্ডাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের উপর জ্ঞাতিসম্পর্কের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সারণি ৩-এ মুণ্ডাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখানো হয়েছে। সেখানে অর্থনৈতিক চলকসমূহ, যেমন–মাসিক খরচ, ভূমির মালিকানা, পেশা প্রভৃতি মুণ্ডাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে তুলে ধরে। তা সত্ত্বেও, মুণ্ডারা তাদের জ্ঞাতিসম্পর্কের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সমাজে বসবাস করে এবং টিকে থাকে। জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন আলোচনায় লক্ষ করা গেছে যে মুণ্ডাদের জ্ঞাতিসম্পর্কের নেটওয়ার্ক অত্যন্ত মজবুত, যা তাদের সমাজ জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মূলত জ্ঞাতিসম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতামূলক মনোভাব ও সমবায় প্রবণতা তাদের মধ্যে যৌথ অর্জনের মানসিকতা তৈরি করে। এই যৌথ অর্জনের মানসিকতাই তাদেরকে সমাজে টিকে থাকতে সাহায্য করে। উপরিল্লিখিত পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতামূলক মনোভাব ও সমবায়মূলক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি সামাজিক পুঁজিরও অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ। নিম্নে মুণ্ডাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিতামূলক মনোভাব ও সমবায়মূলক কর্মকাণ্ডের প্রবণতা আলোচনা করা হলো:

৩.১. পারস্পরিক বিশ্বাস

মুণ্ডারা পরস্পর পরস্পরকে খুব বিশ্বাস করে। বিভিন্ন কাজকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুণ্ডাদের ভিতর পারস্পরিক বিশ্বাসের মাত্রা গভীর বলে অনুমান করা যায়। নিম্নের সারণিতে মুণ্ডাদের ভিতর পারস্পরিক বিশ্বাসের মাত্রা দেখানো হলো।

সারণি ৮
মুণ্ডাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কিত তথ্য

চলক	প্রযোজ্য নয়	জ্ঞাতিদের			অন্যান্য	মোট
		রক্ত সম্পর্কিত	বৈবাহিক সম্পর্কিত	প্রতিবেশী		
জমি বর্গা নেবার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হিসেবে প্রথম বিবেচনা	০ (০)	২৬ (৭৬.৪৭)	৩ (৮.৮২)	৫ (১৪.৭১)	০ (০)	৩৪ (১০০)
ঋণ নেবার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হিসেবে প্রথম বিবেচনা	০ (০)	২ ৪(৭০.৫৯)	৩ (৮.৮২)	৭ (২০.৫৯)	০ (০)	৩৪ (১০০)
নিজের কাজে সাহায্য করতে বা মজুর নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচনা	০ (০)	২৫ (৭৩.৫৩)	১ (২.৯৪)	৮ (২৩.৫৩)	০ (০)	৩৪ (১০০)
বিপদকালীন মুহূর্তে শিশু সন্তানের আশ্রয়দাতা হিসাবে প্রথম বিবেচনা	০ (০)	২৭ (৭৯.৪১)	৩ (৮.৮২)	৪ (১১.৭৭)	০ (০)	৩৪ (১০০)
বিপদকালীন মুহূর্তে সাহায্যের জন্য প্রথম বিবেচনা	০ (০)	২৩(৬৭.৬ ৫)	৩(৮.৮২)	৮(২৩.৫৩)	০(০)	৩৪ (১০০)
গড়	০ (০)	(৭৩.৫৪)	(৭.৬৪)	(১৮.৮২)	০ (০)	৩৪ (১০০)

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ। টীকা : বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

বর্গাচাষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি করে থাকে। মুণ্ডাদের ভিতর শতকরা ৪৭.০৬ ভাগ জমি বর্গা করে থাকে (সারণি ৩)। উল্লেখ্য যে মুণ্ডারা অধিকাংশই ভূমিহীন এবং জমি বর্গা দিতে অক্ষম। সে কারণে তারা মুণ্ডাদের বাইরে থেকে জমি বর্গা নিয়ে থাকে। কিন্তু জোতদারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক না থাকলে বর্গা লাভ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কারো সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায়, এক্ষেত্রে মুণ্ডাদের শতকরা ৭৬.৪৭ ভাগ রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতিদের উপর নির্ভর করে। বৈবাহিক

সম্পর্কিত জ্ঞাতি এবং পাড়া প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করে যথাক্রমে শতকরা ৮.৮২ ও ১৪.৭১ ভাগ। সুতরাং জমি বর্গা পাবার সঙ্গে জ্ঞাতিসম্পর্কের তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে বলা যেতে পারে।

দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঋণ গ্রহণ করা। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে মুণ্ডারা দৈনন্দিক প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরকে ক্ষুদ্রাকারে ঋণ দিয়ে থাকে। যাকে সাধারণ কথায় হাওলাত বলা হয়। জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে হাওলাত দেওয়া ও নেবার ক্ষেত্রে মুণ্ডাদের এক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দেখা যায়, শতকরা ৭০.৫৯ ভাগ মুণ্ডা হাওলাত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতিকে সর্বপ্রথমে বিবেচনা করে থাকে। শতকরা ২০.৫৯ ভাগ মুণ্ডা পাড়া প্রতিবেশীর কথা উল্লেখ করে (সারণি ৮)। উল্লেখ্য যে শতকরা ৫৮.৮২ ভাগ মুণ্ডা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে ঋণ গ্রহণের সঙ্গে জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্পর্ক আছে।

৮ নং সারণিতে লক্ষ করা যায়, শতকরা ৭৩.৫৩ ভাগ মুণ্ডা নিজ কাজে সাহায্য করতে অথবা কাজের জন্য মজুর নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজের রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতিদের পছন্দ করে। পাড়া প্রতিবেশীদের কথা বিবেচনা করে শতকরা ২৩.৫৩ ভাগ মুণ্ডা। শতকরা ২.৯৪ ভাগ উত্তরদাতা বৈবাহিক জ্ঞাতির কথা উল্লেখ করেছেন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মুণ্ডারা বিভিন্ন কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, যার বিনিময়ে তারা কোনো মজুরি গ্রহণ করে না। মজুর নিয়োগের অর্থ হলো নিজের কাজ সম্পাদন করা এবং মজুরের কর্মসংস্থান করা। উভয় ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের বিবেচনার শতকরা হারের আলোকে তাদের পারস্পরিক বিশ্বাসকে তাৎপর্যপূর্ণ বলা যেতে পারে।

৮ নং সারণি থেকে দেখা যায়, বিপৎকালীন মুহূর্তে শতকরা ৭৯.৪১ ভাগ মুণ্ডা তাদের শিশু সন্তানকে রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতিদের নিকট রেখে যান। শতকরা ৮.৮২ ও ১১.৭৭ ভাগ উত্তরদাতা এক্ষেত্রে যথাক্রমে বৈবাহিক জ্ঞাতি এবং পাড়া-প্রতিবেশীর কথা উল্লেখ করেন। প্রত্যেক পিতা-মাতার কাছে তার শিশু সন্তান সবচেয়ে প্রিয় বলে বিবেচিত। জ্ঞাতিকে শিশুসন্তানের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বিবেচনা করা গভীর বিশ্বাসের পরিচায়ক। সুতরাং শিশুর সামাজিকীকরণ ও সামাজিক শিক্ষায় জ্ঞাতির ভূমিকা উপরোক্ত তথ্যের আলোকে বিচার করা যেতে পারে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, শিশুর সামাজিকীকরণে ও সামাজিক শিক্ষা, যেমন–ধর্মীয় শিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রভৃতিতে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রভাব রয়েছে।

মানুষ সামাজিক জীব। অপরের সাহায্য ছাড়া তাই কেউ চলতে পারে না। বলা হয়, বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা হয়। বিপৎকালীন সময়ে শতকরা ৬৭.৬৫ ভাগ উত্তরদাতা সাহায্যের জন্য রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতিদের বিবেচনা করে। বৈবাহিক জ্ঞাতি ও পাড়া-প্রতিবেশীদের কথা উল্লেখ করেন যথাক্রমে শতকরা ৮.৮২ ও ২৩.৫৩ ভাগ মুণ্ডা (৮ নং সারণি)। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মুণ্ডারা সবাই বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করে থাকে। এক্ষেত্রে রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতিরা বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপর্যুক্ত তথ্যাবলি বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, মুণ্ডাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি গভীর বিশ্বাস রয়েছে, যা তাদের জ্ঞাতিসম্পর্কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গড়ে রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতিদের প্রতি শতকরা ৭৩.৫৪ ভাগ, বৈবাহিক জ্ঞাতিদের প্রতি শতকরা ৭.৬৪ ভাগ এবং পাড়া প্রতিবেশীদের প্রতি শতকরা ১৮.৮২ ভাগ মুণ্ডা বিভিন্ন কাজকর্মে গভীর বিশ্বাস করে, যা তাদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব ফেলে।

৩.২. সহযোগিতামূলক মনোভাব

পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া সমাজে টিকে থাকা যায় না। সহযোগিতার মাত্রা সমাজভেদে ভিন্নতা দেখা গেলেও পরস্পরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও নৈকট্য থেকে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে।

যে কোনো সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিপ্রকৃতি সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। মুণ্ডা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীতে সহযোগিতামূলক মনোভাবের মাত্রা এবং কি কি বিষয় সহযোগিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি ৯

মুণ্ডাদের সহযোগিতামূলক মনোভাব সম্পর্কিত তথ্য

চলক	জ্ঞাতি	প্রতিবেশী	অন্যান্য	মোট
কৃষিকাজের বিভিন্ন উপকরণাদি কাদের কাছ থেকে বেশি সাহায্য পান।	২৮ (৮২.৩৫)	৬ (১৭.৬৫)	০ (০)	৩৪ (১০০)
বিভিন্ন কাজকর্মে কাদের পরামর্শ নিয়ে থাকেন।	২৫ (৭৩.৫৩)	৭ (১১.৭৬)	২ (৫.৮৮)	৩৪ (১০০)
মৃতের সৎকারে কাদের সাহায্য নিয়ে থাকেন।	২৮ (৮২.৩৫)	৬ (১৭.৬৫)	০ (০)	৩৪ (১০০)
বিবাহ অনুষ্ঠানে কারা সবসময় সাহায্য করে।	৩০ (৮৮.২৪)	৪ (১১.৭৬)	০ (০)	৩৪ (১০০)
সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কারা বেশি সাহায্য করে।	২৮ (৮২.৩৫)	৬ (১৭.৬৫)	০ (০)	৩৪ (১০০)
গড়	(৮১.৭৬)	(১৭.০৬)	(০)	(১০০)

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

টীকা : বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

উল্লিখিত সারণি থেকে দেখা যায়, শতকরা ৮২.৩৫ ভাগ উত্তরদাতা জ্ঞাতিদের কাছ থেকে কৃষি কাজের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করে থাকে। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজন হয় বলদ, লাঙল, জোয়াল, মই, কাস্তে ইত্যাদি উপকরণের। গবেষণা এলাকা কৃষিনির্ভর হওয়ায় মুণ্ডাদের ভিতর এই সকল উপকরণে পারস্পরিক লেনদেন রয়েছে, যা তাদের কৃষিকাজে প্রভূত সহায়তা করে থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মুণ্ডাদের ভিতর কৃষি উপকরণাদি এককভাবে সরবরাহ করার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবার কম আছে। সুতরাং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক আছে তা বলা যেতে পারে। এছাড়া ফসল উৎপাদন, চাষ-আবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সব মানুষের সমান থাকে না। এজন্য অদক্ষ ও নবীন কৃষকদের অভিজ্ঞ ও দক্ষ কৃষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। মুণ্ডারা সাধারণত অশিক্ষিত হওয়ায় এবং আধুনিক চাষপদ্ধতিতে অভ্যস্ত না হওয়ায় শতকরা ৭৩.৫৩ ভাগ (সারণি-৯) উত্তরদাতাকে জ্ঞাতিদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে দেখা যায়। শতকরা ২০.৫৯ ভাগ মুণ্ডা প্রতিবেশীর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে থাকে। সুতরাং পরামর্শ দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গে জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্পর্ক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

মৃত ব্যক্তির সৎকার প্রক্রিয়ায় মুণ্ডাদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াও তাৎপর্যপূর্ণ। পর্যবেক্ষণে লক্ষ করা গেছে, মুণ্ডারা তাদের নিজ সম্প্রদায়ের মৃত ব্যক্তির সৎকারে অর্থ , শ্রম ও সময় ব্যয় করে থাকে। ৯ নং সারণি থেকে দেখা যায়, শতকরা ৮২.৩৫ ভাগ মুণ্ডা মৃতের সৎকারে রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতির সাহায্য নিয়ে থাকেন। অবশ্য ১৭.৬৫ ভাগ উত্তরদাতা জ্ঞাতি বহির্ভূত প্রতিবেশীর কথা উল্লেখ করে। সাধারণত লক্ষ করা যায়, মৃতের সৎকার এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য এককালীন বেশ অর্থ খরচ করতে হয়, কিন্তু মুণ্ডাদের ভিতর পরস্পরকে সহযোগিতা করার মনোভাব তাদের হঠাৎ বিপদ থেকে উদ্ধার করে। মুণ্ডাদের জীবনে অপর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিবাহ যা বেশ জাঁকজমক ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মুণ্ডাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। সে কারণে বিবাহ বাবদ মোটা অংশের অর্থ খরচ অসঙ্গত নয়। মেয়ের বা ছেলের বিবাহের খরচ মেটাতে জমি বা মূল্যবান সম্পদ বিক্রি করা গ্রামীণ বাংলার এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মুণ্ডাদের ভিতর বিবাহ সম্পর্কিত খরচ খুবই সামান্য। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, প্রত্যেক মুণ্ডা বিবাহের সময় প্রত্যেককে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে। গবেষণায় প্রাপ্ত

ফলাফলে দেখা যায়, শতকরা ৮৮.২৪ ভাগ মুণ্ডা মনে করে বিবাহে জ্ঞাতিরা সবসময় সার্বিকভাবে সাহায্য করে থাকে, যেক্ষেত্রে জ্ঞাতি বহির্ভূত প্রতিবেশীদের হার শতকরা ১১.৭৬ ভাগ।

সাধারণত দেখা যায়, সমাজের প্রত্যেকটি সদস্যকে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ভিত শক্ত হয়ে ওঠে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মুণ্ডাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য (যেমন-জন্মানুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি) অর্থ খরচের প্রশ্ন জড়িত থাকে। পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায়, এ সকল সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন করা মুণ্ডাদের এক ধরনের সামাজিক দায়িত্ব বা সামাজিক আইন। সুতরাং দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জন্য এসব অনুষ্ঠান পালন করা ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। মুণ্ডারা এ ধরনের অনুষ্ঠানে পরস্পরকে সব রকমের সাহায্য দিয়ে থাকে, যে কারণে অর্থ খরচের ব্যাপারটি তারা সহজে অনুধাবন করতে পারে না। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় শতকরা ৮২.৩৫ এবং ১৭.৬৫ ভাগ উত্তরদাতা মনে করে, এ সকল অনুষ্ঠানে যথাক্রমে জ্ঞাতি ও জ্ঞাতি বহির্ভূত প্রতিবেশীরা সাহায্য করে থাকে, যা উপরোক্ত যুক্তির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উপরোক্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুণ্ডাদের ভিতর সহযোগিতামূলক মনোভাব খুবই দৃঢ়, যা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে থাকে। মুণ্ডাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবের গড় যথাক্রমে ৮১.৭৬% জ্ঞাতি, ১৭.০৬% জ্ঞাতি বহির্ভূত প্রতিবেশী এবং ১.১৮% অন্যান্যদের পক্ষে। বিশ্বাস, সহযোগী মনোভাব থাকার ফলে মানুষের মধ্যে সমবায় প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ তাত্ত্বিক যুক্তির সত্যতা মুণ্ডা সমাজে বিদ্যমান কিনা তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

৩.৩. সমবায় প্রবণতা

বিশ্বাসের ভিত্তিতে সহযোগিতা আর সহযোগিতার কারণে উভয়ের মধ্যে সমবায় প্রবণতা গড়ে ওঠে, এর ফলে সমাজের কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের চেয়ে বরং প্রত্যেকের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষা করা হয়। কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য সমবেত প্রচেষ্টা নেওয়া হলো, তারপর বন্ধ হয়ে গেল, সমবায় প্রবণতা সে ধরনের প্রত্যয় নয় বরং একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যাতে প্রত্যেক সদস্য উপকৃত হয় এবং প্রত্যেক সদস্যের তথা সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থ রক্ষা করা হয়। মুণ্ডাদের ভিতর সমবায় প্রবণতার ধরন নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি ১০

মুণ্ডাদের সমবায় প্রবণতার ধরন সম্পর্কিত তথ্য

চলক	প্রযোজ্য নয়	হ্যাঁ			মোট
		জ্ঞাতিদের	জ্ঞাতি বহির্ভূত প্রতিবেশীদের	অন্যান্য	
শাক-সবজি, ফলমূল, শিকার করা প্রাণী প্রভৃতি বিতরণ করেন কিনা।	১ (২.৯৪)	১৫ (৪৪.১২)	১৮ (৫২.৯৪)	০ (০)	৩৪ (১০০)
বিবাহ অনুষ্ঠানে উপহার পাঠান কিনা	০(০)	২ (৫.৮৮)	৩২ (৯৪.১২)	০ (০)	৩৪ (১০০)
কৃষিকাজ, শিকার করা, মজুর প্রভৃতি একই সাথে করেন কিনা।	০ (০)	১৭ (৫০)	১৪ (৪১.১৮)	৩ (৮.৮২)	৩৪ (১০০)
ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে খাদ্য, পানীয় বিতরণ করেন কিনা।	০ (০)	২৫ (৭৩.৫৩)	৯ (২৬.৪৭)	০ (০)	৩৪ (১০০)
দ্বন্দ্ব-সংঘাত মীমাংসায় অংশ নেন কি না।	০ (০)	২৭ (৭৯.৪১)	৭ (২০.৫৯)	০ (০)	৩৪ (১০০)
গড়	(০.৫৯)	(৫০.৫৯)	(৪৭.০৬)	(১.৭৬)	(১০০)

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ

উপরের সারণি থেকে মুণ্ডাদের মধ্যে সমবায় প্রবণতার একটি ধারণা পাওয়া যায়। তারা বাড়িতে বিভিন্ন শাক-সবজি, ফলমূল উৎপাদন করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন পশুপাখি শিকার করা তাদের অভ্যাস। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এ সকল জিনিস তারা নগদ অর্থে বিক্রি না করে জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করে। শতকরা ৪৪.১২ ও ৫২.৯৪ ভাগ মুণ্ডা যথাক্রমে জ্ঞাতি এবং জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীর মধ্যে তাদের শিকার করা প্রাণী ও উৎপাদন করা সামগ্রী বিতরণ করে বলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায়। বিবাহ অনুষ্ঠানে উপহার প্রদান অনেক সমাজে অনুপস্থিত। তাই বিবাহের সময় অভিভাবক বেশ বিপদে পড়ে যায়। মুণ্ডাদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শতকরা ৯৪.১২ ভাগ উত্তরদাতা জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশীর বিবাহ অনুষ্ঠানে উপহার দান করে। মাত্র ৫.৮৮ ভাগ উত্তরদাতা শুধুমাত্র জ্ঞাতির বিবাহ অনুষ্ঠানে উপহার দান করে বলে তথ্যে পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিবাহ অনুষ্ঠানে (মুণ্ডা ভাষায় চুমান অনুষ্ঠান) উপহার প্রদান মুণ্ডাদের এক সামাজিক আইনে পরিণত হয়েছে, যে সকল উপহার সামগ্রী নিয়ে কনে শ্বশুরবাড়ি গমন করে। সুতরাং সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে রক্ষা করা মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর তাৎপর্যময় সামাজিক মূল্যবোধ।

দারিদ্র্যের কারণে সমাজের জটিলতা যেমন বেড়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ। তাই মানুষ নিজের সুবিধামতো বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। কিন্তু ১০ নং সারণিতে দেখা যায় কৃষিকাজ, শিকার করা, মজুর হিসাবে শতকরা ৫০ ভাগ মুণ্ডা জ্ঞাতিদের সঙ্গে একত্রে কাজ করে, যেক্ষেত্রে জ্ঞাতি ও জ্ঞাতি বহির্ভূত প্রতিবেশীর সঙ্গে কাজ করে শতকরা ৪১.১৮ ভাগ। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মুণ্ডারা প্রতিবেশীদের জ্ঞাতি মনে করে এবং যেসব গোত্র আকারে ক্ষুদ্র তারা প্রতিবেশীদের সঙ্গে কাজ করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খাদ্য সামগ্রী মুণ্ডা পরিবারগুলো শুধু নিজেরা একাই ভোগ করে না। শতকরা ৭৩.৫৩ ভাগ এবং ২৬.৪৭ ভাগ উত্তরদাতা যথাক্রমে জ্ঞাতি এবং জ্ঞাতি ও জ্ঞাতি বহির্ভূত প্রতিবেশীদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে (সারণি ১০)। আধুনিক যুগে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনে যখন সমবায় প্রচেষ্টা ভেঙে যাচ্ছে, তখন মুণ্ডাদের মধ্যে এ প্রবণতা তাদের গভীর সামাজিক প্রথা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

প্রত্যেক সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্বাভাবিক ঘটনা। অনেক সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘাত নিয়ে থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারি প্রভৃতির শরণাপন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটে। মুণ্ডা জনগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত কখনও সে পর্যন্ত পৌঁছায় না। সাধারণত মুণ্ডারা সকলে মিলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মীমাংসা করে থাকে। পর্যবেক্ষণে আরো দেখা যায়, কখনও কোনো মুণ্ডা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ধারাবহিকতা ধরে রাখার চেষ্টা করেনি। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, শতকরা ৭৯.৪১ ভাগ মুণ্ডা জ্ঞাতিদের এবং শতকরা ২০.৫৯ ভাগ জ্ঞাতি ও জ্ঞাতি বহির্ভূত প্রতিবেশীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে ভূমিকা রাখে। দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অস্থিতিশীল সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনেক পরিবারকে নিঃস্ব করে দিতে পারে। সেদিক থেকে মুণ্ডাদের সমবেত প্রচেষ্টা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুণ্ডাদের মধ্যে সমবেত প্রচেষ্টা বা সমবায় প্রবণতার ধরন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গড়ে শতকরা ৫০.৫৯ ও ৪৭.০৬ ভাগ উত্তরদাতা সমবায়মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, যা মুণ্ডাদের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিশেষে, বলা যায় যে মুণ্ডা সমাজে বিরাজমান পারস্পরিক সম্পর্ক ও আস্থা এবং সামাজিক রীতিনীতি তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক, আস্থা ও সামাজিক রীতিনীতি মুণ্ডাদের একত্রিত করে রাখে এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলে, যা মুণ্ডাদের সমবায়মূলক কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। মূলত এই সকল উপাদানসমূহ পুঁজির ন্যায় মুণ্ডা সম্প্রদায়ের উন্নতি, অগ্রগতি ও টিকে থাকতে

তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেই কারণে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের জ্ঞাতিসম্পর্ককে সামাজিক পুঁজি অভিধায় চিহ্নিত করা যায়।

৩. উপসংহার

মুণ্ডাদের জ্ঞাতিসম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং সমবায় প্রবণতার যে দৃঢ়তা রয়েছে, তা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, যেমন-৩ নং সারণি অনুযায়ী মুণ্ডারা প্রতিদিন প্রত্যেক সদস্যের পিছনে খরচ করে মাত্র ১১.৩৮ টাকা, অর্থাৎ প্রতিদিন পরিবার প্রতি খরচ পড়ে প্রায় ৫১ টাকা। কিন্তু, মুণ্ডাদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মোট খরচের হিসাব, পোশাক-পরিচ্ছদ, আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র প্রভৃতিকে ধরলে মাসিক খরচের হিসাব অনেক বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত এই খরচ মুণ্ডারা সাধারণত অনুভব করতে পারে না । কারণ এই অতিরিক্ত খরচের জন্য তাদের কোনো ঋণ পরিশোধ করতে হয় না, বরং মুণ্ডাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিতামূলক মনোভাব ও সমবায় প্রবণতার মাধ্যমে যে সামাজিক সম্পর্কের জাল তৈরি, তারই মধ্যে লুকিয়ে থাকে এই সব অতিরিক্ত খরচ। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও আলোচনা থেকে তিনটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। যথা:

ক. জ্ঞাতিসম্পর্কের সঙ্গে মুণ্ডাদের বিশ্বাস, সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং সমবায় প্রবণতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত;

খ. বিশ্বাস, সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং সমবায় প্রবণতা মুণ্ডাদের অর্থনৈতিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; এবং

গ. জ্ঞাতিসম্পর্ক মুণ্ডাদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

1561 ISSN -798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় রাজশাহীর সাঁওতাল সম্প্রদায়

শাহানা কায়েস*

Abstract : This paper aims at reviewing some of the cultural changes of the Santal community of Rajshahi. The tribes in Bangladesh today, is under turmoil and transition. So, the transformation of Santal culture faces a good deal of opposition, conflict, and disbelief due to many socio-economic and political factors. Here, this study from the anthropological point of view is an attempt to understand the agents of all these social changes; along with the interaction of tradition and modernization.

ভূমিকা

পৃথিবীর সব দেশের মতো বাংলাদেশেও আদিবাসীরা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরেও বিদ্যমান। কোরেশী (Qureshi eds. 1984:XV) এদেশে ৩১টি আদিবাসীর অস্তিত্ব উল্লেখ করলেও আদমশুমারির রিপোর্টে (BBS, 1991) ২৭টি আদিবাসীর কথা বলা হয়েছে। বাংলায় এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী', 'বনবাসী', 'পাহাড়ি' বা 'জংলি' নামে অভিহিত করা হলেও (Ali, 1989:2) সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানীরা (যেমন-চৌধুরী ২০০০:১৯, Karim 2000, 2001, Hossain 2000) এ জাতীয় শব্দগুলি মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ তথা বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় সেসব পরিহার করে 'নৃগোষ্ঠী' (Ethnic group) শব্দটি ব্যবহার করছেন (সুলতানা, ২০০২:১৮)।

বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার যে অংশকে বরেন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়, সেখানে ওঁরাও, রাজবংশী, হো, মুণ্ডা, পাহাড়িয়া, মাহালি, কোচ, পালিয়া প্রভৃতি আদিবাসীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে সাঁওতাল সম্প্রদায়।

প্রাচীন ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব প্রদেশের উত্তরের উঁচু অংশকে বলা হতো বরেন্দ্র অঞ্চল। বর্তমানে এর বিস্তার বাংলাদেশে ৭০ ভাগ এবং ভারতে ৩০ ভাগ বলে বিবেচিত হলেও (Ali, 1989:35) ভারতবর্ষের আদি সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নানাবিধ ঐতিহাসিক পরম্পরায় তাদের বসতি ক্রমাগত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এই অভিবাসন (migration) এর উল্লেখ পাওয়া যায় Dalton এর পর্যবেক্ষণে। তিনি বলেন, "...in a strip of Bengal, extending for about 350 miles from the Ganges to the Baitarni, bisected by the meridian of Bhagalpur or 87° east longitude... " (Dalton, 1872:207)।

Bessaignet উল্লেখ করেছেন, সাঁওতাল গোষ্ঠী ঐতিহাসিক কালের প্রারম্ভেই মধ্য ও পূর্ব ভারতের ছোট নাগপুর উপত্যকা ও তার আশেপাশের বাঁকুরা, বীরভূম, রাজমহল, দামন-ই-কোহ (বর্তমান সাঁওতাল পরগণা) প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং বসতি গড়ে তোলে (Bessaignet, 1960:152)।

তবে কখন, কিভাবে তারা এই উপমহাদেশে এসেছিল সে বিষয়ে নৃ-বিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের মধ্যে নানা মত বিদ্যমান থাকলেও (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Flood,

* প্রভাষক, এগ্রোনোমী অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

1974, Siddiquee, 1987, সমাদ্দার, ১৯৯২, Dalton 1872, Hunter 1868) সকলই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে সুদূর অতীতে সাঁওতালরা বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষে তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল। সাঁওতালদের আত্মপরিচয় সম্পর্কিত একটি বহুল প্রচলিত লোক কাহিনী থেকেও নৃ-বিজ্ঞানীদের উক্ত মতের সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। (দেখুন Hunter 1868:147-155, Dalton 1872:209-211, Datta-Majumder, 1956:2-5, Grierson, 1906:30, Orans, 1965:5)।

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সাঁওতালরা অবর্ণনীয় খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয় তাদের অনেকেই সাঁওতাল পরগণায় থাকা নিরাপদ মনে না করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। খাদ্য ও কাজের সন্ধানে বহু পরিবার বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে (Mallick, 1993:133-138)। বাংলাদেশের সাঁওতালদের অধিকাংশই ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা থেকে এসেছে (Bessaignet, 1960:152-7)। তাদের আদি বাসস্থান সাঁওতাল পরগণার সাথে বরেন্দ্র এলাকার ভূ-প্রকৃতিগত মিল থাকায় এবং জনবসতিহীন জঙ্গলময় পতিত অনুর্বর জমি চাষোপযোগী করে জীবিকা নির্বাহ তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সহজতর হওয়ায় তারা বরেন্দ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে বসতি গড়ে তোলে (Carter, 1928:02 উদ্ধৃতি Ali, 1989)। সম্ভবত রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকা এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই একদা সাঁওতাল গোষ্ঠীর নতুন আবাসস্থল হয়ে ওঠে।

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাঁওতালরা আদি-অস্ট্রালয়েড (Proto Australoid) গোষ্ঠীর লোক। Risley সাঁওতালদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন-"Their complexion varies from very dark brown to peculiar, almost charcoal like, black, the proportions of nose approach those of Negro, the bridge being the depressed .... the hair coarse, black and occasionally curly" (Risley, 1915:441)। সাঁওতালদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে Dalton বলেন, "Their faces are almost round; cheekbones moderately prominent; eyes full and straight, not obliquely set in the head; nose, if at all prominent, of somewhat a retroussee style, but generally broad and depressed, mouth large and lips very full and projecting; hair straight and coarse and black". (Dalton, 1872:212). বাংলাদেশে বসবাসকারী সাঁওতালদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যও এই দুই প্রধান গবেষকের পর্যবেক্ষণের অনুরূপ বলে বিবেচিত হয়।

বর্তমান গবেষণা সূত্রে জানা যায় যে, বেশির ভাগ আদিবাসীই গোত্র প্রথা ও টোটেমবাদে বিশ্বাসী। উল্লেখ্য সাঁওতালরা ১২টি গোত্রে বিভক্ত। কিন্তু গোত্রের সাথে সংযুক্ত 'পেশার' (দ্রষ্টব্য সারণি-৪) অবলুপ্তির পর এরা এখন প্রধানত কৃষিজীবী। এই পরিবর্তনের সঙ্গে হিন্দুধর্ম এবং পরবর্তীতে খ্রিস্টীয় মিশনারিদের তৎপরতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্দোলন, বিদ্রোহ, ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি, স্থানীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান তথা বর্তমান বিশ্বায়ন সাঁওতালদের চিরায়ত জীবনযাপন পদ্ধতি ও মনোজগৎকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে ও করছে।

এ প্রসঙ্গে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সাঁওতাল জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত এসব বিষয় 'সংস্কৃতি' নামক এক বৃহত্তর নৃতাত্ত্বিক প্রত্যয়গত পরিমণ্ডলের আওতাভুক্ত। Kluckhohn মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে 'সংস্কৃতি' বলেছেন (Kluckhohn, 1949:17, উদ্ধৃতি: আলি, ১৯৯২:১৩৭)। 'সংস্কৃতি' কখনোই কোন স্থির সত্তা নয় (Herskovits, 1955:443, উদ্ধৃতি: Ali, 1989:2)। পরিবর্তন সকল সংস্কৃতিরই সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য (Haviland, 1983:406)। সেজন্য বর্তমান নিবন্ধে প্রধানত এই পরিবর্তনের ধারাকেই চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে 'সংস্কৃত্যায়ন' (Acculturation) নামক নৃতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের উপর এখানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। Haviland 'সংস্কৃত্যায়ন' প্রসঙ্গে বলেন: Acculturation results when groups of individuals having different cultures come into intensive firsthand contact, with subsequent massive changes in the original culture patterns of one or both groups

(পূর্বোক্ত, 1983:414)। যদিও মনে করা হয় যে, সংস্কৃত্যায়ন প্রক্রিয়ার ফলে উভয় সমাজেই পরিবর্তন আসে, তথাপি বাস্তবে দেখা যায় যে, 'প্রভাবশালী' বা 'উন্নত সংস্কৃতির' (Dominant culture) প্রভাবই অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অনুন্নত সংস্কৃতিতে পড়ে। বস্তুত, এই তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Anthropological method) প্রয়োগ করা হয়েছে। ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মতোই (Morgan, 1877; Malinowski, 1922; Radcliffe Brown, 1922; Boas, 1920; Margaret Mead, 1925; Ruth Benedict, 1934; Bertocci, 1970; Arens and Beurden, Chowdhury, 1978; Karim, 1990) 1980; মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Participant observation) ব্যবহৃত হয়েছে। এটাই নৃতাত্ত্বিক গবেষণার প্রকৃত পদ্ধতি। প্রত্যক্ষ ও অংশগ্রহণ পদ্ধতি শুরু হয় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময়ে তখন যে ক্রিয়াকলাপ ও ঘটনা ঘটে তা পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে,(Tiffany, 1956:67) এবং এই ধরনের পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধকরণ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে বিবেচিত হয় (Karim, 1990:4)। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময়সীমা ছিল ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত। এছাড়া, গবেষণায় অন্যান্য কৌশল যেমন-গ্রামগুলির পটভূমি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ (General background data), গৃহ/পরিবার জরিপ (Household survey), কাঠামোবদ্ধ ও অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Structured/unstructured interview) প্রধান তথ্যদাতার বিবরণ (Key informants), ঘটনা পঠন (Case study) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষণাধীন গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি

বর্তমান গবেষণাধীন গ্রামগুলি (খেতুর মধুমাঠ ও বিলাসী) রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানাভুক্ত। তিনটি গ্রামেই হিন্দু, মুসলমান ও বিভিন্ন আদিবাসীদের পাশাপাশি সাঁওতালরাও বাস করে। রাজশাহী সদর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে প্রেমতলী, এই প্রেমতলীর ২ কিলোমিটার উত্তরে খেতুর এবং খেতুর থেকে মধুমাঠ ও বিলাসী গ্রাম দুটি যথাক্রমে ৯ কিলোমিটার উত্তরে ও ৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

তিনটি গ্রামের ৬৫% পরিবারই এককক্ষ বিশিষ্ট গৃহে বসবাস করে। ৯৬.৮৮% পরিবারের রান্নাঘর এবং ৯৬.৬২% পরিবারের গোয়ালঘর নেই। খেতুরে (৭৬.৬৭%), মধুমাঠে (৭৯.৩১%) এবং বিলাসী গ্রামে (৯৩.০২%) পরিবারের নিজস্ব বসতবাড়ির জমি আছে। অবশিষ্ট পরিবার সরকারি খাস জমি ও অন্যের জায়গায় বসবাস করছে। খেতুর মধুমাঠ ও বিলাসী গ্রামের শিক্ষার হার যথাক্রমে ১৫.৩%, ১৪.২% এবং ১৪.৮%। শিক্ষা বলতে এখানে মূলত প্রাথমিক শিক্ষার কথাই বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য, খেতুরে কেবল একজন দশম শ্রেণী পাশ, বিলাসীতে শুধু একজন বি.এ. পাশ এবং মধুমাঠে মাত্র একজন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ লোক রয়েছে। তিনটি গ্রামে ২৪.৩৮% পরিবারের নিজস্ব জমি আছে এবং ৭৫.৬৩% পরিবার ভূমিহীন। জমি বর্গা নিয়েছে এমন পরিবারের হার খেতুর গ্রামে ৩৬.৬৭%, মধুমাঠে ৩২.১৮% এবং বিলাসীতে ৩০.২৩%। ভূমিহীন সাঁওতালরা মুখ্যত কৃষি শ্রমিক এবং দিনমজুর হিসাবে কাজ করে। শস্য বপন এবং কর্তনের সময়ে দিনমজুরির হার ৩৫-৪০ টাকা; কিন্তু 'কর্মহীন' সময়ে এই মজুরি নেমে আসে ১৫-২০ টাকায়। এছাড়া বিলাসী গ্রামে একজন স্কুল শিক্ষক এবং মধুমাঠ গ্রামে একজন স্কুল শিক্ষক, একজন দরজি এবং একজন দোকানদার রয়েছে। খেতুর, মধুমাঠ এবং বিলাসী গ্রামে যথাক্রমে ৪টি, ১১টি এবং ৩২টি পরিবার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

ঘর ও গৃহস্থালি

তিনটি গ্রামেরই সাঁওতাল পরিবারগুলি এককক্ষ বিশিষ্ট গৃহে বাস করে। ঘরের সঙ্গে একটি বারান্দা ও একটি-দু'টি ছোট জানালা রয়েছে। ছেলেরা বড় হলে বারান্দায় ঘুমায়, আর মেয়েদের জন্য চট

ঝুলিয়ে বা মাটির দেয়াল তুলে দু'টি কক্ষে বিভক্ত করা হয়। বারান্দার সামনে খোলা আঙিনাতেই তারা রান্না করে। এক মুখো চুলোর চাইতে একাধিক মুখবিশিষ্ট চুলোই তাদের অধিকতর পছন্দ। গৃহপালিত প্রাণীগুলো নিম-বাবলা গাছের ছায়ায় থাকে এবং রাতে থাকে ঘরের আঙিনায়। প্রতিটি বাড়িতে ঘুমানোর জন্য ২/৩টি পাটি এবং দড়ির খাটিয়া দেখা গেছে। বসার জন্য টুল বা পিঁড়ি রয়েছে। তারা মাটির সানকিতে ভাত খেলেও তাদের ঘরে যৎসামান্য কাঁসার ও অ্যালুমিনিয়ামের থালা-বাসন দেখা গেছে। শিকারের সরঞ্জামের মধ্যে তীর-ধনুক ও টোটা প্রায় সব বাড়িতেই আছে।

পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে ক্ষেতের জমিতে কাজ করে। তবে লাঙল চালানো পুরুষদের একচেটিয়া কাজ হওয়ায় মেয়েরা মূলত ধান রোপণ ও ধান তোলার কাজে নিয়োজিত থাকে। পানির জন্য সাঁওতালরা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বরেন্দ্র প্রকল্পে গভীর নলকূপ প্রচলিত হলেও গরিব সাঁওতালরা তার সামান্য সুবিধাই ভোগ করছে।

কৃষিকাজের জন্য এখনও তারা লাঙল ও মই ব্যবহার করে। আগাছা নিড়ানোর জন্য দাউলি এবং ধান কাটার জন্য হাসিয়া বা কাচিয়া ব্যবহৃত হয়। তারা গরুর গোবর দিয়ে তৈরি 'পাওস' সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সারও ব্যবহার করতে শুরু করেছে। সাঁওতালদের বাড়িতে গাছের ডাল-পাতাই প্রধান জ্বালানি। রাতে তারা কুপি জ্বালায়। অল্প সংখ্যক বাড়িতে হারিকেন থাকলেও তিনটি গ্রামের মধ্যে মাত্র একটি বাড়িতে রয়েছে টর্চ লাইট।

খাদ্যাভ্যাস

সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত। এরা ভাতের মাড় ফেলে না। দেখা গেছে, আমিষ খাদ্য সংক্রান্ত নিষিদ্ধ প্রথা (Taboo) অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। মাঝে মাঝে এরা মেঠো ইঁদুর শিকার করে তার মাংস খায়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় নৃতাত্ত্বিক লেখক আব্দুস সাত্তারের মতে, সাঁওতালদের প্রিয় খাদ্য তালিকায় রয়েছে কাঠবিড়ালী, গুঁই সাপ, লাল পিঁপড়া ইত্যাদি (সাত্তার, ১৯৬৬:২৯২)। সাঁওতালরা নিজেরাই হাড়িয়া বা ভাত পচানো মদ প্রস্তুত করে। খেতুরের দিনমজুর সফল মারান্ডি (৩৭) বলেন, গত বছরে তার হাড়িয়া তৈরিতে ৪ কেজি চাউল খরচ হয়েছে। কিন্তু বিলাসীর অবস্থাপন্ন সাঁওতাল কৃষক শিলু সরেন (৫১) বলেন, ঐ একই বছর হাড়িয়া তৈরিতে তার খরচ হয়েছে ১৭ কেজি চাউল। এর সাথে পুরুষেরা বিড়ি, সিগারেট, তাড়ি, পাঁচন ও পান সেবন করে; সাঁওতাল মেয়েরাও হাড়িয়া ও ধূমপানে অভ্যস্ত।

পোশাক-পরিচ্ছদ

প্রাচীনকালে পুরুষদের ব্যবহৃত 'লেঙ্গুট', বর্তমানে কেবলমাত্র প্রবীণ সাঁওতালরাই চেনে। কোথাও যেতে হলে তারা শরীরের উর্ধ্বাংশে ৩×৫ হাত লম্বা এক টুকরো কাপড় তারা জড়াতো (Bodding, 1994: 90)। বর্তমানে বয়স্ক সাঁওতালরা লেংটির মতো ধুতি পরলেও অধিকাংশ সাঁওতাল পুরুষই লুঙ্গি ও শার্ট পরিধান করে। আর মহিলারা ১০ হাত লম্বা একটি আটপৌরে কাপড় কোমরে জড়িয়ে পিঠ ও বুক আবৃত করে রাখতো (পূর্বোক্ত, ১৯৯৪:৯০)। এটাকে তারা পাড়হাঁড় বা পাড়হাও বলে (বাস্কে, ১৯৯৯:১৯১)। কিন্তু বর্তমানে সাঁওতাল মহিলারা বাঙালি মেয়েদের মতোই শাড়ি-ব্লাউজ ও পেটিকোট পরিধান করে। পূর্বে সাঁওতাল মেয়েরা অলংকার পরতে পছন্দ করলেও, ঐতিহ্যবাহী রূপার অলংকারাদি অর্থাৎ গলায় 'মান্দালী', কানে 'দুল', নাকে 'নথ' ও 'মাকাড়ি', সিঁথিতে 'সিথিপাট', হাতে 'বালা' ও 'চুড়ি', বাহুতে 'বাজু', কোমরে 'বিছা' বা 'হাড়াহাড়ি', পায়ে 'বঙ্কি', হস্তাঙ্গুলে 'অঙ্কুরী' এবং পদাঙ্গুলে 'বটরি' ইত্যাদির পরিবর্তে বর্তমানে প্রচলিত ইমিটেশনের নানা সস্তা গয়না ব্যবহারে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।

পূজা-পার্বণ ও ব্রত অনুষ্ঠান

মানব সমাজের সকল আদিবাসীদের মতোই সাঁওতালদের মধ্যেও অলৌকিকতা, যাদুবিদ্যা, আচার-অনুষ্ঠান এবং টোটেমবাদ শুরু থেকেই প্রচলিত রয়েছে। নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা যায়,

এগুলো হলো 'ধর্ম' নামক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাঁওতালদের প্রধান দেবতা 'ঠাকুর', যিনি এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন (Datta Majumder, 1956:47)। এছাড়া, আছে আরো অনেক দেবতা, যাকে তারা বলে বোঙ্গা। এই বোঙ্গাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মারাংবুরু, মংরেংকুটুরুইকু, ওরাক বোঙ্গা, পরগনা বোঙ্গা, সিম বোঙ্গা, চান্দো বোঙ্গা, দা বোঙ্গা, দাদ্দি বোঙ্গা, পাকরি বোঙ্গা, জাহের এরা, গোঁসাঞ এরা, মাঝি বোঙ্গা ইত্যাদি (Hunter, 1868:182-4, Datta Majumder, 1956:48)। সাঁওতালদের বিশ্বাস গ্রামের ও পরিবারের বিবিধ মঙ্গল-অমঙ্গলে রয়েছে এদের প্রভাব। এসব দেবতা ছাড়াও সাঁওতালরা বিভিন্ন অপদেবতায় বিশ্বাসী। এসবের মধ্যে রয়েছে 'অ্যাবগে' (Hunter, 1868:184); রাকা, একাগুড়িয়া বা ঘোরমুহা, কুরিন এবং ভূত (Datta Majumder, 1956:48-49)।

সারণি ১

সাঁওতালী উৎসবের তালিকা

উৎসব	উৎসবের মাস	উপলক্ষ
সোহরাই	ডিসেম্বর-জানুয়ারি (পৌষ-মাঘ)	ফসল কাটা উৎসব
সাকরাট	জানুয়ারি (পৌষ)	শিকার ও পূর্বপুরুষদের উপাসনা
যাত্রা	ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন)	আনন্দ উৎসব
বাহা	ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন)	বসন্ত উৎসব
পাতা	মধ্য এপ্রিল (বৈশাখ)	ধর্মীয় উৎসব
এরক-সিম	জুন (আষাঢ়)	বীজ বপন উৎসব
হারিয়াড সিম	জুলাই (শ্রাবণ)	ধান লাগানো উৎসব
ছাতা	অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক)	ধর্মীয় উৎসব
ইড়ি গুন্দলি	নভেম্বর (কার্তিক)	শস্য উৎসব
হরো	নভেম্বর-ডিসেম্বর (কার্তিক-অগ্রাহায়ণ)	ধান পাকা উৎসব

সূত্র : Hunter, 1868:463

মূলত দেবতাদের আশীর্বাদ কামনা এবং অপদেবতাদের রোষানল থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যই সাঁওতালরা উপরোক্ত পূজা-পার্বণ ও উৎসবাদির আয়োজন করে থাকে। Hunter সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী ১০টি উৎসব সনাক্ত করেছেন (Hunter, 1868:463; দ্রষ্টব্য: সারণি ১)। তবে বাস্কে আরো কিছু উৎসবের কথা বলেছেন। যেমন: সাগ-সিম (পুরাতন বছরকে বিদায় জানানো উৎসব), মাঃ মঁড়ে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার উৎসব), জানথার, দাঁসায়, কারাম (বাস্কে, ১৯৯৯:২১৭) তবে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের মধ্যে কয়েকটি উৎসব এখনও গুরুত্বের সঙ্গে উদযাপন করে থাকে। এছাড়া, প্রতিবেশী হিন্দুদের ভেতর প্রচলিত পূজা-পার্বণ এবং খ্রিস্টান সাঁওতালদের বড়দিনের উৎসব বরেন্দ্র অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নীচে এগুলো বর্ণনা করা হলো।

সোহরাই : এটি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বার্ষিক বড় উৎসব; সারা বছর পরিশ্রমের পর পৌষ মাসে ফসল ঘরে তোলার সময়ে এর আয়োজন করা হয়। পাঁচদিন ধরে এ উৎসব চলে। প্রথম দু'দিন মারাংবুরু ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয় এবং শেষ তিনদিন আমোদ-প্রমোদ করা হয়।

বাহা : বাহা তাদের বর্ষ শুরু উৎসব। 'বাহা' অর্থ ফুল। সাঁওতালরা ফাল্গুন মাস থেকে তাদের বছর গণনা শুরু করে। এই উৎসব অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা ফুল ব্যবহার করে না। এদিনে মেয়েরা রং বেরং-এর শাড়ি পরে, মাথায় ফুল গোঁজে এবং ছেলেরা পরিষ্কার পোশাক পরিচ্ছদ পরে আনন্দে মেতে উঠে। আগে 'বাহা' উৎসবের প্রথম দিনে সাঁওতালরা শিকারে বের হতো। কিন্তু বনজঙ্গল উজাড় হয়ে যাওয়ায় তারা আর শিকারে যায় না। অর্থাৎ এটি মূলত পশু শিকারের সাথে যুক্ত। দুটো উৎসবেরই তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো: নাচ, গান এবং অধিক পরিমাণে হাড়িয়া পান; কিন্তু আর্থিক

অসচ্ছলতার কারণে উৎসবের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা এখন আর আগের মতো যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণ হয় না।

কারাম: এটি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এতে এক স্বতঃস্ফূর্ত সর্বজনীনতা লক্ষ করা যায়। উক্ত উৎসবে উৎসর্গের জন্য প্রধানত বিলোঞ্জা ফুল, আতপ চাল, দূর্বা, তিল ও সিঁদুর ব্যবহৃত হয় (সুলতানা, ২০০২:১৮৬)।

বড়দিন: এটি মূলত সাঁওতাল খ্রিস্টানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২৫শে ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিন উপলক্ষে স্থানীয় গির্জা ঘরে ফাদার প্রার্থনা পরিচালনা করেন। প্রার্থনা শেষে উপস্থিত সকলই কুশলাদি বিনিময় করেন এবং উত্তম আহারের আয়োজন করা হয়। বড়দিনের উৎসবের প্রভাব অন্য সাঁওতালদের মধ্যেও দেখা যায়।

টোটেম ও ট্যাবু (Totem and Taboo)

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে টোটেম ও ট্যাবুর উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাঁওতালরা ১২টি গোত্রে বিভক্ত। যদিও Bodding (1942), Skrefsrud (1871) Dalton (1872), Risley (1891), Campbell (1916), Charulal (1962), Ali (1989) প্রমুখ নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণায় গোত্রের সংখ্যায় কম বেশি দেখা যায়, তথাপি গোত্রগুলি একত্রিত করলে ১২টি গোত্রেরই সন্ধান মিলে (দ্রষ্টব্য: সারণি-২)। এছাড়া, সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী থেকে জানা যায় যে, তাদের আদি পিতা পিলচু হড়ম এবং আদি মাতা পিলচু বুড়ির সাতজোড়া সন্তান-সন্ততি থেকেই সাঁওতালদের বংশোদ্ভব ঘটেছে এবং তখন থেকেই গোত্র বিভাগের সূত্রপাত হয়। হিহিড়ি-পিপিড়ি দ্বীপে অবস্থানকালে তারা সাতটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। যেমন-হাসদা, মুরমু, কিসকু, হেমব্রম, মারান্ডি, সরেন এবং টুডু। সাঁওতালদের মধ্যে একই গোত্রে বিবাহ রীতি (Endogamy) তখন থেকেই নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়। সেখান থেকে তারা যখন সসানবেদায় যায় তখন তাদের মধ্যে আরো পাঁচটি গোত্রের উদ্ভব ঘটে। এসব হচ্ছে বাস্কে, বেসরা, পাউড়িয়া, চোড়ে এবং বেদিয়া। আসলে তাদের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীতেই ১২টি গোত্রের উল্লেখ আছে। গবেষণাধীন তিনটি গ্রামে পাউড়িয়া, চোড়ে এবং বেদিয়া নামক গোত্র তিনটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তবে বেদিয়া গোত্র যে অনেক আগে থেকেই বিলীন হয়ে গেছে তা Datta-Majumder এবং সাত্তারের লেখা থেকে পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য: Datta-Majumder, 1956:40, সাত্তার, ১৯৬৬:২৬৮)।

সারণি ২

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের গোত্র বিন্যাস

ক্র: নং	Bodding 1942	Dalton 1872	Campbell 1916	Risley 1891	Skrefsrud 1871	Charulal 1962	Ali 1989	গবেষক ১৯৯৪
১	হাসদাক	হাসদা	হাসদাক	হাসদা	হাসদা	হাসদাক	হাসদা	হাসদা
২	মুরমু	মুরমু	মুরমু	মুরমু	মুরমু	মুরমু	মুরমু	মুরমু
৩	কিসকু	-	-	-	-	-	কিসকু	কিসকু
৪	হেমব্রম	হেমরো	হেমব্রম	হেমব্রম	হেমরম	হেমব্রম	হেমব্রম	হেমব্রম
৫	মারান্ডি	মারলি	মারান্ডি	মার্ডি	মান্ড্রি	মারনডি	মার্ডি	মারানডি
৬	সরেন	সারেন	সারেন	-	-	-	সরেন	সরেন
৭	টুডু	টুডি	টুডু	-	-	-	টুডু	টুডু
৮	বাস্কে	বাস্কি	বাস্কে	-	বাস্কে	-	বাস্কে	বাস্কে
৯	বেসরা	বেসেরা	বেসরা	-	বেসরা	-	বেসরা	বেসরা
১০	পাউনড়ি	-	পানড়িয়া	পাউড়িয়া	পাউড়িয়া	পাউনড়িয়া	পাউড়িয়া	-
১১	চোড়েন	চোড়াই	চোড়েন	চোড়ে	চোড়ে	চোড়েন	চোড়ে	-
১২	বেদিয়া	খারওয়াড়	-	বিদিয়া	-	গন্ধার	বেদিয়া	-

সারণি ৩

উপগোত্র সংখ্যা

গোত্রের নাম	হাসদা	মুরমু	কিসকু	হেমব্রম	মারান্ডি	সরেন	টুডু	বাস্কে	বেসরা	পাউড়িয়া	চোড়ে	বেদিয়া
উপগোত্রের সংখ্যা	১৫	২৮	১৫	১৮	২৭	২৩	১৯	১৩	১৪	১৩	১৫	-

সূত্র : Campbell, 1916:495-496

সারণি ৪

বৃত্তি বিভাগ

গোত্র	বৃত্তি
হাসদা ও টুডু	লোহার জিনিসপত্র তৈরির কাজ এবং উৎসবে নাকাড়া মাদল প্রভৃতির বাদক
মুরমু	পুরোহিত
কিসকু	রাজ্য শাসক
হেমব্রম	কুমার বা দেওয়ানের কাজ
মারান্ডি	কৃষিকাজ
সরেন	সৈনিক

সূত্র : বাস্কে, ১৯৯৯:১৯৩

সারণি ৫

ধর্মীয় প্রতীক টোটেম (Religious Symbol/Totom)

গোত্রের নাম	ধর্মীয় প্রতীক/টোটেম
হাসদা	হাঁস
কিসকু	শঙ্খচিল
মুরমু	নীল গাই
মারান্ডি	মেরদা নামক ঘাস
হেমব্রম	সুপারী
সরেন	সপ্তর্ষি
বাস্কে	পান্তভাত
বেসরা	বাজপাখি
চোড়ে	গিরগিটি
পাউড়িয়া	পায়রা

সূত্র : বাস্কে, ১৯৯৯:১৯৩

প্রাচীনকালে সাঁওতাল গোত্রসমূহেরর বিভিন্ন কৌলিক বৃত্তি ছিল বলে জানা গেছে (বাস্কে, ১৯৯৯:১৯৩; দ্রষ্টব্য, সারণি-৪)। যতদূর সম্ভব জানা যায়, হিন্দু সমাজ থেকেই এ ধরনের কর্মবিভাগ রীতি তারা গ্রহণ করেছিল (প্রাগুক্ত, ১৯৯৯:১৯৩)। বর্তমানে এ ধরনের কর্মভিত্তিক ব্যবস্থা তাদের ভেতর আর দেখা যায় না। অপর পক্ষে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনযাপনে যে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে তারা তাদের আদিতম বৃত্তিগুলো পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের ৫৭.৫% সাঁওতালই দিনমজুর। দিনমুজরির মাধ্যমে তারা যে সামান্য আয় করে সেটাই তাদের জীবনযাপনের একমাত্র সম্বল। ২.৫% পরিবার অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত থাকলেও অবশিষ্ট ৪০% পরিবার নিজেদের সামান্য জমি অথবা স্বল্প পরিমাণ অন্যের জমি বর্গা নিয়ে যে ফসল ফলায় তাতে তাদের দুবেলা খেয়ে জীবন চলে মাত্র। আসলে তারা কোনো রকম পেটে ভাতে বেঁচে আছে।

সারণি ৫-এ সাঁওতালদের বিভিন্ন গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক/টোটেম চিহ্নের উল্লেখ রয়েছে (বাস্কে, ১৯৯৯:১৯৩)। কোন কোন গোত্রের সাথে ট্যাবুর (Taboo) সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন: হাসদা গোত্র হাঁসের মাংস এবং ডিম খায় না। মারান্ডিরা বর্ষাকালে জন্ম নেওয়া মারান্ডি আগাছা খায় না (সুলতানা, ২০০২:১৬৩)। প্রতিটি গোত্র একাধিক উপগোত্রে বিভক্ত। সাঁওতাল ভাষায় উপগোত্রকে 'খুট' বলা হয়। Campbell-এর মতে মোট খুটের সংখ্যা তিনশত (Campbell, 1916:495-496, দ্রষ্টব্য: সারণি-৩)। উল্লেখ্য এই সংখ্যা অনুযায়ী সাত্তার ও বাস্কে প্রতিটি খুটের নাম সংগ্রহ করেছেন (সাত্তার, ১৯৬৬:২৬৮, বাস্কে, ১৯৯৯:১৯৪-৯৫)। কিন্তু রাজশাহী জেলার বর্তমান গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের কোনটিতেই 'খুট' বা উপগোত্রের সন্ধান মেলেনি। প্রবীণ ব্যক্তিরা টোটেমের কথা জানে, কিন্তু উপগোত্র বা খুটের নাম জানে না। এটি তাদের আদিবাসী বৈশিষ্ট্য বিলুপ্তির লক্ষণ।

জন্ম ও শুদ্ধিকরণ প্রথা

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সাঁওতাল নারীকে নানারকম বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় (বাস্কে, ১৯৯৯:১৯৯)। সাধারণত সাঁওতাল সমাজে একজন ধাত্রী কোনো বিবাহিত মহিলা সন্তান জন্মদানের সময়ে প্রসূতির দেখাশোনাসহ নবজাতকের নাড়ি কাটা ও অন্যান্য তাৎক্ষণিক কাজগুলো করে। পুত্র সন্তান হলে তীরের ফলা দিয়ে এবং কন্যা সন্তান হলে ঝিনুকের খোল দিয়ে নাড়ি ছেদন করা হয়। শিশুর কর্তিত নাড়ি সংশ্লিষ্ট সাঁওতাল পরিবারের ঘরের প্রধান দরজার কাছে পুঁতে রাখা হয়। অপদেবতার অশুভ দৃষ্টি প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য নবজাতকের খাটিয়ার নীচে সবসময় একখণ্ড লোহা রাখা হয়।

সাঁওতাল পরিবারে কোনো শিশুর জন্মের সাথেই সাথেই তারা তাদের গৃহ ও গ্রাম অশুচি হয়েছে বলে ধরে নেয় এবং অশৌচের সময়কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ সেই গৃহে খাওয়া-দাওয়া করে না (Bodding, 1994:23)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ছেলে হলে পাঁচ দিনে এবং মেয়ে হলে তিন দিনে 'জানাম ছাটিয়ার' বা শুদ্ধিকরণ উৎসব হয়। নবজাতকের চুল কাটা হয় এবং সেই চুল গাছের পাতার তৈরি বাটিতে করে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই সময়ে শিশুর নামকরণও করা হয়, যা 'নার্তা' নামে পরিচিত। পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে শিশুর নামকরণ হয়। সাধারণত এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীরা সংশ্লিষ্ট পরিবারের বাড়িতে বেড়াতে আসে; তখন মদ্যপান ও নাচ-গানের আয়োজন করা হয়।

সাঁওতাল সমাজে 'চাচো ছাটিয়ার' নামে আরেকটি উৎসব রয়েছে। এই উৎসবের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই তবে বিয়ের আগেই এটি মূলত পালন করা হয় (পূর্বোক্ত, 1994:25)। তারা বিশ্বাস করে যে, এ অনুষ্ঠান না হলে সমাজ স্বীকৃত আনুষ্ঠানিক বিবাহ এবং শেষকৃত্য হতে পারে না। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল ছেলেটি সামাজিক স্বীকৃতি, অধিকার, কর্তব্য ও সুযোগ সুবিধার ছাড়পত্র পায়। গবেষণাধীন এলাকার সাঁওতালরা 'জানাম ছাটিয়ার' ও 'নার্তা' উৎসবটি খুবই ঘরোয়াভাবে পালন করে। তবে এটি বর্তমানে আর পালিত হয় না। খ্রিস্টান সাঁওতালদের ক্ষেত্রে শিশুর নামকরণ ফাদার করে থাকেন এবং পূর্বপুরুষদের নামের পরিবর্তে তখন খ্রিস্টীয় নাম রাখা হয়।

সন্তান জন্মের সময় সাধারণত বয়স্ক মহিলারাই প্রসূতির দেখাশোনা করে থাকেন। তবে প্রসবকালীন জটিলতা দেখা দিলে ইদানীং তারা স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রসূতিকে নিয়ে যায়। তাদের ভেতর উক্ত সচেতনতা সৃষ্টির মূলে রয়েছে মিশনারিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এককথায়, এই পরিবর্তনগুলোকে আদিবাসী বৈশিষ্ট্য বিলুপ্তির লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বিবাহ

প্রাচীনকালে সাঁওতাল সমাজে নানা ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল। বিবাহকে সাঁওতালি ভাষায় বলা হয় 'বাপলা'। O'Malley, Datta-Majumder এবং বাস্কের মতে সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী বিবাহের সংখ্যা সাতটি (O'Malley, 1913:164, Datta-Majumder, 1956:42-45, বাস্কে, ১৯৯৯:২০১-২০৭) এবং Bhowmik-এর মতে তাদের মধ্যে নয় ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল (Bhowmik, 1971:170)। কিন্তু গবেষণাধীন এলাকায় চার ধরনের বিবাহ প্রথা প্রচলিত।

১. **কিরিঞ বহু বাপলা:** এটি অভিভাবকদের পছন্দ বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিবাহ। বরেন্দ্র এলাকায় উক্ত বিবাহ প্রথা 'ডাঙ্গুয়া বাপলা' নামে পরিচিত।

২. **টুংকি দিপিল বাপলা:** এটি দরিদ্র সাঁওতালদের বিবাহ, যা দীনহীনভাবে কনে পণের (Bride price) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. **ঘরদি জাওয়াই বাপলা:** এটি ঘরজামাই বিবাহ নামে পরিচিত। পুত্র সন্তান নেই এমন পরিবারে সাধারণত এ ধরনের বিবাহ ঘটে থাকে।

৪. **সাঙ্গা বাপলা:** এটি হচ্ছে বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার বিবাহ।

সাঁওতাল সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী নাচ-গান ও পানাহারের ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের খ্রিস্টান সাঁওতালরা বিবাহের প্রাচীনতম অনুষ্ঠানাদি পালন করে না। তাদের ভেতর বিবাহ অনুষ্ঠান খ্রিস্টীয় রীতি অনুসারে ফাদারের মাধ্যমে স্থানীয় চার্চে সম্পন্ন হয়।

মৃত্যু/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

শুরুতে সাঁওতালরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করলেও (সুলতানা, ২০০২:২০৮) পরবর্তীকালে তারা তা দাহ করে (Dalton, 1872:214)। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শিশুদের মৃত দেহ দাহ করা হয় না (বাস্কে, ১৯৯৩:২৯৩)। শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে যাবার আগে মৃতদেহটিতে তেল-হলুদ মাখানো হয়, কপালে সিঁদুর দেওয়া হয়, নতুন কাপড় দিয়ে মৃতদেহটি ঢেকে দেওয়া হয় (প্রাগুক্ত, ১৯৯৯:২০৯)। হিন্দু ধর্মের প্রভাবেই তাদের মধ্যে এ পরিবর্তন ঘটে বলে ধারণা করা যায়। তবে বর্তমানে বরেন্দ্র এলাকার গবেষণাধীন তিনটি গ্রামে দেখা গেছে, তারা মৃতদেহ দাহ করার পরিবর্তে কবর দেয়। তবে আগের মতোই তেল-হলুদ মাখিয়ে নতুন বা পুরাতন কাপড়ে ঢেকে বাঁশের খাটিয়ায় শুইয়ে কবরস্থানে নিয়ে যায়। সাঁওতাল পুরোহিত এসময়ে না থাকলে প্রবীণ সাঁওতালদের কেউ মন্ত্র পাঠ করে। তারা মন্ত্র পড়ে, 'হাসা হড়মো হাসারে মিলাক' অর্থাৎ 'ও হে মাটির মানুষ মাটিতেই মিশে যাও' (সিদ্দিকী, ১৯৯৭:২১)। পাশাপাশি দেখা গেছে, খ্রিস্টান সাঁওতালরা দারিদ্রের জন্য কফিন ব্যবহার না করলেও মৃতদেহ ধুইয়ে কাপড় দিয়ে ঢেকে বাঁশের খাটিয়ায় বহন করে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে চার্চের ফাদার সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে মৃতদেহকে কবরস্থ করার আয়োজন নেন।

পরিবার

'পরিবার' হচ্ছে ক্ষুদ্রতম জ্ঞাতি সম্পর্কিত (kinship) মৌলিক একক, যা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত। হাসদার মতে, "anthropologically family is not complete until a child is born" (Hasda, 1980:82)। নৃতত্ত্বের পরিভাষায় 'গৃহস্থ' পরিবার হচ্ছে জ্ঞাতি সম্পর্কিত সদস্যদের একটি গোষ্ঠী, যেখানে স্বামী-স্ত্রী মিলে একটি পারিবারিক একক (unit) গঠন করে। সাঁওতালদের মধ্যে সাধারণত একক ও যৌথ পরিবার দেখা যায়। যৌথ পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Mandelbaum বলেন, এ ধরনের পরিবারে বিবাহিত দম্পতিরা তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে একত্রে বসবাস করে। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, তাদের পুত্র ও পৌত্র কিংবা ভ্রাতা, তাদের স্ত্রী, অবিবাহিত কন্যা, এমন কি কোনো মৃত ভাইয়ের স্ত্রী সকলই পরস্পর রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি আরো বলেন, উক্ত সামাজিক এককের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যই সম্পত্তি যৌথভাবে ভোগ করে (Mandelbaum, 1949:93)। Karve-এর মতে, যৌথ পরিবারে সকল সদস্যই একই ছাদের তলায় বাস করে, একই উনুনে রান্না করে, একই সম্পত্তি ভোগ করে, একই ধর্মাবলম্বী এবং সকলই অভিন্ন রক্ত-সম্পর্কে আবদ্ধ (Karve, 1953:10)।

যদিও সাঁওতাল সমাজে আদিতে যৌথ পরিবারই প্রধানরূপ ছিল কিন্তু নানা পরিবর্তনের ফলে এখন একক পরিবার গঠিত হচ্ছে। Ali-এর মতে, "The traditional family structure of the Santals was joint family, but now in the Santal villages there is predominance of nuclear family pattern, this is due to the changing land tenure system of the country.

Due to diffusion in the form of modernisation, the pattern of family influence of the Santal society tends to weaken its socio-economic structure (Ali, 1989:184)।

এছাড়া, যৌথ পরিবার ভাঙনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সন্তান সংখ্যাকে নিয়ামক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে (দেখুন, Hasda, 1980:83-84)। যদি কোনো দম্পতির একটি মাত্র পুত্র সন্তান হয় তবে তৃতীয় পুরুষ (3rd generation) পর্যন্ত তারা একত্রেই থাকে। কিন্তু পুত্র দুই বা ততোধিক থাকলে সাধারণত দ্বিতীয় সন্তানের বিবাহের পর প্রথম পরিবর্তনটা পরিলক্ষিত হয় (Campbell, 1951, উদ্ধৃতি: Hasda, 1980:84) এরকম ক্ষেত্রে বড় পুত্র পৃথক বাড়িতে থাকে।

সাঁওতালদের মধ্যে একক পরিবারের আধিক্য (৬৭.৫%) পরিলক্ষিত হলেও মাঠ পর্যায়ে আমি লক্ষ করেছি তারা তাদের বাবা-মা এবং অন্যান্য বয়োঃজ্যেষ্ঠ আত্মীয়ের উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল। আবার দেখা গেছে, একজন সাঁওতাল পুরুষ বিয়ের পর আলাদা হয়ে গেলেও সে তার বাবা-মার ঘরের পাশে একই আঙিনায় নিজের ঘর গড়ে তোলে এবং যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সে তার বাবা-মায়ের পরামর্শ গ্রহণ করে। মেয়েরা বিয়ের পর সাধারণত স্বামীর বাড়ি চলে যায়। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা বিধবা হলে পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরে আসে। সাঁওতাল সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদনীয়। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ, বহু বিবাহ, বিধবা ও বিপত্নীক বিবাহ প্রচলিত না থাকায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমান ক্যাথলিক সাঁওতালরা সবসময়ে এগুলো থেকে দূরে থাকে। তবে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের অপরাপর অংশ এসব প্রসঙ্গে অপেক্ষাকৃত উদার নৈতিক মতামত পোষণ করেন।

সাঁওতালদের মধ্যে দত্তক গ্রহণ (adoption) খুবই বিরল হলেও একেবারে অনুপস্থিত নয় (সুলতানা, ২০০২:১১৭)। তবে বর্তমান গবেষণাধীন এলাকায় দত্তক গ্রহণ দেখা যায়নি। খেতুর, মধুমাঠ এবং বিলাসী গ্রাম তিনটি পর্যবেক্ষণের সময়ে একক এবং যৌথ পরিবার ছাড়াও সাঁওতালদের মধ্যে আরো এক ধরনের পরিবার দেখা গেছে, যাকে ঘরদি জাওয়াই পরিবার বলা হয়।

পারিবারিক কাঠামোগত দিক থেকেও দেখা গেছে, গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের সাঁওতাল পরিবারে লোক সংখ্যা অত্যন্ত কম। খেতুর গ্রামে প্রতিটি পরিবারে গড় সদস্য ৫.২৩ জন, মধুমাঠে ৪.৭০ জন এবং বিলাসীতে ৫.১৮ জন। পরিবারের রূপ পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) হওয়ায় বংশ মর্যাদা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিতার দিক থেকে বর্তায়। কোনো পরিবারের মা মারা গেলে বাবার দিকের আত্মীয় কোনো বিবাহিত মহিলা তাদের দেখাশুনা করে। আর বাবার মৃত্যু হলে মাতাই পরিবার প্রধানের ভূমিকা পালন করে যতদিন না ছেলেরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়।

পরিবারিক জীবনে একজন পুরুষের চেয়ে একজন নারীই বেশি পরিশ্রম করে। ঘরের এবং বাইরের দুই ধরনের কাজেই তারা সমান পারদর্শী। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করে রান্নার কাজে নিয়োজিত হয়। তারপর পুরুষদের খাইয়ে নিজে খেয়ে একসাথে মাঠে কাজ করতে যায়। কর্মস্থল নিজ গ্রামে হলে দুপুরের খাবারের সময়ে বাড়িতে আসে। তারা প্রায়ই দূরের গ্রামে খাদ্যসামগ্রী বহন করে নিয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে ভীষণ গরমে কয়েক মাসের বাচ্চাকে তারা গাছের ছায়ায় শুইয়ে রেখে নিজেদের কাজে নিয়োজিত করে। সাঁওতালরা যেমন পরিশ্রমী, তেমনি হাসিখুশি ও আমোদপ্রিয়। কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই তারা গান-রসিকতায় মেতে ওঠে।

গ্রাম সংগঠন

সাঁওতালদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে গ্রাম সংগঠনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামে তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত আছে। গ্রামের নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখা, উৎসবের দিন ধার্য করা, ঝগড়া-বিবাদ হলে তা সুষ্ঠুভাবে মিটমাট করা ইত্যাদি সবই এই পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত থাকে। কেউ অসামাজিক আচরণ করলে তাকে জাতিচ্যুত পর্যন্ত করা হয়। জাতিচ্যুত হওয়া সাঁওতালি ভাষায় বিটলাহা নামে পরিচিত।

গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হলেন মাঁঝি (Bodding, 1994:104)। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-পূজা-পার্বণ থেকে শুরু করে গ্রামের সবরকম দায়িত্ব তার উপরে অর্পিত। তাকে সাহায্য করার জন্য ছয় জন সহকারী থাকেন। এরা হলো: পারাণিক, জগ মাঁঝি, জগ পারাণিক, গোডেত, নায়েকে এবং কুডাম নায়েকে (Dalton, 1872:213; Bodding, 1994:104-6 and Ali, 1989:134)।

পারাণিককে বলা হয় মাঁঝির সহকারী। মাঁঝির অনুপস্থিতিতে তিনিই গোটা গ্রাম নিয়ন্ত্রণ করেন। জগমাঁঝি তরুণ-তরুণীদের নৈতিক চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। জগমাঁঝির সহকারী জগ-পারাণিককে জগমাঁঝির অনুপস্থিতিতে সব দায়িত্ব পালন করতে হয়। মাঁঝির বার্তাবাহক গোডেত মাঁঝির নির্দেশ মতো এলাকাবাসীকে প্রয়োজনীয় খবর দিয়ে সমবেত করে। এছাড়া, রয়েছেন গ্রাম্য পুরোহিত নায়েকে। দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য গ্রামের যাবতীয় পূজা-অর্চনা তিনিই করে থাকেন। তাঁর একমাত্র সহকারীর নাম 'কুডাম নায়েকে' যিনি বনজঙ্গল ও প্রকৃতি পূজারী।

গ্রামের মাঁঝি কোনো সমস্যার সমাধান করতে না পারলে 'পারগানা' বা 'পরগনাইত' কে আমন্ত্রণ জানানো হয় (বাস্কে, ১৯৯৯:১৯৯)। দশ-বারোটি গ্রাম নিয়ে একটি পরগনা হয় এবং ঐ পরগনার সাঁওতালদের দেখাশুনার ভার যার উপর ন্যস্ত থাকে তাকে বলে 'পারগানা' (পূর্বোক্ত, ১৯৯৯:১৯৯)। পারগানার সভায় সব গ্রামের মাঁঝি উপস্থিত থাকেন।

প্রধানত, সাঁওতালদের গ্রাম সংগঠন উপরোক্ত রূপে বর্ণনা করা গেলেও বর্তমান গবেষণাধীন এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারি, আদিবাসী সংগঠন এবং স্থানীয় সরকারের নেতৃত্ব ইত্যাদির প্রভাবে চিরায়ত প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকরিতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

সাঁওতাল সংস্কৃতির উপর অন্যান্য প্রভাব

সাম্প্রতিককালে সাঁওতাল সংস্কৃতিতে দু'টি প্রধান প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, একটি হলো খ্রিস্টধর্মের প্রভাব এবং অপরটি জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ তথা ভোটদান। দু'টি বিষয় এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেসব পর্যালোচনার জন্য আরও গভীর অভিনিবেশ প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা মনে রেখে আমরা এক্ষেত্রে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

১৮৬১ সালে রাজশাহীতে প্রথম অ্যাংলিকান চার্চ স্থাপিত হলেও খ্রিস্টকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১৯০৪ সালে। পরবর্তীতে বোডিং, ফিডার স্কুল এবং কারিতাস নামক ক্যাথলিক মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়া প্রোটেস্ট্যান্ট এবং সেভেনথ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট মিশনও সাঁওতালদের ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করে। এ পর্যায়ে কেউ কেউ ফাদারদের সঙ্গে ক্যাটিকিজ্‌ট (catechist) হিসাবে কাজ করেছেন। চিরায়ত সাঁওতাল এবং খ্রিস্টান সাঁওতালরা সব রকমের মাছ খেলেও সেভেনথ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট এর অনুসারীরা শূকরের মাংস এবং টাকি, শিং, মাগুর, বাইন প্রভৃতি মাছ খায় না (সুলতানা, ২০০২:২৩০)। খ্রিস্ট ধর্ম মতে চার্চে একাধিক দম্পতির একই অনুষ্ঠানে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। মিশন লিগ্যাল অ্যাডভাইজার নামে একটি পদ সৃষ্টি করেছে। দেখা গেছে খ্রিস্টান সাঁওতালদের জন্য আলাদা সংগঠন আছে, যেখানে শুধুমাত্র মাঁঝি, পারাণিক এবং গোডেত এর পদ বিদ্যমান (পূর্বোক্ত, ২০০২:২৪৪)।

এছাড়া, জাতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং প্রকাশ্যে সমর্থন জ্ঞাপন সাঁওতালদের জীবনযাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বর্তমানে কারিতাসের পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা যেমন কেয়ার ও ব্র্যাক নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কিছুকাল ধরে এসব অঞ্চলে বাম রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ (left political organization) তৎপরতা শুরু করেছে এবং সে কারণে প্রতি বছর বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান তথা শহীদ কানু ও সিঁধু দিবস (৩০শে জুন) পালন করা হয়ে থাকে। এমনকি 'উলগুলান' (বিদ্রোহ) নামে একটি অনিয়মিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, এসব কারণে চিরায়ত সাঁওতাল জনগোষ্ঠী আজ নানা পরিবর্তনের সম্মুখীন। অর্থাৎ তারা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় দ্বন্দ্বপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। ভবিষ্যতে তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক

জীবন কিরূপ পরিগ্রহ করবে তা একমাত্র গবেষকরাই বলতে পারবেন। মোট কথা, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায় বিরাট বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

উপসংহার

সাঁওতাল জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সকল ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও পরিবর্তনের উল্লিখিত ধারাকে উপেক্ষা করতে পারছে না। এই পরিবর্তন শুধু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, পৃথিবীর যে কোনো জনপদেই কোনোনা কোনোভাবে এটি পরিলক্ষিত হয়। রাজশাহী এলাকার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর, খ্রিস্টধর্মের প্রচার, রাজনৈতিক দলের বিকাশ, আধুনিক জীবনযাপনের বিভিন্ন উপাদানকে পরিবর্তনের মৌল নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা গেলেও বর্তমান 'বিশ্বায়ন' (globalization) নামক নতুন এক 'আগ্রাসনকে' আদৌ অবহেলা করা সম্ভব নয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, 'বিশ্বায়ন' বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মারাত্মক স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করবে, যার প্রভাব থেকে একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে নিম্নবর্গের (subaltern)[১] সাঁওতালদের মুক্ত থাকা অসম্ভব বলেই মনে হয়। সেজন্য আমার বিবেচনায় সাঁওতাল সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা তথা এই জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিতের জন্য ভাবীকালের গবেষণার রূপরেখায় উল্লিখিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্তি একটি সর্বজনগ্রাহ্য বাস্তবতা।

গ্রন্থপঞ্জি

Ali, Md. Ahsan, 1989, "Social Change Among the Santals of Bangladesh : A Study of Cultural Isolation" (Unpublished Ph.D. Thesis) Department of Anthropology, Calcutta University.

Arens, Jeneke and Joseph van Beurden, 1977, *Jhagrapur : Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh.* Birmingham : Third World Publications.
BBS, 1991.

Bhowmick, K.L. 1971, *Tribal India : A Profile in Indian Ethnology*, Calcutta, The World Press Private Ltd.

Bertocci, Peter J., 1970, "Exclusive Village : Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan" (Unpublished Ph.D. Thesis, Michigan State University).

Bessaignet, P, 1960, "Tribes of Northern District of East Pakistan", *Social Research In East Pakistan.* Dacca, Asiatic Society of Pakistan.

Bodding, P.O., 1994, *Traditions and Institutions of the Santals.* New Delhi, Bahumukhi Prakasan.

Campbell, Andre, 1916, "Santal Marriage Customs" *Journal of the Bihar and Orissa Research Society,* Patna **2(3).**

Chowdhury, Anwarullah, 1978, *A Bangladesh Village : A Study of Social Stratification.* Dhaka : Center for Social Studies.

Dalton, E.T., 1973, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta : Government Press.

---

[১] ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বরাবর 'এলিট' শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি (Elitist historiography) থেকে বিচার করার পদ্ধতিকে 'Subaltern studies' এর প্রবক্তারা (রণজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞান পাণ্ডে প্রমুখ) অনুমোদন করেন না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : Guha সম্পাদিত Subaltern Studies, ১-১০ খণ্ড।

Datta Majumder, N, 1956, *The Santal : A Study in Culture Change*, Delhi : Manager of Publication.

Flood, J, 1974, *Indian Elements in Australian Culture*. Delhi : Indian Science Congress.

Grierson, G.A, 1906, *Linguistic Survey of India*. Vol. 9, Part 1, Calcutta.

Guha, Ranajit, eds., 1982, *Subaltern Studies*. Vol. 1-10, New Delhi : Oxford University Press.

Hasda, Phanindranath, 1980, "Differential Transformation of Culture and Language Among the Santals" (Unpublished Ph.D. Thesis) Department of Anthropology, Calcutta University.

Haviland, W.A. 1983, 4th edition *Cultural Anthropology*, U.S.A.

Hossain, Kazi Tobarak and Sadeque, S.Z. 1982, "The Santals of Rajshahi : A Study in Social and Cultural Change" in M.S. Qureshi (eds.), *Tribal Cultures in Bangladesh*, IBS Seminar, Vol. V, IBS, Rajshahi University.

Hossain, Kazi Tobarak, 2000, "The Santals of Bangladesh : An Ethnic Minority in Transition" Workshop Paper ENBs. Oslo.

Hunter, W.W. 1868, *The Annals of Rural Bengal*, London : Smith Elder and Co.

-------, 1876, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. 3, 9 and 16, London : Trubner and Co.

-------, 1895, *A Brief History of the Indians People*, Oxford : The Clarendon Press.

Karim, A.H.M. Zehadul, 1990, *The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society*, New Delhi, Northern Book Centre.

------, 2000, "The Occupational Diversities of the Santals and their Socio-Cultural Adaptability in a Periurban Environmental Situation of Rajshahi in Bangladesh : An Anthropological Exploration Annual Conference of the Indian Anthropological Society, Santiniketan, India.

------, 2000, "The Socio-Economic Condition and the Subsistence Activities of the Santals in the Adjoining Rajshahi Periurban Areas", Seminar Paper on Tribal Culture and Development, Dhaka.

------, 2001, "The Santals in the Barind Areas of Bangladesh and their Pattern of Subsistence Activities : An Anthropological Exploration" A Paper Presented in Inter-Congress, Gottingen, Germany.

Karve, Irawati, 1953, *Kinship Organization in India*, Bombay, Asia Publishing House.

Kochar, Vijay, 1970, *Social Organization Among the Santals*, Calcutta : Editions India.

Mallick, S.K. 1993, "Transformation of Santal Society : Prelude in Bharhind" Calcutta, Minerva Associates Publication.

Malinowski, B., 1922, *Argonatus of the Western Pacific*. New York : Dutton.

Mandelbaum, D.G. 1949, "The Hindu Family" in R.N. Anshen (eds.) *The Family : Its Functions and Destiny*, New York.

Mead, Margaret, 1928, *Coming of Age in Samoa*. New York : Morrow.

Morgan, L.H., 1977, *Ancient Society* New York : World Publishing.

Mukherjee, Charulal, 1962, *The Santals*, Calcutta : A Mukherjee and Co. Pvt. Ltd.

O'Malley, L.S.S, 1913, *Census of India*. 1911 Vol. S. Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim Part I, Reprint Calcutta; Bengal Secretariat Book Depot.

Orans, Martin, 1965, *The Santals : A Tribe in Search of Great Tradition*. Michigan Wayne State University Press.

Qureshi, Mahmud Shah eds., 1984, *Tribal Cultures in Bangladesh* IBS, Seminar, Vol. V., IBS, Rajshahi University.

Risley, H.H., 1891, *The Tribes and Castes of Bengal, 2 Vols.* Calcutta, The Bengal Secretariat Press.

-------, 1915, *The People of India*, Calcutta.

Siddiquee, A.R, 1987, "Modernization and Culture in the Orans of Bangladesh" (Unpublished Ph.D. Thesis), Ranchi.

Tiffany, W.W., 1979, "New Directions in Political Anthropology : The Use of Corporate Models for the Analysis of Political Organization", S.L. Section and M.J.M. Claessen (eds.) *Political Anthropology : The State of the Art.*

আহমেদ, এজাজ, ২০০২, *বিশ্বায়ন*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

আলি, এ.এফ. ইমাম, ১৯৯২, *সমাজতত্ত্ব*, ঢাকা-রাজশাহী, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ।

আলী, মেহরাব, ১৯৮০, *দিনাজপুরের আদিবাসী*, দিনাজপুর, আদিবাসী সাংস্কৃতিক একাডেমী।

কামাল, চক্রবর্তী, নাসরিন, ২০০১, *নিজভূমে পরবাসী*, ঢাকা, উৎস প্রকাশনী।

কায়েস, শাহানা, ১৯৯৫, "রাজশাহী জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন: একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা" (অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ) আই.বি.এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চৌধুরী, বিনয়, ২০০০, 'ধ্রুবপদ' সংকলন গ্রন্থ, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ।

জলিল, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল, ১৯৯১, *বাংলাদেশের সাঁওতাল ঃ সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, ১৯৯৯, "সাঁওতাল" *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, সুবর্ণরেখা।

মল্লিক, সমর কুমার, ১৯৮৮, "উনবিংশ শতকে সাঁওতাল প্রতিবাদী আন্দোলনের স্বরূপ" *ইতিহাস অনুসন্ধান-৩*, কলিকাতা : কে পি এন্ড কোম্পানী।

সরকার, প্রফুল্ল চন্দ্র, ১৯৯০, "বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষ এবং তাদের জাতিগত বৈচিত্র্যের ধারা : একটি নৃতাত্ত্বিক অবলোকন" *সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল*, প্রথম সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাদ্দর, রণজিৎ কুমার, ১৯৯২, *সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স।

সাত্তার, আব্দুস, ১৯৬৬, *অরণ্য জনপদে*, ঢাকা, জলি বুকস্।

সিদ্দিকী, আব্দুর রহমান, ১৯৯৮, "বরেন্দ্র ভূমির চিরায়ত বাসিন্দা ঃ নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান" *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ (সংকলন গ্রন্থ)।

সিদ্দিকী, আব্দুর রশীদ, ১৯৬৬, "বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের প্রকৃতি : সাঁওতাল উপজাতি সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ" (অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. গবেষণা প্রতিবেদন), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সেন, রংগলাল, ১৯৮৫, 'বাংলাদেশের স্তরবিন্যাস' বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সেন, সুচিব্রত, ১৯৯৩, "সাঁওতাল বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎস সন্ধানে" *ইতিহাস অনুসন্ধান-৭*, কলিকাতা, কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী।

সুলতানা, মোসাঃ আবেদা, ২০০২, "সাঁওতাল সংস্কৃতিতে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব ঃ রাজশাহী জেলার পাঁচটি গ্রামের উপর একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা" (অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ), আই.বি.এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সুলতানা, শাহনাজ, ২০০৩, "সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জ্ঞাতি সম্পর্ক এবং এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন ঃ নওগাঁ জেলার ৪টি গ্রামের উপর গবেষণা" (অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ), নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

পাটিপাতা : একটি অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*

Abstract: Main focus of the article is on economic potential of *Paati Paata* or *Murta*, an indigenous natural plant of Bangladesh, used as a raw material of cottage industries, especially for making famous mat called *Sital Paati* of Sylhet. Not only for that but growing of the plant as a crop is commercially profitable, and easy to cultivate for the farmers. The plant, impacts positively on several areas of socioeconomic development.

১. ভূমিকা

দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ আয় বর্ধনমূলক কর্মসংস্থানের অভাব। আত্ম-কর্মসংস্থানকে, বিশেষ করে, গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই কর্মসংস্থানের জন্য যেমন ঋণসুবিধা, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি প্রয়োজন তেমনি উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করার জন্য দেশীয় সম্পদ ও জ্ঞান কাজে লাগানোর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সাম্প্রতিক উন্নয়নচিন্তায় বিষয়টি আরো বেশি ভাবা হচ্ছে।[১] দারিদ্র্য দূরীকরণ পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে জীববৈচিত্র্য চুক্তি (Convention of Biological Diversity) ৮ ও ১০ অনুচ্ছেদে প্রতিটি দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর স্থায়িত্বশীল ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[২] যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে যে, যেখানে জীবনযাত্রার প্রয়োজনে সম্পদ ব্যবহৃত হয় প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদও সেখানেই গড়ে ওঠে এবং সেসবের সংরক্ষণ ঐ লোকালয়ের মানুষই ভালোভাবে করে থাকেন। তাই প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং জীবনযাত্রার উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কোনো দেশের উদ্ভিদবৈচিত্র্য সে দেশের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ।[৩]

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদ তথা বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ রয়েছে যা আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। পাটিপাতা এমনই একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রথমত পাটিপাতা একটি অর্থকরী শস্য হিসেবে গণ্য হতে পারে। এর সঙ্গে লোকায়ত জ্ঞানের ব্যবহার এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সম্পর্ক রয়েছে। একটি পরিবেশ সহায়ক অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে এর সম্ভাবনাময় দিকগুলো চিহ্নিত হওয়া দরকার। দারিদ্র্য দূরীকরণে এর যে অবদান বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের এটি যে একটি

---

*মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সিনিয়র সহকারী সচিব; পিএইচ.ডি. গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] বিস্তারিত দেখুন, Mahfuzullah, *Intellectual Prporty Rights and Bangladesh*, Dhaka, Centre for Sustainable Development, 2002, pp.28-123. আরো দেখুন, পল সিলিটো, "লোকায়ত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী", *তৃণমূল উদ্যোগ*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৮।

[২] *কনভেনশন অব বায়োলজিকেল ডাইভারসিটি*, ১৯৯২।

[৩] ডায়ানা কার্নি, "স্থায়িত্বশীল গ্রামীণ জীবনযাত্রার সন্ধানে", *তৃণমূল উদ্যোগ*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৮। ঢাকা, বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইনডিজেনাস নলেজ, ১৪০৮।

উল্লেখযোগ্য অবলম্বন হতে পারে, সেদিকটি তুলে ধরা হলে স্থানীয় পর্যায়ে আরো যে সব দেশীয় সম্ভাবনাময় কাঁচামাল বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অযত্ন-অবহেলায় রয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ হতে পারে। একই সঙ্গে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ (Intellectual Property Rights) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের অপ্রচলিত উদ্ভিদ চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট গুরুত্ববহ।[৪]

যতদূর জানা যায়, পাটিপাতার চাষের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তুলে ধরে উল্লেখ করার মতো কোনো গবেষণা এখনো পর্যন্ত অনুপস্থিত। একটি নিবন্ধে পাটিপাতার চাষ কমে যাওয়া এবং পুঁজির অভাব পাটি শিল্পের সঙ্কটের জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৫] নিবন্ধে পাটিপাতার চাষের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার কথা বলা হলেও চাষের পদ্ধতিতে কি ধরনের পরিবর্তন দরকার সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি। জাতীয় জাদুঘরের লোকশিল্প সফর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি নিবন্ধে সিলেটের শীতল পাটির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে পাটিপাতার অভাবে শীতল পাটির জন্য প্রসিদ্ধ বালাগঞ্জের পাটিশ্রমিকরা যে বেকার হয়ে পড়েছেন এবং পাটিবুননের পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উপকূলীয় বন বিভাগ লক্ষ্মীপুর ও চট্টগ্রাম পাটিপাতার চাষ পদ্ধতি নিয়ে প্রচারমূলক পুস্তিকা [৬] এবং প্রচারপত্র [৭] প্রকাশ করেছে যাতে পাটিপাতার চাষ লাভজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কেন লাভজনক তার কোনো ব্যাখ্যা বন বিভাগের পুস্তিকা ও প্রচারপত্রে অনুপস্থিত। সেগুলো আর্থসামাজিক গুরুত্ব তো তুলে ধরেই নি এমনকি সেগুলো দাপ্তরিক প্রয়োজনও যথাযথ মেটাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অথচ গুরুত্ব বিবেচনায় বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, ১৯৯২ সালে ইউনিসেফের একটি জরিপে কুটির শিল্প হিসেবে পাটি বোনার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের ৬৩ ভাগ মহিলা।[৮] পোশাক শিল্পের মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হলেও পাটি শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, জাতীয় আয় ও দারিদ্র্য দূরীকরণে তাঁদের অবদান নিয়ে যথাযথ গবেষণা এখনো পর্যন্ত হতে দেখা যায়নি। কিন্তু গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রেক্ষাপটে এই দিক নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য একটি দেশীয় অপ্রচলিত কৃষি পণ্য হিসেবে পাটিপাতার পরিচিতি ঘটানো এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এর অর্থনৈতিক অবদান এবং সম্ভাবনার কতিপয় দিক তুলে ধরা। পাটিপাতার চাষ অন্য ফসল, বিশেষ করে, ধান চাষের তুলনায় কৃষকদের জন্য কতটা লাভজনক সেদিকে আলোকপাত করা হয়েছে। পাটিপাতাকে ভিত্তি করে আত্মকর্মসংস্থান ও এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব যেমন, গ্রামীণ বেকার মানুষের নগরমুখী অভিগমন রোধ, মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এই উদ্ভিদের আবাদে আরো যে সব প্রাসঙ্গিক সুবিধা রয়েছে যেমন, কৃষকদের বাড়তি আয়ের সুযোগগুলো চিহ্নিতকরণ, যেমন প্রান্তিক কৃষকদের পরিপূরক পেশা গ্রহণের কৃষি জমিতে মাছ চাষ, শস্যদুর্বিপাক মোকাবেলা, আবাদ ও ফসল তোলার মৌসুমে নগদ পুঁজির সংকট মোকাবেলা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

---

[৪] World Trade Organization, *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), Article 27-31, 1994.

[৫] জিনাত মাহরুখ বানু, "লোকশিল্প নিদর্শন সংগ্রহ সফর: সিলেট", *জাদুঘর সমাচার*, (১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন), ঢাকা, ১৯৯৯।

[৬] মোঃ শফি ও অন্যান্য, *উপকূলীয় অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা নির্দেশিকা*, লক্ষ্মীপুর, উপকূলীয় বন বিভাগ, জুন ১৯৯৭

[৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাঁশ, বেত ও মূর্তার চাষ পদ্ধতি*, উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম, (সন?)।

[৮] UNICEF, *Situation Analysis of Children and Women in Bangladesh*, 1992.

গবেষণা এলাকা উপকূলীয় ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার মঙ্গলকান্দি, বখতারমুন্সি, মির্জাপুর, সমপুর, রাজাপুর, লক্ষ্মীপুর ও আহমদপুর গ্রাম। এই উপজেলার উত্তরে ফেনী সদর। পশ্চিমে ছোট ফেনী নদী, যার অপর পাড়ে নোয়াখালী জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা, পূর্ব সীমান্তে ফেনী নদী, যার অপর পাড়ে চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এটি বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। মাটির ধরন বালি-দোআঁশ। বর্ষাকালীন জলাবদ্ধতার জন্য বর্ষা পেরিয়ে যাবার পরও এখানে মাটি কিছুটা ভেজা থাকে । এখানকার প্রধান ফসল ধান।[৯]

এই প্রবন্ধে মাঠপর্যায়ের প্রাথমিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা এলাকাটি গবেষকের পূর্বতন কর্মস্থল। পাটিপাতার চাষ, উৎপাদনশীলতা, এর ব্যবহার এবং বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ২০০০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০১ সালের এপ্রিল মাস সময়কালের মধ্যে।

২. পাটিপাতার পরিচিতি ও এর চাষ পদ্ধতি

পাটিপাতা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মালেও এর নামে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে এর নাম পাটিপাতা। বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লায় মুর্তা নামে পরিচিত। এটি একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।[১০] এর বৈজ্ঞানিক নাম *Clinogyne dichotomy*। এর আদি নিবাস ভারত ও বাংলাদেশ।[১১] পাটিপাতার কাণ্ড নলাকার, মসৃণ এবং কচি অবস্থায় গাছের রং গাঢ় সবুজ এবং প্রাপ্ত বয়সে হলুদাভ। এপ্রিল-মে মাসে চমৎকার সাদা ফুলে শোভিত হয়। পাটিপাতা গাছের উচ্চতা সাধারণত ৩-৪ মিটার। বাংলাদেশের প্রায় সব সমতল এলাকায় বিশেষ করে, যে সব অঞ্চলে বর্ষার পানি কিছুটা দীর্ঘসময় অবস্থান করে এবং মাটি ভেজা থাকে সেখানে পাটিপাতা প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়। এই উদ্ভিদ সিলেট, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও বরিশাল অঞ্চলে বেশি জন্মে। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক এলাকা, বিশেষ করে ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট জেলায় একটি অপ্রচলিত কৃষিপণ্য হিসেবেও এর চাষ হয়ে থাকে।

পাটিপাতা কুটির শিল্পের কাঁচামাল। বিশেষ করে পাটি শিল্পে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রসিদ্ধ শীতলপাটি ও সাধারণ চাটাই, মাদুর ও নানা রকম সৌখিন কারুপণ্য ইত্যাদির কাঁচামাল পাটিপাতা। সিলেট ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকায়ও কুটির শিল্প এবং মানুষের দৈনন্দিন নানা কাজে পাটিপাতার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

নিচু জলাবদ্ধ জমিতে পাটিপাতা ভালো জন্মে । ভেজা ছায়াঘেরা জমি পাটিপাতা চাষের জন্য উপযুক্ত। পাটিপাতা তিন ভাবে চাষ করা যায়। বীজ, মোথা বা মুড়া এবং ডাল কাটা অংশ। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বীজ সংগ্রহ করে বীজতলা বা পলিব্যাগে চারা করতে হয়। এক বছর পর চারা রোপণ করা যায়। মোথা বা ডাল কাটা অংশ চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক মাসে সংগ্রহ ও লাগানো যায়। গিট বা পর্বসহ ৮ সে.মি. থেকে ১০ সে.মি. ডাল কাটতে হয়। জমি সামান্য কর্ষণ করে ৬০ সে.মি. দূরত্বে লাগতে হয়। রোপণের পর দুই বছর পরিচর্যা দরকার হয়। দুই একবার বেয়ে ওঠা লতা ও আগাছা পরিষ্কার করা এবং মাটি কুপিয়ে দিতে হয়। তৃতীয় বছর হতে পাটিপাতা গাছ কেটে বিক্রি করা যায়।

---

[৯] গোলাম মোস্তফা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সোনাগাজী ও মোঃ শাহজাহান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক ধান গবেষণা কেন্দ্র, সোনাগাজী, এক সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য।

[১০] মোঃ শফি ও অন্যান্য, *উপকূলীয় অঞ্চলে বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা নির্দেশিকা*, উপকূলীয় বন বিভাগ, লক্ষ্মীপুর, জুন ১৯৯৭।

[১১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাঁশ, বেত ও মূর্তার চাষ পদ্ধতি*, উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম, (তারিখ

৩. পাটিপাতার চাষের আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা: সোনাগাজীর কিছু চিত্র

মির্জাপুর গ্রামের কালামিয়ার ১ একর জমিতে পাটিপাতা লাগানো আছে। তাঁর পিতা দেলুমিয়া অনুমান ২৫ বছর আগে লাগিয়েছেন। তিনি বছরে অন্তত ২ বার গাছ বিক্রি করেন। তাঁর হিসেব মতে বছরে মোট বিক্রি ২৫ হাজার টাকার বেশি। তিনি জানান, জমির পরিচর্যার জন্য বছরে ২ হাজার টাকা এবং পাটিপাতার গাছ বিক্রয় করতে বাজারে নেওয়ার জন্য পরিবহন বাবদ খরচ ৫ শত টাকা খরচ হবে। এর তুলনায় প্রতি মৌসুমে ধানের উৎপাদন ৮ হাজার টাকা করে ১৬ হাজার এবং খরচ পড়বে মৌসুমে ৬ হাজার টাকা হিসেবে বছরে ১২ হাজার টাকা। নীট উৎপাদন ৪ হাজার টাকা। আর বাড়ি সংলগ্ন ছায়াময় এই জমিতে ধানের ফলনও ভালো হয় না।

সমপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের একই পরিমাণ জমিতে পাটিপাতা লাগানো রয়েছে যা ২০ বছর আগে তাঁর পিতা হাজী আব্দুস সাত্তারের লাগানো। তাঁর তথ্য কালামিয়ার তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁদের দুজনেরই মত, পাটিপাতার চাষে খরচ খুব কম, কিন্তু ধানের তুলনায় আয় অনেক বেশি।

দৌলতকান্দি গ্রামের মোঃ হানিফ সোনাগাজী-ফেনী সড়কের পাশে মুদি দোকানি। তাঁর আবাদযোগ্য জমি সাকুল্যে ৩০ শতাংশ। তিনি এই জমিতে পাটিপাতা লাগিয়েছেন ৭ বছর আগে। এখন প্রতি বছর ১০ হাজার টাকার পাটিপাতার গাছ বিক্রি করেন। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো, এতো অল্প পরিমাণ জমি তবু প্রচলিত ফসলের বদলে কেন পাটিপাতা লাগিয়েছেন। কেন ধান বা অন্য কোনো শস্য করেন না। তাঁর জবাব ছিলো, অল্প জমি চাষ করে সংসার চলে না। সংসার চালানোর জন্য অন্য কোনো কাজ করতে হয়। আবার জমি অল্প বলে ফেলে রাখাও যায় না। জমি কম হলেও ধান বা প্রচলিত অন্য কোনো ফসলের চাষ করতে সারাবছরই নিবিড় খাটুনি দরকার হয়, কৃষি যন্ত্রপাতিও কিছু না কিছু থাকতে হয়। সময় মতো বীজ কেনা, বপন ও রোপণ করা লাগে, নিড়ানি ছাড়াও বালাই দমনের জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে পাটিপাতা চাষ অনেক বেশি সুবিধাজনক আর লাভজনক তো বটেই। পাটিপাতার ক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা নেই। কারণ পাটিপাতার জন্য কেবল লাগানোর সময়ে একবার এবং তারপর প্রতিবছর শুধু বছরে দুই-একবার মাটি আলগা করে দেওয়ার দরকার পড়ে। এছাড়া কেটে বিক্রয় করাই কাজ। এই কাজ বছরের যে কোনো সময় করা যায়। মৌসুমি খাটুনি আর অনেক বেশি দামে কামলা (শ্রমিক) নিয়োগ করতে হয় না। ঝড়-বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হয় না। এই সুবিধার জন্য পাটিপাতা চাষ করে অল্প জমির মালিক সহজেই একই সঙ্গে অন্য কোনো পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। বাড়তি আয়ের সুযোগ না থাকলে শুধু জমির আয়ে তাঁর মতো অল্প জমি যাদের আছে তাঁদের সংসার চলতে পারে না বলে হানিফের ধারণা। অল্প জমির মালিকের জন্য পাটিপাতার চাষ করে অন্যত্র কাজ করা যতটা সম্ভব অন্যকোনো ফসল করে সেটা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন।

বোয়াগ গ্রামের আফতাবুল হকের ৪.০০ একর জমি আছে। এক সময়ে তাঁর মাত্র ০.৪০ একর জমিতে পাটিপাতার চাষ ছিলো। তাঁর দুই পুত্র বিদেশে চলে যাওয়ার পর তিনি পাটিপাতার চাষ বাড়িয়েছেন। এখন ২.৪০ একর। সব খরচ বাদ দিয়ে বর্তমানে তাঁর এই ২.৪০ একর জমি থেকে পাটিপাতা বিক্রয় করেন ৪০ হাজার টাকা। তাঁর মতে, খুব ভালো ফলন হলেও ধান চাষ করে সমপরিমাণ জমিতে উল্লিখিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ আয় করা সম্ভব নয়।

রামচন্দ্রপুরের মাহবুবুল হক ১.৮০ একর জমিতে ৫ বছর আগে পাটিপাতা চাষ করেছেন। তাঁর বার্ষিক আয় খরচ বাদে ৩০ হাজার টাকা। কেন পাটিপাতা চাষ করেন জানতে চাইলে তিনি যে সকল সুবিধার কথা উল্লেখ করেন সেগুলো হলো, নিরাপদে-নিশ্চিন্তে থাকা যায়, ফসল চুরি যাওয়ার ভয় নেই, শিলাবৃষ্টি ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, অন্য কাজ করতে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়, পাকা ধানের মতো তাড়াহুড়ো করে কেটে ঘরে তুলতে হয় না, নগদ টাকার প্রয়োজনে যখন ইচ্ছে কেটে বিক্রয় করা যায়, দাম পড়ে যাওয়ার কিংবা মজুরি বেশি লাগার সমস্যা নেই। সংসারের

খরচের জন্য যেমন, মাছ তরকারি ইত্যাদি কেনার জন্য দুই-এক আটি পাটিপাতা হাটে নিয়ে বিক্রি করলে নগদ টাকার সংস্থান হয়।

৪. পাটিপাতা ও ধান চাষের খরচ এবং উৎপাদন: প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক চিত্র

সোনাগাজীর ৭ টি গ্রাম থেকে মাঠ পর্যায়ের সাক্ষাৎকারে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে পাটিপাতা চাষের আয় ধান থেকে বেশি দেখা গেছে। একরপ্রতি ধান এবং পাটিপাতার খরচ ও উৎপাদনের যে চিত্র পাওয়া গেছে তা সারণি ১, ২ ও ৩ -এ দেখানো হলো।

সারণি ১

একরপ্রতি ধান উৎপাদন খরচ ও আয় (চলতি দামে, টাকার অঙ্কে)।

চাষ	বীজ	সেচ	সার	শ্রম	কীটনাশক	মোট খরচ	উৎপাদন	নীট আয় (উৎপাদন–খরচ)
১৬০৮	৫২৮	৩৯৭	৩০৬৪	৪১০৩	৬১০	১০৩১০	২০৫০২	১০১৮২

উৎস: মাঠ জরিপ।

সারণি ২

একরপ্রতি পাটিপাতার উৎপাদন খরচ ও আয় (চলতি দামে, টাকার অঙ্কে)।

চাষ	বীজ	সেচ	সার	শ্রম	কীটনাশক	অন্যান্য	মোট খরচ	উৎপাদন	নীট আয় (উৎপাদন–খরচ)
----	----	----	----	২০০০	----	১০০০	৩০০০	২১০৭৮	১৮০৭৮

উৎস: মাঠ জরিপ।

সারণি ৩

প্রথম বছরে একরপ্রতি পাটিপাতা চাষের খরচ (চলতি দামে, টাকার অঙ্কে)।

খরচের খাত	খরচ	মন্তব্য
রোপণের খরচ (চাষ ও শ্রমিকের মজুরি)	৩৫০০ টাকা	কেবল একবার
বীজ অথবা চারা কেনা বাবদ	১৮০০ টাকা	কেবল একবার
আগাছা পরিষ্কার করা ও অন্যান্য	৫০০ টাকা	
মোট	৫৮০০ টাকা	

উৎস: মাঠ জরিপ।

পাটিপাতা লাগানোর বছরে একরপ্রতি গড়ে ৫৮০০ টাকা খরচ হয়, যার মধ্যে ৫৩০০ টাকা খরচ আর কখনো করতে হয় না। দ্বিতীয় বছর থেকে আগাছা দমনের খরচ আছে কেবল। অন্য ফসলের ক্ষেত্রে প্রতিবার চাষের জন্য সব রকম খরচই করতে হয়। পাটিপাতা লাগানোর পর প্রথম বছর কেনো ফলন নেই। মোথা (শেকড়সহ গাছের গোড়া) লাগানো হলে দ্বিতীয় বছরে সামান্য ফলন পাওয়া যায়। তৃতীয় বছর থেকে পাটিপাতা গাছ কাটা যায় এবং এর পর প্রতিবছর শুধু ফসল ঘরে তোলা অর্থাৎ বিক্রয় করা। চাষের জন্য আর কোনো খরচ করতে হয় না। খরচ কেবল স্থানীয় হাটে পৌঁছানোর জন্য ভ্যানভাড়া আর পাটিপাতার গাছ কাটার জন্য মজুরি। সারণি-৪ এ মাঠ জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধান ও পাটিপাতার চাষের বেলায় একরপ্রতি তুলনামূলক খরচ, উৎপাদন ও আয় দেখানো হলো।

সারণি-৪

ধান ও পাটিপাতার একরপ্রতি তুলনামূলক খরচ, উৎপাদন ও আয় (চলতি দামে, টাকার অঙ্কে)।

ফসল	খরচ	উৎপাদন	নীট সুবিধা	মন্তব্য
ধান	১০৩১০	২০৫০২	১০২০৮	পাটিপাতার তুলনায় ধানের খরচ ৩.৪ গুণ। ধানের জন্য নিবিড় যত্ন, পুঁজি, কৃষি উপকরণ অপরিহার্য।
পাটিপাতা	৩০০০	২১০৭৮	১৮০৭৮	উৎপাদনের বিবেচনায় ধানের তুলনায় পাটিপাতার চাষ ১.৭৭ গুণ লাভজনক কিন্তু পুঁজি ও শ্রমের উপর নির্ভরতা কম। বালাই ও ঝুঁকিমুক্ত।

উৎস: মাঠ জরিপ।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে আরো যে সব সুবিধা দেখা যায়, সেগুলো হলো, শ্রমের সাশ্রয় হয়, কৃষকের পক্ষে বিকল্প অকৃষি পেশা গ্রহণ সুবিধাজনক হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সামাজিক ঝুঁকির আশঙ্কামুক্ত, মৌসুমি সরবরাহ বৃদ্ধিজনিত কারণে পরতি দামে বিক্রয় করতে হয় না। এইসব তুলনামূলক অর্থনৈতিক সুবিধার দিকগুলো বিবেচনা করা হলে পাটিপাতার চাষ যে অধিকতর লাভজনক বিবেচিত হবে, তা আরো জোর দিয়ে বলা যাবে। কৃষকরা জানান, যে জমি অন্য ফসলের জন্য তেমন উপযোগী নয়, তারা সেরকম জমি বেছে নিয়েছেন পাটিপাতা চাষের জন্য।

একটি গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, উপকূলীয় অঞ্চলে হেক্টরপ্রতি কৃষি উৎপাদনের মূল্য সংযোজন বার্ষিক ১১৮০২ টাকা, যা একরে দাঁড়ায় প্রায় ৪৭৮০ টাকা। নোয়াখালী অঞ্চলে এই মূল্য সংযোজন হিসেব করা হয়েছে একরপ্রতি ৪৯৭০ টাকা।[১২] সোনাগাজীতে পাটিপাতা যে ধরনের জমিতে চাষ করা হয় তাতে ধান এবং অন্যান্য ফসলের ফলন তেমন ভালো হয় না। ফলে সঙ্গত কারণেই এই জমির মূল্য সংযোজন আরো কম হবে।

ধান এবং প্রচলিত শস্যের ফলন সম্প্রতি একরপ্রতি উৎপাদন আগের তুলনায় বেশি হলেও এখনো সেটা অনেকখানি অনুকূল প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির ক্রীড়নক এই দেশে কোনো বছর জলবায়ু ও আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, প্রতি বছরই অনাবৃষ্টি কিংবা অতিবৃষ্টিতে আমাদের দেশে ব্যাপক ফসলহানি হয়। বিশেষ করে, উপকূলীয় অঞ্চলে চাষাবাদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বেশিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি ছাড়াও মৌসুমে আবাদের সময়ে ভালো বীজ ও চারার অপ্রতুলতার কারণে এসবের দাম প্রায়ই অস্বাভাবিক রকম চড়া থাকে। বিভিন্ন উপকরণের উচ্চমূল্য আর শ্রমের মৌসুমি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত বাড়তি দাম পরিশোধ করতে প্রান্তিক কৃষকের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়। ভালো ফলনের জন্য সময়মতো পরিচর্যা, আগাছাদমন, কীটনাশক ও সার প্রয়োগ দরকার হয়। এসবের জন্য যে চলতি মূলধন বা নগদ অর্থের দরকার প্রান্তিক কৃষককে তা জোগাড় করতে ব্যাংক কিংবা অন্য কোনো স্থানীয় ব্যক্তি বা দাদনদারের শরণ নিতে হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা বলেন, নগদ টাকার প্রয়োজনে তারা সারাবছরই পাটিপাতা বিক্রয় করেন। বিশেষ করে বিক্রয় করেন প্রচলিত ফসল আবাদ করার সময়, যখন বীজ ও সার কিনতে নগদ অর্থের দরকার হয়। দুজন কৃষক বর্ষাকালে বিক্রয় করেন বলে জানান; কারণ, তখন দাম বেশি পাওয়া যায়, কাজের অভাব থাকে বলে উর্পাজন কম হয়, নগদ টাকার অভাব থাকে। বর্ষায় প্রাকৃতিক কারণে বাইরে কাজ কম থাকে বলে পাটি বুননের কাজ বেড়ে যায় আর পাতার দামও বেশি থাকে। তাই এ সময় বিক্রি করা ভালো।

---

[১২] রুশিদান ইসলাম রহমান, "বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে আঞ্চলিক পার্থক্যের বিশ্লেষণ", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, সপ্তদশ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৬।

যারা অর্থকরী ফসল হিসেবে পাটিপাতা চাষ করেন না, এমন কয়েকজন কৃষকের মতামতেও পাটিপাতা চাষের অর্থনৈতিক সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। সুজাপুরের কৃষক আ. ক. ম. ইসহাক উল্লেখ করেন, পাটিপাতা চাষে তার মতে লাভ হবে ধানের তুলনায় ৫-৬ গুণ। দাম বেশি পাওয়া যায় আর সহজে বিক্রয় করাও যায়। কম দামে ধান বিক্রয় কৃষকের জন্য খুবই কষ্টকর অভিজ্ঞতা বলে তিনি মনে করেন। নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি পুকুরের ভেতরে পাড়ের মাটি আটকানোর জন্য চারপাশে পাটিপাতা লাগিয়েছেন। পাটিপাতার শিকড় পাড়ের মাটি আটকে রাখতে কার্যকর। পাটিপাতার চাষ লাভজনক বিবেচনা করেন এজন্য যে, এতে ঝড় বা অন্য কোনো রকম ঝুঁকি নেই। চাষ করতে টাকা-পয়সা খরচের বিষয় নেই। তাঁর মতে, রোপণ কিংবা ফসল তোলার মৌসুমে নগদ টাকা জোগাড় করাই কৃষকের জন্য বড় সমস্যা। আ. ক. ম ইসহাকের মতো আরো কয়েকজন কৃষকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো, পাটিপাতার আবাদ তারা লাভজনক মনে করেন কিনা। সকল কৃষকেরই মত হচ্ছে, পাটিপাতার চাষে ধানের তুলনায় অনেক বেশি লাভ। তাঁদের মতের সঙ্গে বন বিভাগের তথ্যের মিল পাওয়া যায়। বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ১০ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাবে মুর্তা বা পাটিপাতা উৎপাদন ধান অপেক্ষা হেক্টরপ্রতি ৫০ হাজার টাকা বেশি।[১৩] তাঁরা কেন পাটিপাতার মতো লাভজনক অর্থকরী শস্য আবাদ করেন না এই প্রশ্নে অধিকাংশের উত্তর ছিলো, কৃষকরা সহজে নতুন কিছু চাষ করতে চায় না। তাছাড়া সরকারিভাবেও প্রচলিত ফসল উৎপাদনেই উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে ভালো হলেও কৃষি বিভাগ পাটিপাতা চাষের বিষয়ে উৎসাহ জোগায়নি। আর কৃষকগণ চাল কিনে খাওয়াকে অসম্মানজনক মনে করেন। তবে এই মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

একটি গবেষণায় উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মাত্র ৩% প্রান্তিক কৃষকগণের ভাগ্যে জোটে, যদিও এক্ষেত্রে ভূমিহীনরা পায় ৮% এর বেশি আর ধনী কৃষকরা পায় ৮৮% -এরও বেশি।[১৪] ব্যাংকঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানা রকম আনুষ্ঠানিকতা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসাধুতা ও স্বজনপ্রীতি আর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিভিন্ন খরচ কৃষকদের দেশীয় মহাজনদের কাছে নগদ টাকার জন্য যেতে বাধ্য করে। বিশেষ করে, প্রান্তিক কৃষকরা মাত্র তিন-চার মাসের জন্য বিপন্ন অবস্থায় পড়ে দাদনদারের কাছে যায়। আর এই ঋণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচ মিলে ১০০% - এরও বেশি পড়ে। এর সাথে উৎপাদনের অন্যান্য খরচ যোগ হয়ে উৎপাদিত ফসলের সিংহভাগ চলে যায়। দাদনের ঋণশর্ত ও পরিশোধের বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। দাদনের অর্থ আদায় করা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফসলের মাধ্যমে। ফসল তোলার সময়ে ধানের দাম আন্দাজ করে তার ভিত্তিতে সুবিধাজনক রেয়াতি দরে দাম ধার্য করে ভবিষ্যতে পরিশোধ্য ঋণ ও এর সুদসহ হিসাব করে কত মন ধান শোধ দিতে হবে তা ঋণ গ্রহণের সময়েই নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। কোনো কোনো এলাকায় পরিশোধ্য ফসলের দাম অর্ধেকপ্রায় ধার্য করা হয়ে থাকে। নতুন ফসল ওঠার পর সর্বাগ্রে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এই দূরবস্থার জাঁতাকলে পড়ে প্রান্তিক কৃষকের শ্রম-ঘামের ফসল আর তার ঘরে থাকে না; প্রকারান্তরে দাদনদারের পুঁজিই বাড়ে তার জমি আর শ্রমের ফসলে। সংসার চালাতে ব্যর্থ হয়ে ধীরে ধীরে এই প্রান্তিক কৃষকেরা একসময়ে ঋণের দায়ে ভূমিহীনে পরিণত হয়।

ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হলেও ফসলের উৎপাদনের অত্যধিক খরচ বহন করতে গিয়ে প্রতি বছর অনেক প্রান্তিক কৃষক যে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে সেদিকে এখনো পর্যন্ত সঠিক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। বিভিন্ন এনজিওর সুবাদে ভূমিহীন মানুষেরা এখন সহজে ঋণ পাচ্ছে। তাদের জন্য ঋণ পাওয়া এখন যতটা সহজ, এনজিওদের টার্গেট গ্রুপের

---

[১৩] মোঃ শফি ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৬।

[১৪] Shahidur R. Khandaker, "Savings, Informal Borrowings, and Microfinance", *The Bangladesh Development Studies*, Vol.26, Nos. 2&3, June-Sept. 2000, p.61.

অর্ন্তভুক্ত না হওয়ায় আর কৃষি-অকৃষি ব্যাংকগুলোর অব্যবস্থা, পলিসির দুর্বলতাসহ অন্যান্য কারণে প্রান্তিক কৃষকের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া ততটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে বাস্তবতা হচ্ছে যে, প্রান্তিক কৃষকরা সরকারি বেসরকারি যে কোনো উৎস হতে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি অবহেলিত। তারা আছেও নাজুক অবস্থানে এবং সংকটে। প্রচলিত ফসল ফলাতে গিয়ে সারা বছর জমিতে খাটতে হয়। ফলে তারা না পারছে অল্প জমি আবাদ করে তার আয় দিয়ে সংসার চালাতে, না পারছে একই সঙ্গে অন্য কোনো পরিপূরক পেশা গ্রহণ করতে। এই অবস্থায় সংসার চালানো এবং অন্যান্য খরচ যেমন পুত্র-কন্যার বিয়ে ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানাদিও জন্য ঋণ করে আর তা পরিশোধ করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত ঋণের দায়ে জমিটুকুই হারাতে হচ্ছে।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সোনাগাজী এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ পাটিপাতাকে বিকল্প একটি অর্থকরী শস্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা পাটিপাতার চাষে অধিক লাভবান হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, জমিতে কেবল পাটিপাতা চাষ করতে পেরে তারা একই সঙ্গে একটি পরিপূরক কর্মসংস্থান করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতেও সক্ষম হয়েছেন। একজন কৃষকের দুই পুত্র বিদেশ চলে গেলেও পাটিপাতার চাষের কারণে কৃষক নিজেই জমি চাষ করতে পারছেন। অন্য একজন তার জমিতে পাটিপাতা লাগিয়ে মুদি দোকান দিয়ে ব্যবসা করতে পারছেন। তার জমির আয় ব্যতীত দোকানের আয় মাসিক গড়ে ২ হাজার টাকা। জরিপে অংশগ্রহণকারী দুজন কৃষক তাদের পাটিপাতার জমিতে মাছ চাষ করেন। ধানক্ষেতে মাছ চাষের চাইতে এই জমিতে মাছচাষ আরো ভালো হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। কৃষকদের সকলেই উল্লেখ করেন যে, কোনো প্রকার চাষ ছাড়াই প্রতি বছর বর্ষার পর পানি শুকিয়ে গেলে পাটিপাতার ক্ষেত থেকে প্রাকৃতিক মাছ ধরতে পারেন, ফসলের অতিরিক্ত এই আয় একরপ্রতি ৩ হাজার টাকার মতো।

৫. পাটিপাতা ও সোনাগাজীর মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান

জরিপে অংশ নেওয়া ২০ জন মহিলার মধ্যে ৭ জন এনজিও সদস্য, ৫ জন আনসার ভিডিপির সদস্য। ২ জনের স্বামী রাজনৈতিক সহিংসতায় জড়িয়ে নিখোঁজ দুই বছর, ১ জন স্বামী পরিত্যক্তা এবং ১ জন বিধবা। ৬ জন উত্তরদাতা মহিলার পরিবারে লোকসংখ্যা ৫ জন করে, তাদের সন্তান সংখ্যা ৩ জন করে। অপর ৮ জনের পরিবারে সদস্য ৬ জন করে। উত্তরদাতাদের সকলেই দৈনিক কমপক্ষে ৫ ঘণ্টা পাটি তৈরির কাজ করেন। প্রাপ্ত তথ্য মতে, একজন মহিলা তাঁর সংসারের অন্যসব কাজ করার পর পাটি তৈরি করে সর্বনিম্ন আয় করেন মাসে ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ মাসে ১৪০০ টাকা। তাঁদের আয়ের গড় মাসে ৮০০ টাকা। স্বামী পরিত্যক্তা একজন মহিলা পাটি তৈরির কাজে তাঁর কিশোরী মেয়ের সহযোগিতায় মাসে ১৪০০ টাকা আয় করেন। তাঁরা সকলেই নিজেদের সংসারের দৈনন্দিন কাজ করেন এবং সময় বাঁচিয়ে পাটি তৈরির কাজ করেন। তাঁদের কাজে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুরা সহযোগিতা করে থাকে। জরিপে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে, সোনাগাজীতে যেমন বেঁচে থাকার জন্য, তেমনি সংসারের কাজের পর বাড়তি আয়ের জন্যও এখানকার মহিলারা পাটি তৈরির কাজ করেন।

একটি গবেষণার তথ্য অনুযায়ী পোশাক শিল্পে মহিলারা কাজ করেন ১২ ঘণ্টা, সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা। এ শিল্পে নিয়োজিত মহিলাদের গড় মজুরি ৮৮৬ টাকা। এদের মধ্যে ৪০ শতাংশের মজুরি ৫০০ টাকার কম। ১৯৯৭ সালে পোশাক শিল্পে মহিলা শ্রমিকের নিয়মিত বেতন ১৩২১ টাকা ছিলো।[১৫] এই জরিপের তথ্য এবং সোনাগাজীর পাটিবুননের কাজে নিয়োজিত মহিলাদের আয়ের তুলনা করলে সহজেই কর্মসংস্থানে পাটিপাতার অবদান বোঝা যায়।

---

[১৫] পারভীন সুলতানা, "কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহিলাদের অংশগ্রহণ", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৮।

জরিপে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মতে, গড়ে ২০০০ টাকা পুঁজির দরকার। এলাকার এনজিও থেকে এনজিও সদস্যরা এবং মহিলা আনসার ভিডিপি সদস্যরা আনসার ভিডিপি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পুঁজির অভাব মিটিয়েছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক এনজিওর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অধীন ঋণদান খাতসমূহ পূর্ব নির্ধারিত। পাটি বুনন খাতে কোনো এনজিও ঋণ দেয় না। সোনাগাজীতে এনজিওর মহিলা সদস্যরা অন্য কোনো খাতে ঋণ নিয়ে তা পাটি তৈরির কাঁচামাল ক্রয়ে ও আপৎকালীন সময়ে ব্যয় করেন। কিন্তু ঋণদানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক। সোনাগাজী আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-এর তথ্য মতে, এই ব্যাংক পাটিবুনন খাতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে সদস্যদের ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার বেশি ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। এর শাখার ঋণগ্রহীতাদের ৭০ ভাগ মহিলা, যাদের সকলেই পাটি বুননের জন্য ঋণ নিয়েছেন। আনসার ভিডিপি ব্যাংকের সোনাগাজী শাখার প্রস্তাবে "পাটিবুনন"কে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় একটি ভিন্ন খাত হিসেবে চিহ্নিত করে কেন্দ্র অনুমোদন দিয়েছে। স্থানীয় ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে পাটিবুনন খাতে তাঁদের নির্দিষ্ট কোনো ঋণদান কর্মসূচি বা বিনিয়োগ নেই। তাঁরা স্বীকার করেন যে, খাতটি আগ্রহ-উদ্দীপক এবং লাভজনক বলে তাঁদের জানা আছে। স্থানীয় বিআরডিবির চেয়ারম্যানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পাটিবুনন খাতে এই সংস্থার এক লক্ষাধিক টাকার বিনিয়োগ রয়েছে। তিনি জানান, এই খাতে আদায়ের হার ৮০ ভাগের বেশি।

সোনাগাজী এলাকায় সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী এখানে কেবল মহিলারাই পাটি বোনেন। তবে তৈরি পাটি বিক্রয় করেন সাধারণত পরিবারের পুরুষ সদস্যরা। উত্তরদাতাদের সবাই (যাদের সকলেই মহিলা) জানান যে, তাদের পরিবারে কেবল মহিলারাই পাটি তৈরি করেন। তাদের মধ্যে ২ জন উল্লেখ করেন যে, তাদের পরিবারে কোনো পুরুষ সদস্য না থাকায় তারা নিজেরাই তৈরি করা পাটি হাটবারে বিক্রয় করেন এবং পাটিপাতা কিনে আনেন। ১০০ টাকার পাটিগাছ দিয়ে গড়ে ২৫০ টাকার মতো পাটি তৈরি করা যায় বলে অধিকাংশের মত। সোনাগাজী ও এর আশপাশে উৎপন্ন পাটি স্থানীয় বখতারমুন্সি, লেমুয়া (ফেনী সদর উপজেলার একটি হাট), সোনাগাজী বাজারে হাটবারে বিক্রয় হয়। এই এলাকার সবচেয়ে বড় হাট বখতারমুন্সি। এই হাটে জুলাই-আগস্ট মাসের ৫ হাটের বিক্রয়ের গড় করে দেখা গেছে যে, প্রতি হাটে পাটির বিক্রয় ৭০ হাজার টাকার বেশি। জানা যায় শীত মৌসুমে বিক্রয় আরো বেড়ে গিয়ে প্রতি হাটে ১ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যায়। বখতারমুন্সি বাজারে পাটির আড়তদার রয়েছে ৬ জন। তারপরে আছে বহু সংখ্যক পাইকার। তারা উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে পাটি কিনে আড়তদারের কাছে দেন। আড়তদাররা বিভিন্ন জেলার চাহিদা অনুসারে সারা দেশে পাটি চালান দেন। সড়ক যোগাযোগ ভালো থাকায় ট্রাকে সোনাগাজীর পাটি সহজেই পৌঁছে যায় দেশের প্রায় সকল জেলায়। আড়তদার এবং পাইকারদের হিসেব মতে সোনাগাজী এলাকায় উৎপাদিত পাটির বার্ষিক বাজারমূল্য ৫ কোটি টাকার বেশি। বখতারমুন্সি বাজারে পাটি কেনা-বেচার কাজে কমপক্ষে ৫০ জন এবং তাদের সহযোগী ২০-২৫ জন শ্রমিক আছেন বলে মত পাওয়া গেছে।

৬. পাটিপাতা: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান

বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রয়াস বিভিন্ন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা যায় না পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থা অনুকূল না থাকায়। যেমন, কৃষিতে ফলন বাড়লেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাঝে মাঝেই কৃষকের ফসল কেড়ে নেয় । জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি বিবেচনায় সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার এখন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় কোনো রকমে বেঁচে থাকার আশায় গ্রামের মানুষ শহর অভিমুখে ছুটে যাচ্ছে। বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য বিকেন্দ্রীকৃত কর্মসংস্থান ছাড়া শহরমুখী অভিগমন রোধ সম্ভব নয়, এখন আর এবিষয়ে তেমন দ্বিমত নেই। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অবলম্বন অনেক কুটির শিল্প হারিয়ে যাচ্ছে কাঁচামাল ও পৃষ্ঠপোষকতা নেই বলে। এসব আর্থসামাজিক সমস্যা নিরসনে পাটিপাতার মতো

উৎপানশীল দেশীয় সম্পদ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম, সোনাগাজীর প্রেক্ষাপটে এই প্রত্যাশা অমূলক মনে হয় না।

সিলেটের শীতলপাটির কথা সুবিদিত। কিন্তু সেখানেও কাঁচামাল, পুঁজি আর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই ঐতিহ্যময় শিল্পও আজ বিলুপ্তির পথে। সিলেটের বালাগঞ্জের গৌরীপুর ইউনিয়নের তেঘড়িয়া ও বিলবাড়ি গ্রাম একসময়ে শীতল পাটি তৈরির প্রধান কেন্দ্র ছিলো। কেবল বিলবাড়ি গ্রামেই ১৫০ পরিবার শীতল পাটি তৈরির কাজ করতো। এখন সেখানে মাত্র পাঁচ-ছয় ঘর এই কাজ করে। এর প্রধান কারণ মুর্তাগাছের অপ্রতুলতা আর অর্থের অভাব।[১৬] শুধু শীতল পাটিই নয়, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কারিগর, উদ্যোগ আর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এদেশের অনেক কুটির শিল্পই হারিয়ে যেতে বসেছে। সোনাগাজীতে পাটিপাতার লাভজনক আবাদ আর একে ঘিরে আত্মকর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আমাদের বিলীনপ্রায় শিল্পের পুর্ননির্মাণের সুযোগ এনে দিয়েছে। এখানকার কৃষকরা দিন দিন পাটিপাতার চাষ বাড়িয়ে চলেছেন। গত ৫ বছরে পাটিপাতার চাষ কমপক্ষে দ্বিগুণ হয়েছে। লাভজনক বলেই বেড়েছে।[১৭] জরিপে অংশ নেওয়া কৃষকগণ জানান, তিন ফুট উঁচু আল বেঁধে পানি ধরে রেখে এক একর পাটিপাতার জমি থেকে বছরে ১০ হাজার টাকার সরপুটি জাতীয় মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এতে বাড়তি আরো কিছু আয় হবে।

মূলত কাজের অভাব এদশের গ্রামের গরিব মানুষকে স্থানান্তর করে। কাজ না পেলে বেঁচে থাকার জন্য কাজের খোঁজে দেশের যে কোনো স্থানে যেতে পরিস্থিতি তাদেরকে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে আলোকোজ্জ্বল শহরই তাদের বেশি প্রলুব্ধ করে । তাছাড়া পোশাক শিল্প, রিকশাটানা, ফেরি করে জীবন চালানোর মতো কিছু কিছু সুযোগ কেবল শহরেই আছে। সোনাগাজীতে পাটি তৈরির কাজে নিয়োজিত মহিলাদের সকলেই অবস্থান দারিদ্র্য সীমার মধ্যে। পাটি বানানোর মতো উপার্জনশীল একটি কাজ করার সুযোগ না থাকলে তারাও হয়তো বাঁচার আশায় গ্রাম ছেড়ে সপরিবার শহরে পাড়ি জমাতো। উপার্জন ও আত্ম-কর্মসংস্থান শহরমুখী অভিগমন থেকে অনেকগুলো পরিবারকে বিরত রেখেছে। শুধু বখতারমুন্সি হাটের পাটি বিক্রয়ের হিসাব থেকে দেখা যায় সোনাগাজী এলাকার পাটি বিক্রয়ের পরিমাণ বার্ষিক ৫ কোটি টাকার মতো। এই অঙ্ক বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে বাদ পড়লেও পাটিপাতা কয়েক হাজার দরিদ্র পরিবারকে শহরে অভিবাসন রোধ করছে একথা জোর দিয়ে বলা যায়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

প্রত্যেক মানুষেরই পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা জরুরি। পরিবার পরিজনসহ আপন সামাজিক পরিবেশে জীবন কাটাতে চায়। সঙ্গত কারণেই তার আপন পরিবেশে সে বেশি নিরাপদ বোধ করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মহিলারা তাদের আজন্মলালিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ লালন করে সারাজীবন। কর্মক্ষেত্রেও নারী যেমন আপন একটি পরিবেশ চায় তেমনি উপযুক্ত কর্মপরিবেশ না পেলে সে আরো বিপন্ন আর অসহায় বোধ করে। অথচ বাংলাদেশে শুধু পোশাক শিল্পই নয়, যে কোনো প্রতিষ্ঠানেই এর অভাব রয়েছে।

মহিলারা কর্মক্ষেত্রে নানা দিক থেকে ঝুঁকির সম্মুখীন হন। পোশাক শিল্পের মতো মহিলাশ্রমনির্ভর শিল্পের অবস্থাও খুবই নাজুক। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম, বিনোদনের সুযোগের অভাব, অতিরিক্ত পরিশ্রম, সহকর্মীর অশোভন আচরণ, কারখানা কর্তৃপক্ষের খারাপ ব্যবহার, বাধ্যতামূলক শ্রম, চাকুরির অনিশ্চয়তা, পদোন্নতির অভাব, স্বল্প মজুরি, মজুরি প্রাপ্তির

---

[১৬] জিনাত মাহরুখ বানু, "লোকশিল্প নিদর্শন সংগ্রহ সফর: সিলেট", *জাদুঘর সমাচার*, ঢাকা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৯।

[১৭] সাক্ষাৎকার: গোলাম মোস্তফা, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি বিভাগ, সোনাগাজী, ফেনী। তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ২০০০ তাঁর কর্মস্থলের অভিজ্ঞতার আলোকে এই মন্তব্য করেন।

অনিশ্চয়তা, দুর্ঘটনার ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র, অনিরাপদ বাসস্থান, অনিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা, সমাজ ও পারিবার সদস্যদের অপছন্দ, গৃহস্থালি কাজের বোঝা, স্বোপার্জিত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব ইত্যাদি অসংখ্য রকম অস্বাস্থ্যকর সামাজিক ও অমানবিক পরিবেশ মহিলাদের কর্মজীবনের শুরুতেই তাদের জীবনীশক্তি কেড়ে নেয়।[১৮] এগিয়ে যাবার যে স্বপ্ন নিয়ে কর্মজীবন শুরু করে তা অল্পদিনের মধ্যেই অবাস্তব হয়ে সামনে হাজির হয়। এই প্রতিকূল কর্মপরিবেশের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় ও আপন পরিবেশে কর্মসংস্থান মহিলাদের ব্যক্তিগত, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে সহায়ক এটা সহজেই অনুধাবন করা যায়। আপন পরিবেশে পাটি তৈরির কাজ সোনাগাজীতে মহিলাদের জন্য এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

কর্মসংস্থান আর উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন মানুষের নিয়তি। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস আর শিলাবৃষ্টির কবলে পড়ে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়। এসবের কারণে ফসলহানি যেন একরকম স্বাভাবিক ঘটনা। কীটপতঙ্গের অনিষ্ট ছাড়াও মনুষ্যসৃষ্ট উপদ্রব যেমন, চুরি ও বলপূর্বক ফসল কেটে নেওয়ার কারণেও এই এলাকায় কৃষকের ক্ষতি খুব কম নয়। পাটিপাতা যারা চাষ করেছেন তারা এসব আশঙ্কা থেকে মুক্ত। পাটিপাতা রুদ্র প্রকৃতির খেলার পুতুল নয়। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, শিলাবৃষ্টি এর কোনো ক্ষতি করতে পারে না, এর রয়েছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা। শুধু নিজেকেই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে পাটিপাতা যেন কৃষকের কল্যাণে এক ধরনের প্রাকৃতিক বিমা ব্যবস্থা। দুর্যোগ পরবর্তী অভাবের সময়ে কৃষক নগদ অর্থের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে পাটিপাতা বিক্রয় করে অর্থের জোগাড় করতে পারেন।

পাটিপাতার চাষ পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক। ছয় থেকে সাত ফুট উচ্চতার এই ঘনসবুজ গাছের ঝুপড়ি ও ছায়াশীতল ক্ষেত্র বিলীনপ্রায় অনেক প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়। নানা রকম পাখি ছাড়াও গুইসাপ, ব্যাঙ, উদবিড়াল, সজারু ইত্যাদিসহ বিরল প্রজাতির নানা প্রাণীর অভয় বিচরণ এখানে লক্ষ করা যায়। পাটিপাতার ক্ষেতে ছায়াঘেরা পরিবেশ তৈরির জন্য অনেক কৃষক মাদার জাতীয় গাছ রোপণ করেন। এই গাছ জ্বালানির চাহিদা পূরণ করতেও সহায়ক। কোনো কীটনাশক ও সার ব্যবহার দরকার নেই বলে পাটিপাতার জমি বিলুপ্তপ্রায় অনেক মিঠাপানির মাছের বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত ক্ষেত্র। পাটিপাতার গুচ্ছমূল মাটি ধরে রাখে ও মাটির ক্ষয়রোধ করে। ঝরাপাতা পচে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। বিশেষ করে উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসের পর মাটি উর্বর করার ক্ষেত্রে এই উদ্ভিদের ভূমিকা রয়েছে।[১৯]

৭. উপসংহার

সোনাগাজী উপজেলায় পাটিপাতার চাষ, আত্মকর্মসংস্থানে এর ব্যবহার পর্যবেক্ষণ এবং প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, দারিদ্র্য বিমোচনে পাটিপাতার আর্থসামাজিক গুরুত্ব যথেষ্ট। এর চাষ লাভজনক, পরিবেশানুকূল, প্রাকৃতিক দুর্যোগে এটি নাজুক নয়, প্রান্তিক কৃষকের জন্য এর চাষ অধিকতর সুবিধাজনক। পাটিপাতার চাষ করে অল্পজমির মালিক অন্য কোনো সম্পূরক পেশা গ্রহণ করে বাড়তি আয়ের পথ করতে পারেন। পাটিপাতা সোনাগাজীতে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার একই সঙ্গে কর্মসংস্থান যেমন করছে তেমনি এর অনুকূল প্রভাব দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পড়ছে। পাটিপাতার অর্থনৈতিক ব্যবহারজনিত কর্মকাণ্ড ও মূল্য সংযোজন গরিব মানুষের উপার্জনের পথ করে শুধু গ্রামের মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবস্থাই করছে

---

[১৮] প্রতিমা পাল মজুমদার, "কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি: পোশাক শ্রমিকের মানসিক স্বাস্থ্য অবস্থা", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, সপ্তদশ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৬।

[১৯] সাক্ষাৎকার: মোঃ শাহজাহান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক ধান গবেষণা কেন্দ্র, সোনাগাজী, ফেনী। তারিখ: ৮মে ২০০০।

না, এর মাধ্যমে শহরমুখী অভিবাসন রোধ করতে পরোক্ষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে, মহিলাদের সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তাবেষ্টনী মজবুত করছে।

পাটিপাতা দিয়ে তৈরি শীতল পাটির চাহিদা শুধু দেশেই নয়, এর কদর রয়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। সিলেটের শীতলপাটি ইউরোপ এবং আমেরিকায় পাঠানো হয়ে থাকে।[২০] জাপানের মতো উন্নত দেশে পাটিজাত পণ্যের বেশ চাহিদা আছে। জাপানে ঘরে ঘরে এক ধরনের মাদুর ব্যবহার করা হয়, যা মূলত উদ্ভিজ্জ পাটি।[২১] শীতল পাটি ইদানীং গৃহসজ্জার কাজে ব্যবহার হতে দেখা যায়। পরিবেশ সহায়ক সামগ্রী হিসেবে এর ব্যবহার বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠছে। পাটিপাতার লাভজনক চাষের সুবিধা এক্ষেত্রে সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে।

জীববৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলাদেশের গ্রাম-প্রকৃতিতে এখনো এমন অনেক উদ্ভিদ ছড়িয়ে রয়েছে, যা কুটির শিল্পের মূল্যবান কাঁচামাল জোগান দিতে সক্ষম। সোনাগাজীর পাটিপাতার আবাদ এবং পাটি তৈরির কাজে মহিলাদের কর্মসংস্থান সেদিকেই ইঙ্গিত করে। শিল্পোন্নত জাপানেও এক সময়ে শিল্পের ভিত রচনা করেছিল কুটির শিল্প। আধুনিক রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাটিপাতার মতো অন্যান্য কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে কুটির শিল্পে দেশীয় জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য পণ্য তৈরি করা যেতে পারে। আশার বিষয়, পরিবেশ অনুকূল সামগ্রী ও কারুপণ্যের প্রতি এখন মানুষের মনোযোগ বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে, চাহিদাও বাড়ছে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি রুচিশীল ও সৌখিন পণ্য অনেক দেশেই রপ্তানি করার সুযোগ রয়েছে। উপযুক্ত উদ্যোগ নেওয়া গেলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাটিজাত নানা রকম পণ্য রপ্তানি করা যায়। পাটিপাতার চাষ উৎসাহিত করা হলে একদিকে যেমন কৃষকরা লাভবান হবেন, অন্যদিকে এর মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক কুটির শিল্পের লালন, উৎপাদন এবং এর বৈচিত্র্যময় ব্যবহার দ্বারা গ্রামীণ কর্মসংস্থান অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হবে, একই সঙ্গে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও তা বিশেষ অবদান রাখবে।

---

[২০] জিনাত মহরুখ বানু, *প্রাগুক্ত*।

[২১] সাক্ষাৎকার: ড. মোস্তফা কামাল, আই বি এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০০। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে ড. কামাল বলেন, সম্প্রতি জাপানের একটি পর্যটকদলকে শীতল পাটি দেখানো হলে সদস্যরা জানিয়েছিলেন জাপানে এরকম পণ্যের বেশ চাহিদা রয়েছে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

বার্ধক্য ও নিঃসঙ্গতা : নাটোর জেলার একটি থানার উপর সমীক্ষা

শর্মিষ্ঠা রায়*

Abstract: With the development of civilization, social prestige of the elderly people is gradually decreasing on account of changing family structure. The impact of this change is reflected in people's mentally, social values and interpersonal human relations. They are not only deprived of socio-economic facilities, but also they feel bored due to facing loneliness and isolation. In this article, the causes of loneliness and isolation of the elderly people are identified. After presenting two specific case-studies, some recommendations have also been suggested in order to make the life of elderly people more fruitful and comfortable.

ভূমিকা

বার্ধক্য অপ্রতিরোধ্য এবং অবশ্যম্ভাবী। তবে, কখন বার্ধক্য আসবে এর কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। এটা নির্ভর করে ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপর। জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বার্ধক্য হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ। প্রচলিত প্রবাদ আছে 'তিন মাথা যার, বুদ্ধি নিবি তার'। অর্থাৎ বার্ধক্য মানেই অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতায় ভরপুর। কেউ কেউ মনে করেন বার্ধক্য অভিশাপ, কেউ ভাবেন বার্ধক্য আশীর্বাদ। সবকিছুই নির্ভর করে মূল্যবোধ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ওপর।

আজকের বিশ্বে নবীন-প্রবীণের মাঝে গড়ে উঠেছে বিরাট ব্যবধান। প্রজন্ম পার্থক্য (Generation Gap) বলে যে কথাটি আজকাল প্রচলিত তার উৎপত্তি ঘটেছে আধুনিকায়ন (Modernization) থেকে। আধুনিকায়নের ফলে মানুষের জীবন-যাপন প্রণালীতে এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। জীবন যাপনের জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতি ঘটেছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে; আর পরিবর্তন এসেছে মানুষের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে। ফলে যে বয়োবৃদ্ধ একদিন ছিলেন পরিবারের কর্ণধার, সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সেই বয়োবৃদ্ধের মর্যাদা এখন নিম্নমুখী। পরিবারের বাইরে বিভিন্ন ধরনের সংঘ-সমিতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণে আগের মতো পরিবার আর ভূমিকা পালন করতে পারছে না; কিংবা ততোটা প্রয়োজনও হচ্ছে না। এখন আর কারো 'তিনমাথার' কাছ থেকে বুদ্ধি নেবার দরকার নেই।

শিল্পায়ন ও শহরায়ন মানুষের জীবনে গতিশীলতা এনে দিয়েছে, যার ফলে মানুষ ক্রমশ বহির্মুখী হয়ে পড়ছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে, দেশ থেকে দেশান্তরে মানুষ ছুটছে উন্নত জীবনের অন্বেষণে। পরিবারের দিকে পেছন ফিরে তাকাবার, বয়োবৃদ্ধ পিতা-মাতা, দাদা-দাদীর মতো নির্ভরশীল সদস্যদের দেখাশোনা, সেবা-যত্ন করা, তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা শোনার মতো অবকাশ বা ইচ্ছা

* ড. শর্মিষ্ঠা রায়, সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কোনোটাই নবীনদের মধ্যে দেখা যায় না। এই ব্যস্ততা তাদেরকে প্রবীণদের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রবীণরাও আজকাল অনেকাংশে প্রজন্ম ব্যবধান সৃষ্টির জন্য দায়ী। কারণ পুরাতনকে ফেলে নতুনকে আলিঙ্গন করার মতো ইচ্ছা বা মেনে নেওয়ার প্রবণতা তাদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায় না। ফলে সৃষ্টি হয় মানবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আজকের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে প্রবীণরা ক্রমেই হয়ে পড়ছেন নিঃসঙ্গ। কারণ পাশ্চাত্যের পার্থিব প্রগতির ধারায় জন্ম নিয়েছে যান্ত্রিক সভ্যতা, নিতান্ত ই আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক, ভোগবাদ এবং নৈতিক বিচ্যুতির বিকাশ ঘটেছে (ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ১৯৯৮:১৫৮)। ফলে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে নবীন প্রজন্ম বিশেষ করে সন্তান-সন্ত তি, বৃদ্ধ পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে পাড়ি জমাচ্ছে অন্যত্র। এতে অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনির সাহচর্য বঞ্চিত হয়ে আনন্দহীন জীবন যাপন করছেন। বার্ধক্যের কারণে তারা পরিবার ও সমাজ থেকে যথার্থ মূল্য লাভ থেকে বঞ্চিত। এ কারণে তারা কর্তৃত্ববিহীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং পরিণামে জীবন সম্পর্কে তাঁদের ভেতর বিতৃষ্ণাবোধ সৃষ্টি হয়। আর এই বিতৃষ্ণাবোধ থেকেই বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয় (রায়, ২০০২:৯)। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক পর্যবেক্ষণমূলক রিপোর্ট থেকে এটি প্রতিভাত হয়েছে যে, বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ, একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, অসুস্থতা, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যার ভীতি ইত্যাদি দুর্বিষহ অবস্থা মোকাবেলায় প্রবীণদের কাছে তখন একমাত্র বিকল্প পথ হয়ে দাঁড়ায় আত্মহত্যা। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশে প্রবীণদের ওপর পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতার বিষয় লক্ষ করা গেছে (ট্রেনিং ম্যানুয়াল,১৯৯৮:১৬০)। অপর একটি গবেষণায় লক্ষ করা গেছে যুবকদের তুলনায় বৃদ্ধদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি, এবং এর হার পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভেতরে কম (Mcintosh,1986:20, Dermerath & Marwell, 976:411)। এসব দিক বিবেচনায় রেখে, আলোচ্য প্রবন্ধে বয়োবৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ববোধের কারণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ব্যবহৃত প্রত্যয়

আলোচ্য প্রবন্ধে 'বার্ধক্য' এবং 'নিঃসঙ্গতা' নামক দুটি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। 'বার্ধক্য' প্রত্যয়টি দ্বারা বৃদ্ধকালকে বোঝানো হয়েছে, যাদের বয়স ৬০ বা তার উর্ধ্বে। United Nations ৬০ বছর বয়সকে Starting point of Aging বলে আখ্যায়িত করেছে। একইভাবে আরো কয়েকজন গবেষকের মতে, 'Old age is Considered as 60 years and above of an individual in connection with the retirement system and state law (Aziz & Maloney,1985)। Sattar and Rahman তাঁদের 'The Elderly in Bangladesh 1911 - 2025' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বয়সের ভিত্তিতে বৃদ্ধদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা: বৃদ্ধ (৬০-৬৯ বছর), অতিবৃদ্ধ(৭০-৭৯ বছর) এবং চরম বৃদ্ধ (৮০ এর উর্ধ্বে) (Sattar & Rahaman,1992:5)। শুধু বয়স কিংবা আইনগত ভিত্তিতে বার্ধক্য নির্ণয় করা যায় না; কখনো কখনো আর্থ-সামাজিক, শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার দিক থেকেও বার্ধক্য নিরূপণ করা হয়। প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী (১৯৯৪) "ভারতবর্ষে বৃদ্ধ বয়সের সমস্যা" শীর্ষক তাঁর এক প্রবন্ধে গ্রামীণ ও শহুরে বৃদ্ধদের আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি বলেন, 'গ্রামে সচরাচর ব্যক্তির দৈহিক সামর্থ্য, অক্ষমতা, স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সুস্পষ্ট চিহ্ন, যেমন, বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া, চামড়া কুঁচকে পড়া, চোখে ছানি পড়া, লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করা ইত্যাদি শারীরিক পরিবর্তন দিয়ে বৃদ্ধদের চিহ্নিত করা হয়। অপর পক্ষে, শহুরে বৃদ্ধ হলো যারা চাকরি বা স্থায়ী কাজ-কর্ম থেকে অবসর নিয়ে নিজের বা পুত্রের সংসারে অলস ও নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করছেন। তাঁর উক্ত প্রবন্ধে উভয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য বিচারের মাধ্যমে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাবস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, নিঃসঙ্গতা প্রত্যয়টির দ্বারা জীবনের এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে, যখন মানুষ সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্য বঞ্চিত হয়ে এক দুর্বিষহ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধটি নাটোর জেলার অন্তর্গত বাগাতিপাড়া থানার ৫টি ইউনিয়নে বসবাসরত ৩৭৮ জন বয়োবৃদ্ধের ওপর সমীক্ষার ফল। তথ্য সংগ্রহের জন্য থানার ৫টি ইউনিয়ন থেকে দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ৫টি গ্রাম নির্বাচন করা হয়। তারপর উক্ত ৫টি গ্রামে বসবাসরত বয়োবৃদ্ধদের কাছ থেকে প্রশ্নমালা ও সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া বয়োবৃদ্ধদের জীবন যাপন প্রণালী ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের বাস্তব অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। আর এজন্য ঘটনা অধ্যয়ন (case study) এবং পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

'নিঃসঙ্গতা' প্রবীণ-জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রপঞ্চ। জীবনের একটি বিশেষ সময়ে এসে মানুষ উপলব্ধি করে সে কতটা একাকী, কতটা নিঃসঙ্গ। ভাই-বন্ধু, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন সবাই যখন যে যার প্রয়োজনে পরিবার নামক বৃত্তটি থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে সময় শুধু পুরাতন স্মৃতিকে আঁকড়ে পড়ে থাকেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা তখন তাদের আচ্ছন্ন করে দেবে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বসবাসরত বয়োবৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বের একটি নমুনা হিসেবে উল্লিখিত ক্ষেত্র-গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ সারণি আকারে দেখানো হলো:

সারণি ১

গবেষণাধীন ইউনিনের নিঃসঙ্গ বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী সম্পকিত উপাত্ত

ইউনিয়ন	বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী		মোট (N=৯৭) (%)
	পুরুষ (N=৪৪) (%)	মহিলা (N=৫৩) (%)	
পাঁকা	১৩ (১৩.৪০)	১৪ (১৪.৪৩)	২৭ (২৭.৮৩)
জামনগর	১২ (১২.৩৭)	১৩ (১৩.৪০)	২৫ (২৫.৭৭)
বাগাতিপাড়া	১২ (১২.৩৭)	১৮ (১৮.৫৬)	৩০ (৩০.৯৩)
দয়ারামপুর	৫ (৫.১৫)	৫ (৫.১৫)	১০ (১০.৩০)
ফাগুয়ারদিয়ার	২ (২.০৬)	৩ (৩.০৯)	৫ (৫.১৫)
মোট	৪৪ (৪৫.৩৬)	৫৩ (৫৪.৬৩)	৯৭ (১০০)

মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য

উপর্যুক্ত সারণির উপাত্ত থেকে জানা যায়, গবেষণাধীন এলাকায় নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বের সমস্যায় ভুগছেন ৪৫.৩৬% পুরুষ এবং ৫৪.৬৩% মহিলা। ইউনিয়ন ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস থেকে আরো লক্ষ করা যায় যে, পুরুষ অপেক্ষা মহিলারাই বেশি নিঃসঙ্গতায় ভোগেন। প্রধানত এর কারণ আমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামবাংলার মহিলাদের হাঁটাচলা বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পুরুষেরা নিজেদের একাকীত্ব ঘোচাতে চায়ের স্টল বা হাটে-বাজারে বসে বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প করে অথবা খেলার মাঠে গিয়ে সময় কাটাতে পারেন। কিন্তু মেয়েরা পর্দানসিন হওয়ায় এবং রক্ষণশীলতার কারণে পুরুষদের মতো যেখানে-সেখানে যাতায়াত করতে পারেন না। বড়জোর মাঝে মধ্যে পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে গল্প-গুজব করে সময় কাটাতে পারেন। তবে

দিনের বেশিরভাগ সময়ই কাটে বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে। বয়স ভেদে এ সকাল বৃদ্ধের নিঃসঙ্গতা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণি ২

গবেষণাধীন ইউনিয়নের বয়সভিত্তিক বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠীল নিঃসঙ্গতা সম্পর্কিত উপাত্ত

বয়স	বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী		মোট (N=৯৭) (%)
	পুরুষ (N=৪৪) (%)	মহিলা (N=৫৩) (%)	
৬০ - ৬৯	১০ (১০.৩১)	১২ (১২.৩৭)	২২ (২২.৬৮)
৭০ - ৭৯	২৭ (২৭.৮৩)	৩২ (৩২.৯৮)	৫৯ (৬০.৮১)
৮০ +	৭ (৭.২২)	৯ (৯.২৮)	১৬ (১৬.৪০)
মোট	**৪৪ (৪৫.৩৬)**	**৫৩ (৫৪.৬৩)**	**৯৭ (১০০)**

মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য

উপরের সারণি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব বৃদ্ধি পায়। গবেষণাধীন এলাকায় ৭০-৭৯ বছর বয়সীদের মধ্যেই নিঃসঙ্গতাবোধ বেশি। কারণ এই বয়সেই বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে কতক জৈবিক পরিবর্তন দেখা যায়, যেমন স্নায়বিক দুর্বলতা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, এবং চলাফেরায় জড়তা। এসব কারণে একান্ত ব্যক্তিগত কাজকর্ম, যেমন স্নান করা, কাপড় পরা, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা, পায়খানা-প্রস্রাবখানায় যাওয়া ইত্যাদি কাজে ক্রমশ অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এ অবস্থায় মানুষের চলফেরার ক্ষেত্রেও শিথিলতা দেখা যায়। মানুষ ক্রমশ ঘরমুখো হয়ে পড়ে। তখনই নিঃসঙ্গতাবোধ বেশি অনুভূত হয়। নিঃসঙ্গতাবোধের সাথে বৈবাহিক মর্যাদার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বৈবাহিক মর্যাদা বলতে এখানে বয়োবৃদ্ধদের বৈবাহিক অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে। বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে তাঁদের দম্পতি (স্বামী-স্ত্রী বর্তমান), বিপত্নীক, বিধবা, তালাক প্রাপ্তা অথবা স্বামী পরিত্যাক্তা ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বর্তমান গবেষণাধীন এলাকায় বসবাসরত বয়োবৃদ্ধদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত হলো:

সারণি ৩

গবেষণাধীন ইউনিয়নের নিঃসঙ্গ বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর বৈবাহিক অবস্থা সংক্রান্ত উপাত্ত

বৈবাহিক মর্যাদা	বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী		মোট (N=৯৭) (%)
	পুরুষ(N=৪৪) (%)	মহিলা(N=৫৩) (%)	
দম্পতি	৪০ (৪১.২৪)	১৬ (১৬.৪৯)	৫৬ (৫৭.৭৩)
বিপত্নীক/বিধবা	৪ (৪.১২)	৩৬ (৩৭.১১)	৪০ (৪১.২৩)
তালাক প্রাপ্তা/ স্বামী পরিত্যাক্তা	-	১ (১.০৩)	১ (১.০৩)
মোট	৪৪ (৪৫.৩৬)	৫৩ (৫৪.৬৩)	৯৭ (১০০)

মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য

উপরে প্রদত্ত সারণির উপাত্ত থেকে জানা যায়, গবেষণাধীন এলাকায় বসবাসরত বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে শতকরা ৫৭.৭৩ ভাগের স্বামী-স্ত্রী উভয়ই জীবিত, ৪১.২৩% বয়োবৃদ্ধ বিপত্নীক ও বিধবা, এবং ১.০৩% তালাকপ্রাপ্তা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা। এখানে লক্ষণীয় যে, বিপত্নীকের তুলনায় বিধবার সংখ্যাই বেশি।

বয়োবৃদ্ধদের জীবন যাপন প্রণালী প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই যে, মহিলারা একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতায় বেশি ভুগলেও পুরুষদের মধ্যে নিঃসঙ্গতার কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। এর মূলে রয়েছে জীবন সম্পর্কে তাদের চরম বিতৃষ্ণাবোধ। বার্ধক্যের ফলে তারা কর্মহীনতা এবং তাদের উপার্জনক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া আত্মহত্যার প্রবণতা বিধবার তুলনায় বিপত্নীকের মধ্যেই বেশি। কারণ এরা অধিকতর পরনির্ভরশীল। স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে সমস্যা দেখা দেয়। যতদিন স্ত্রী বেঁচে থাকেন ততদিন তিনিই স্বামীর দেখাশোনা করেন। কিন্তু স্ত্রী মারা যাবার পর প্রায় ক্ষেত্রেই বৃদ্ধরা অবহেলিত হন। তখন তাঁরা অন্যের কাছ থেকে যতটুকু সেবা যত্ন পান, তা নিতান্তই সৌজন্যমূলক। সেখানে কোনো আন্তরিকতা থাকে না । ফলে বৃদ্ধরা তখন নিজেদের অতিশয় অসহায় মনে করেন (আফরোজ, ১৯৯৯-২০০০:১০৪)। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'বুড়োর বুড়ী না মরে আর কচি ছেলের মা না মরে'। প্রবীণ মহিলারা সংসারে নিজেদেরকে জড়িয়ে কতকটা নিঃসঙ্গতা কাটাতে পারেন। তাঁদের মানসিকতাও সেভাবে গড়ে ওঠে। তাঁরা পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। হঠাৎ করেই এই পরিবর্তনকে তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। ফলে জীবন বিমুখ হয়ে উঠেন (শহীদ, ১৯৯৬:৪৭)।

নিঃসঙ্গতার কারণ

বর্তমান গবেষণাধীন এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বার্ধক্যে নিঃসঙ্গতার যেসব কারণ চিহ্নিত হয়েছে, সেসব পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. শ্রমের সচলতা

বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোয় বেশ কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। গ্রামীণ সমাজের পূর্বেকার স্বয়ং-সম্পূর্ণতা আজ আর নেই। কৃষিই এখন জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় নয়। শিল্পায়ন ও শহরায়নের প্রভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্নমুখী পেশার উদ্ভব হয়েছে। মুখ্যত গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে ক্রমশ শহরমুখী হয়ে পড়ছে এবং অকৃষিগত পেশার প্রতি ঝুঁকছে। বিশেষজ্ঞদের মতে গ্রাম থেকে শহরে ভিড় জমানো এখন আর নিছক বিলাসিতা কিংবা উচ্চাভিলাষ নয়, একান্তই বেঁচে থাকার বাধ্যবাধকতা (হোসেন, ১৯৮৮:১০৮)। ফলে বাবা-মা ও ভাই-বোন পরিবেষ্টিত আবাসস্থল ছেড়ে তারা শহরে জড়ো হচ্ছে। কেবল গ্রাম ছেড়ে শহরেই নয়, দেশ থেকে দেশান্তর গমনও এখন বাংলাদেশে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এভাবে গ্রামীণ কর্মক্ষম মানুষের শ্রমের সচলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বুড়ো বাবা-মা থাকছেন গ্রামে, যেখানে কেউ তাঁদের দেখার নেই। হয়তোবা সন্তানরা প্রবাসে থেকে পিতা-মাতার জন্য নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছে । কিন্তু সন্তানকে কাছে পাবার জন্য মনের যে আকুলতা সেটা তাঁদের পূরণ হচ্ছে না। একাকী জীবনে প্রিয়জনের সান্নিধ্য, রোগশয্যায় সন্তান-সন্ততির সেবা-স্পর্শ অনুভব তাঁদের কাছে অনেকটা এখন কল্পনায় ঘর বাঁধার মতো। সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজনহীন নিঃসঙ্গ জীবন যেন তাঁদের নিয়তি।

২. সন্তান-সন্ততির আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব

ইদানীং অনেকের কাছেই পারিবারিক জীবনের পরম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে একান্তই ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্বেষণ (মহাপাত্র, ১৯৯৬:২৯২)। উক্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যসূচক চিন্তা-চেতনা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সংক্রান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্যের কারণে পরিবারের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে। অধিকাংশ পরিবারেই দেখা যায়, উপার্জনক্ষম সন্তানরা নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আলাদা বসবাস করতেই বেশি আগ্রহী। কারণ এতে তারা অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে ক্রমশ একক পরিবারে পর্যবসিত হচ্ছে, যেখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ঠাঁই নেই। বুড়ো বাবা-মা কি খেলেন, কি

পরলেন তা দেখার সদিচ্ছা বা সময় তাদের নেই। এ ছাড়া প্রায়ই দেখা যায়, একই পারিবারিক পরিমণ্ডলে থেকেও ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনিরা বৃদ্ধ বাবা-মা, দাদা-দাদীর ভাল-মন্দের খোঁজ খবর নেয় না, অথবা অবসরে তাঁদের সঙ্গ দেয় না। ফলে বৃদ্ধদের মধ্যে নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব দেখা দেয়।

৩. সন্তান-সন্ততির অবহেলা ও উপেক্ষা

সন্তান-সন্ততির অবহেলা ও উপেক্ষা বয়োবৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতার অন্যতম প্রধান কারণ। বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের সামাজিক নিয়ম যেন আজ অনেকাংশেই নবীনদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু শ্রদ্ধা ও সম্মান না করাই নয়, তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণের মানসিকতাও খুব কমই লক্ষ করা যায়। পরিবারের বয়োবৃদ্ধ পিতা-মাতা অথবা দাদা-দাদী আজ বোঝা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দেখাশোনা করা এখন সন্তানদের কাছে দায় বলে বিবেচিত। তাই দুটো ভাত খেতে দেওয়া ও সামান্য কাপড়-চোপড় পরার ব্যবস্থা করা ছাড়া তাঁদের আরো কিছু প্রয়োজন রয়েছে কিনা; অসুস্থতায় চিকিৎসা আবশ্যক কিনা; সে সম্পর্কে তারা উদাসীন। এখন পিতামাতার শরীর ও মনের খবর নেওয়ার প্রয়াজন সন্তান-সন্ততি কদাচিৎ উপলব্ধি করে। ফলে বয়োবৃদ্ধরা নিজের অব্যক্ত মনোবেদনা ও দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আপন পরিবারেই পরবাসী হয়ে পড়েন।

৪. উচ্চশিক্ষার প্রসার

আধুনিক কালে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার উপকরণসমূহ এখন অনেক সহজলভ্য হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ভীষণ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় টিকতে পারলে জীবনে আসবে অর্থ, যশ ও প্রতিষ্ঠা। তাই আজকাল উন্নত জীবনের আকর্ষণে এবং উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় ছেলে-মেয়ে এবং নাতি-নাতনিরা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসছে অথবা দেশ থেকে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে এবং এক পর্যায়ে সে সব জায়গাই তাদের স্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তুলছে। দেশের কথা, বৃদ্ধ বাবা-মার কথা ভুলে যাচ্ছে অথবা তাঁদের প্রতি দায়-দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করছে। ফলে জীবন সায়াহ্নে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা হয়ে পড়ছেন বড়ই নিঃসঙ্গ ও একাকী।

৫. শারীরিক অক্ষমতা ও কর্মহীনতা

মানুষ যতদিন কর্মক্ষম থাকে ততদিন সংসারে তার মর্যাদা থাকে। দারিদ্র্য পরিবারগুলোকে এমন ভাবে জর্জরিত করে ফেলেছে যে, একজনের পক্ষে পরিবারের ৫-৬ সদস্যের খাওয়া-পরার ব্যয় বহন সম্ভব নয়। ফলে কর্মক্ষম প্রত্যেক সদস্যকেই জীবিকা নির্বাহের তাগিদে কোনো না কোনোভাবে রোজগার করতে হয়। দরিদ্র পরিবারগুলোতে বুড়ো বাবা-মাও এ থেকে রেহাই পান না। তাঁদেরকেও তাঁদেরদৈহিক সামর্থ্য অনুযায়ী রুজি করে সংসার চালাতে সাহায্য করতে হয়। সংসারে কোনো অবদান না রাখতে পারলে তাঁরা অবহেলার শিকার হন। যেহেতু বয়স থেমে থাকে না, জীবন প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ সময়ে সকল কর্ম-চাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে যায়, এবং বয়সের ভারে শরীরটা নুইয়ে পড়ে, সেহেতু ধীরে ধীরে অন্যের রোজগারের ওপর বৃদ্ধরা স্বাভাবিকভাবেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু সংসারে এই পর-নির্ভরশীল বয়স্ক ব্যক্তিদের মর্যাদার আসন আজ একবারেই নড়বড়ে হয়ে পড়ছে। সকলের কাছে তখন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা করুণার পাত্রে পরিণত হন। তাঁদের যে সেবা প্রয়োজন, সাহচর্য আবশ্যক তা অনেকেই ভেবে দেখে না । এর ফলে রোগশয্যায় মৃত্যু যন্ত্রণায় একাকী ছটফট করে হতাশা আর বেদনায় একসময় তাঁদের জীবনাবসান ঘটে।

গবেষণাধীন ইউনিয়নে বয়োবৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতা সম্পর্কিত দুটি ঘটনা অধ্যয়নের তথ্যবিবরণী

ঘটনা অধ্যয়ন ১

ফাগুয়ারদিয়ার ইউনিয়নের অন্তর্গত পাঁচুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা তামসি বেগম। বয়স ৮০ বছর। লেখাপড়া জানেন না বললেই চলে। ১ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে যাতায়াত করেছেন। শুধুমাত্র নামসই করতে পারেন।

বিধবা তামসি বেগমের ১টি কন্যা সন্তান রয়েছে। তাঁর পৈতৃক ভিটা ছিল দয়ারামপুর ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়ায়। তাঁরা চার বোন, দুই ভাই। পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। খাওয়া-পরাসহ মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার চিন্তা সর্বক্ষণ তাঁকে পীড়া দিত। অল্প বয়সেই এক দিনমজুর ছেলের সাথে তামসি বেগমের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর দিনমজুর স্বামী যৌতুকের লোভে আরো একটি বিয়ে করে। ঘরে সতীন এলে, সতীনের সাথে তামসি বেগমের বনিবনা না হওয়ায় সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। এক সময়ে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয় এবং তিনি বাপের বাড়ি চলে আসেন। তখন কোলে একটি কন্যা সন্তান। বাপের বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর আরেকজন বিপত্নীক দিনমজুরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিপত্নীক স্বামীর ঘরে আরেকটি কন্যা ছিল। স্বামীর পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণ ৮ বিঘা। কিন্তু তা নিজের দখলে ছিল না। তামসি বেগম গ্রামের এক ধনী লোকের বাড়িতে কাজ করে টাকা জমিয়ে করে জমিজমা পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করেন। স্থানীয় মাতব্বর ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহায্যে একসময় তিনি সেই জমিজমা উদ্ধার করেন। তারপর সেই জমিতে টিনের চাল ও মাটির দেয়ালবিশিষ্ট ছোট ছোট তিনটি ঘর তোলেন। স্বামী-স্ত্রী সারাদিন পরিশ্রম করে মেয়ে দুটির বিয়ের ব্যবস্থা করেন। স্বামীর ১ম পক্ষের মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় ৫ বিঘা জমি লিখে দেন। বাপের ভিটাতেই তারা ঘর করে বাস করতে থাকে। অবশিষ্ট তিন বিঘার মধ্যে দেড় বিঘা তামসি বেগমের মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেন। মেয়েদের বিয়ের কয়েকবছর পর স্বামী মারা যান। স্বামীর অসুখের সময় বড় জামাই এর কাছ থেকে কিছু অর্থ নিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তা শোধ দিতে না পারলে জামাই একরকম জোর করেই অবশিষ্ট দেড় বিঘা জমি নিজের নামে লিখিয়ে নেয়। এরপর শুরু হয় মানসিক নির্যাতন। যে ভিটা উদ্ধারের জন্য তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন সেই জমিতেই থাকলো না তাঁর অধিকার। নিজের সংসারে ঝিয়ের মতো খেটে দুবেলা দুটো ভাত খেতে পেতেন। এরপর তামসি বেগমের বয়স ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তাঁর কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়। সংসারে অকর্মণ্যভাবে বসে থাকা ছাড়া তার অন্য উপায় থাকে না। কর্মহীন জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। পরিশেষ তিনি তাঁর ঐ আশ্রয়টুকুও হারালেন। বড় জামাই তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। অসুস্থ অক্ষম তামসি বেগম উপায়ন্তর না দেখে ছোট মেয়ের কাছে আশ্রয় নেন। ছোট মেয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দিনমজুরি করে সংসার চালায়। তাদের একটি মাত্র পুত্র সন্তান, বয়স ৭ বৎসর। অভাবের সংসারে কেউই পেট ভরে খেতে পায় না। ফলে তামসি বেগম আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু অর্থের অভাবে মেয়ে-জামাই তাঁর চিকিৎসা করাতে পারেনি। তামসি বেগমকে রোগ শয্যায় ফেলে রেখে তাদের দুজনকেই জীবিকা নির্বাহের তাগিদে সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হয়। হাতের কাছে দুটো বাসি-পান্তা যা জুটে তাই রেখে তারা চলে যায়। তাঁকে দেখাশোনার মতো বাড়িতে আর কেউ থাকে না। ছোট মেয়ের ছেলেটা সারাদিন খেলে বেড়ায়। এ হেন পরিস্থিতিতে নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব তামসি বেগমের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এ ভাবেই তিনি হতাশা আর নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন।

ঘটনা অধ্যয়ন ২

দয়ারামপুর ইউনিয়নের নন্দিকুজা গ্রামের বাসিন্দা মালতী প্রভা সরকার। তাঁর বয়স ৭০ বছর, বিধবা। প্রাথমিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। মালতী প্রভার সন্তান-সন্ততি ৩টি। তিনটিই কন্যা। সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মালতী প্রভার স্বামী ছিলেন কৃষক। তাঁদের আবাদি জমি ছিল ১৩ বিঘা। কৃষিকাজ করেই সচ্ছলভাবে তাঁদের সংসার চলে যেতো। মেয়েরা গৃহকাজে তাদের মাকে সাহায্য করতো। অবসর মুহূর্তে কাঁথা সেলাই করে অথবা পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়িয়ে তাঁর সময় কাটতো। একদিন হঠাৎ তাঁর সুস্থ স্বামী স্বামী মারা যান। মালতী প্রভার ওপর সংসার পরিচালনার সব দায় এসে পড়লো । নিজে জায়গা জমি দেখাশোনা করতে পারেন না বিধায় সব বর্গা দিয়ে দেন। জমি থেকে যা পেতেন তা দিয়েই তাদের সংসার চলতো। এরপর মেয়েদের বিয়ের বয়স হলে তাদের বিয়ের ব্যয় নির্বাহ করতে মালতী প্রভা একে একে সব জমিই বিক্রি করে দেন। শুধু বসতভিটা সহ ১ বিঘা জমি তাঁর হাতে থাকে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মালতী প্রভা তাঁর স্বামীর সংসারে সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়েন। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে বসতভিটা সংলগ্ন জমিটুকু অন্যের কাছে বন্ধক রেখে যে অর্থ পান তা দিয়েই তাঁর একার ভরণ পোষণ চলে। এছাড়া বাড়িতে দু'একটি আম-কাঁঠালের গাছ আছে; বছরে তা থেকেও কিছু আয় হয়। কিন্তু ক্রমেই তাঁর বয়স বাড়তে থাকে। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ও

বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অন্যের হাতের রান্না খান না। হঠাৎ কোনোদিন অসুস্থ হলে সেদিন শুকনো খাবার, যেমন-মুড়ি-চিড়া খেয়ে দিন কাটিয়ে দেন। পাড়া প্রতিবেশী তাঁর বিপদে এগিয়ে এলেও তিনি তাঁদের স্পর্শ খুব একটা পছন্দ করেন না। রোগ শয্যায় যখন একাকী কষ্ট পান, জীবনটা যখন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তখন লোক মারফত মেয়েদের বাড়ি খবর পাঠান। মেয়ে, নাতি-নাতনিরা সময় সুযোগ পেলে এসে তাঁকে দেখাশোনা করে, কিন্তু তারাখুব বেশি দিন তার কাছে থাকতে পারে না । মালতী প্রভা ক্রমেই খুবই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। বার্ধক্য-জনিত কারণে চোখে ভাল দেখতে পান না। এছাড়া তিনি চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় তিনি ভাল চিকিৎসা করা অথবা পুষ্টিকর খাবার কিনে খেতে পারেন না। ফলে তিনি তাবিজ-কবচ, পানি পড়া ও কবিরাজি ইত্যাদি চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

বয়োবৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতা দূরীকরণে কতিপয় সুপারিশ

বয়োবৃদ্ধদের নিঃসঙ্গ জীবনকে অর্থবহ করে তোলা সর্বোপরি তাঁদের হতাশাগ্রস্ত জীবনে আশার আলো সঞ্চার করতে হলে অবশ্যই কিছু করণীয় রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কতক সুপারিশ প্রদত্ত হলো।

১. যৌথ পরিবার ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। যেসব কারণে তথা শিল্পায়ন-শহরায়ন, উন্নত জীবনের মোহ, আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা ইত্যাদির ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে সেসব প্রতিরোধ করতে হলে গ্রামাঞ্চলে শহরের ন্যায় ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি ও ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং এগুলোর মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এতে পরিবারের সদস্যদের অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর গমন এবং অভিগমনের প্রবণতা হ্রাস পাবে। বৃদ্ধদের জীবনে তখন ছেলে-মেয়ে এবং নাতি-নাতনির থেকে দূরে থাকাজনিত কারণে তাঁদের সুখের সংসারে নিঃসঙ্গতা নেমে আসবে না।

২. সন্তান-সন্ততির নিরন্তর অবজ্ঞা, অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বয়োবৃদ্ধদের জীবনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে। এ ধরনের দুর্বিষহ জীবন যাপন করার সামান্যতম ইচ্ছা তখন আর থাকে না। তাঁরা অনেক সময়ে আত্মহত্যা করতে প্রবৃত্ত হন। যে পিতা-মাতা তাঁদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তান-সন্ততিকে বড় করে তুলেছেন সেই পিতা-মাতার হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতাকে দূর করে জীবন সম্পর্কে তাঁদের মনে আশার সঞ্চার করার দায়িত্ব তাঁদের সন্তান-সন্ততিকেই বহন করতে হবে। শিশুরা যাতে শৈশব থেকেই বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে শিখে তার জন্য যথার্থ সামাজিকীকরণ প্রয়োজন।

৩. বয়োবৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতা দূরীকরণের জন্য গ্রাম পর্যায়ে 'বয়স্ক ক্লাব' গঠন করা যেতে পারে, যেখানে গ্রামীণ প্রবীণরা এসে তাঁদের অবসর সময় কাটাতে পারেন। এ ধরনের বৃদ্ধদের উপযোগী আন্তঃক্রীড়া এবং টেলিভিশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে অবসর সময়ে তাঁদের চিত্তবিনোদন সম্ভব হয়।

৪. সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনি, সঙ্গী-সাথী বিচ্ছিন্ন বৃদ্ধদের জীবনে বৈচিত্র্য আনয়নে পাড়ার শিক্ষিত যুবকরা এগিয়ে আসতে পারে। তারা গ্রামে মাঝে মাঝে জারিগান, পালাগান, নাটক, থিয়েটার ইত্যাদির আয়োজন করতে পারে। এর ফলে বৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতাবোধ কিছুটা হ্রাস পেতে পারে।

৫. অনেক সময়ে দেখা গেছে, ছেলে-মেয়েরা চাকরি, ব্যবসা, আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা কিংবা অন্য কোনো কারণে বৃদ্ধ-বাবা-মার কাছে থাকতে পারে না। ফলে বৃদ্ধ পিতা-মাতা নিঃসঙ্গতা ও হতাশায় ভোগেন। রোগ শয্যায় একাকী কষ্ট পান। ছেলেরা অনেক সময়ে ইচ্ছা করেই দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, যা বৃদ্ধদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থা থেকে বৃদ্ধদের রক্ষা করতে হলে কোরিয়ার মতো বাংলাদেশেও সন্তানোচিত কর্তব্য পালনের পুরস্কার (Filial Piety

Award) প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে (Connell, 1994:46)। এই ব্যবস্থায় পিতা-মাতাকে দেখাশুনা এবং উত্তম সেবা প্রদানের জন্য নির্বাচিত কিছু সন্তান-সন্ততিকে পুরস্কৃত করা হয়। এতে বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সন্তান-সন্ততির দায়িত্ববোধ ও সেবার নিশ্চয়তা বাড়বে।

৬. অনেকেই মনে করেন বার্ধক্য মানেই অখণ্ড অবসর, অলস বসে থাকা, পরপারের চিন্তা করা, যা ক্রমেই বৃদ্ধদের জীবনকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। এই অবস্থার হাত থেকে তাঁদেরকে রক্ষা, তাঁদের জীবনে গতিশীলতা এবং কর্ম-চাঞ্চল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁদের মেধা ও দৈহিক সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষিত বৃদ্ধদের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে নিয়োজিত করে জাতীয় উন্নয়নে প্রবীণদের অংশগ্রহণকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

৭. গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন এলাকায় বেকার যুবকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্লাব ও সংঘ-সমিতি গড়ে ওঠে। এ ধরনের ক্লাবে গল্প-গুজব করে, তাস খেলে, কেরাম খেলে তারা তাদের অবসর সময় কাটিয়ে থাকে। এই সমস্ত বেকার যুবকদের এসব সংগঠন নিঃসঙ্গ বয়োবৃদ্ধদের কল্যাণে এগিয়ে আসতে পারে। যুবকরা বৃদ্ধদের সাথে বসে তাঁদের অতীত ও বর্তমান জীবনের গল্প শোনা, অসুস্থতায় সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, একই খবরের কাগজ পড়ে দেশ-বিদেশের কথা শোনাতে পারে। এতে করে স্বল্প সর্ময়ের জন্য হলেও বয়স্কদের নিঃসঙ্গতা দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায়।

৮. বাংলাদেশে প্রবীণদের সেবা ও কল্যাণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বড় বড় শহরে বিভিন্ন ধরনের আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এসব নিতান্তই অপ্রতুল । প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বৃদ্ধরা এসবের সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছেন। যদি বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে এ ধরনের ছোট ছোট বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন করা যায় তাহলে নিঃসঙ্গ বয়োবৃদ্ধ, যাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন কেউই দেখে না, তাঁদরকে এসব বৃদ্ধাশ্রমে রাখা যেতে পারে। এতে তাঁরা সেখানে তাঁদের সমবয়সীদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাবেন। তাঁরা তখন পরস্পর গল্প-গুজব করে, সুখ-দুঃখের কথা বলে মনের দুঃখ দূর করতে পারবেন। এমন কি, একজন আরেকজনের অসুস্থতায় এগিয়ে আসতে পারবেন, সেবা করতে পারবেন। এভাবেও তাঁদের নিঃসঙ্গ জীবনকে অর্থবহ করে তোলা সম্ভব।

৯. গবেষণাধীন এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিপত্নীকের তুলনায় বিধবার সংখ্যা বেশি। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় গ্রামে মেয়েদের বিবাহ সাধারণত অল্প বয়সেই হয়ে থাকে। ফলে স্বামীরাই বার্ধক্যজনিত কারণে আগে মারা যান। সেজন্য বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব ঘোচাতে হলে বিবাহের সময়ে বয়সটার বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ স্বামীর সাথে স্ত্রীর বয়সের বিস্তর ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে।

উপসংহার

সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে পরিবার, সমাজ তথা ব্যক্তি জীবনেও এসেছে বিরাট পরিবর্তন। পুরাতন রীতি-নীতি সংস্কার ত্যাগ করে মানুষ নতুনকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। উন্নতির শিখরে ওঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই টানা-পোড়েনের ফলে প্রবীণ জীবনে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বৃদ্ধরা হারিয়ে ফেলেছেন তাঁদের পুরনো মর্যাদা ও সম্মান। আজ তাঁরা নিজের বাড়িতেই পরবাসীর মতো জীবন যাপন করছেন। সন্তান-সন্ততির তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য তাঁদরকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ছেলেমেয়েদের কাছে করে ফেলেছে। তাদের কাছে তাঁরা এখন বোঝা। নিতান্ত দায়ে

পড়ে ছেলেরা বৃদ্ধ-বাবা-মাকে দেখছে। এর মধ্যে কোনো রকম স্নেহ, ভালবাসা নেই। নাতি, নাতনি, ছেলে কিংবা ছেলের বউ তাদের কাছে বসে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে না, বৃদ্ধ বাবা-মাকে স্নেহ ভরে স্পর্শ করে না । একদিন যে বাবা-মা পরম স্নেহে লালিত-পালিত করেছেন তাঁদের সন্তানদের, সেই সন্তানই আজ তাঁদের কাছে আর আগের মতো আপন নয়। ফলে দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জরিত, রোগে-শোকে মুহ্যমান বয়োবৃদ্ধরা একান্ত নিজের মধ্যেই আপন দুঃখ-কষ্ট লুকিয়ে রাখেন। সঙ্গী-সাথী বিহীন নিঃসঙ্গ জীবনে হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতা ছাড়া তাদের আর কিছুই থাকে না। কিন্তু আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে খুব সহজেই প্রবীণ জীবনের এ সকল সমস্যা থেকে তাঁদেরকে মুক্ত রাখতে পারি। যাঁদের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে আজ আমরা নিজেদের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারছি, সেই পিতা-মাতাকে সম্মান-শ্রদ্ধা করা, তাঁদের জ্ঞান-গরিমার কাছে মাথা নত করা, সর্বোপরি তাঁদের সার্বক্ষণিক পরিচর্যা করা ও সেবাদানের মানসিকতা নিয়ে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। এখন বৃদ্ধদের বিরক্তিকর জীবনকে হাসি আর আনন্দে ভরে দিতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে ।

গ্রন্থপঞ্জি

আফরোজ, রোমানা (১৯৯৯-২০০০) "আমার প্রবীণ নানু ঃ একজন-প্রতিজন", *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, বর্ষ-৩৭, সংখ্যা ১ম ও ২য় ।

চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল (১৯৯৪)। *ভারতবর্ষে বৃদ্ধ বয়সের সমস্যা*, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলিকাতা ।

ট্রেনিং ম্যানুয়াল (১৯৯৮)। *বাংলাদেশের প্রবীণদের সামাজিক অবস্থা*, প্রবীণহিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

মহাপাত্র, অনাদিকুমার (১৯৯৬)। *বিষয় সমাজতত্ত্ব*, কলিকাতা ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন।

রায়, শর্ম্মিষ্ঠা (২০০২)। "বয়োবৃদ্ধদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার কতিপয় দিক এবং উত্তরণের উপায়," *সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল*, সপ্তম সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শহিদ, ফরিদা (১৯৯৬)। "প্রবীণদের বিনোদন", *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, ৩৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন।

হোসেন, তোফাজ্জাল (১৯৮৮)। *জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও আগামী -পৃথিবী*, ঢাকা, বই মঞ্চ।

Aziz, K.M and C. Malaoney (1985), *Life Stages Gender and Fertility in Bangladesh*, Dhaka, International Centre for Diarrhoeal Disease Research.

Connell, O. Helen (1994), *Woman and the Family*. London and Newjersey:Zed books Ltd.

Dermerath, N.J. III And Marwell, Gerald (1976), *Sociology: Perspectives and Applications*, New York: Harper and Row.

Mcintosh, J.L (1986). "Suicide Among the Elderly: Levels and Trends". *In*: *Social Work with the Aging*. Carol H. Meyer (Ed.). National Association of Social workers. Silver spring, Maryland. U.S.A.

Sattar. M.A and Rahaman, Mujibur (1992) "*Elderly in Bangldesh 1911-2025*". Projected Report. Department of Statistics. Rajshahi University.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

খুলনা নগরায়ণের বিকাশে ভূমি সমস্যার প্রকৃতি

শেখ মোঃ মুরছালীন মামুন*

Abstract: The problems of land for urbanisation are more or less samefor major cities in Bangladesh. But in Khulna, there exists additional aspects of the problems. Specially, linear and narrow natural levees of the river Rupsha and Bhairab, salinity, organic pit soil and physically linear structure of the city are the physical and environmental problems of the land for urbanisation. Beside these, other problems are increasing population, land-use conflict, poor institutional coordination, unplanned development by land developers, shortage of buildable high land, high land price, high development cost, absence of urban land ceiling, unequal distribution of land and urban crime. On the basis of the documentary analysis, interview and intensive observation, the article presents the discussion on aforesaid problems and their nature as well as some suggestions are put forward for the future planning and development.

ভূমিকা

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা স্বল্পতম ভূমি-মানব অনুপাতের দেশে নগর বিকাশে ভূমি সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হবে, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের মহানগরসমূহের বিকাশে ভূমিসংক্রান্ত সমস্যাবলি প্রায় এক এবং অভিন্ন হলেও, খুলনা মহানগরীর জন্য এ বিষয়টি বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। একটি মহানগর বিকাশের অনেকগুলো নিয়ামক রয়েছে, যেমন (অর্থনৈতিক ভিত্তি, ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা, শিল্পায়নের মাত্রা, উচ্চতর ভৌত ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, উন্নত যোগাযোগ ও ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থান, উচ্চতর প্রশাসনিক কেন্দ্র, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পর্যটন ও তীর্থস্থান, শহরমুখী অভিগমন, নির্মল পরিবেশ ও জলবায়ু ইত্যাদি। এই সকল নিয়ামকের মান যত উন্নত হবে, নগরায়ণের বিকাশ তত বেশি হবে এবং তাদের প্রভাব সরাসরি ভূমির উপর পড়বে। খুলনা শহরটি ব্রিটিশ আমল থেকেই বিকাশমান। সম্প্রতি চিংড়ি শিল্পের বিকাশ এবং কিছু বড় বড় বিনিয়োগ/প্রকল্প যেমন (খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, নির্মাণাধীন রূপসা সেতু নগরায়ণকে গতিশীলতা দিয়েছে। শহরের উত্তর প্রান্তে নওয়াপাড়ার শিল্প ও ব্যবসা এবং দক্ষিণে মংলা বন্দর ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বিকাশমান। এছাড়াও পরিকল্পনাধীন রয়েছে বিমান বন্দর ও সুন্দরবনের পর্যটন প্রকল্পসমূহ। এই সকল অবকাঠামো খুলনার বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে এবং ভূমির উপর চাপ বাড়াবে।

* সহকারী অধ্যাপক, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ।

এই প্রবন্ধে খুলনা শহর/নগর বলতে খুলনা সিটি কর্পোরেশন (খুসিক) এলাকাকে বোঝানো হয়েছে। যার আয়তন ৪৫.৬৫ বর্গ কিলোমিটার এবং ২০০০ সনে জনসংখ্যা ৮,৫৯,৯০৬ জন।[১] খুলনা বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। যার অবস্থান দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (মানচিত্র ১ দ্রষ্টব্য)।

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য খুলনা মহানগরীর বিকাশে ভূমি সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ। প্রবন্ধে নিবিড় পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গৌণ তথ্যাদির দালিলিক বিশ্লেষণ করে নগরীর ভূমি সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জুলাই ২০০১ থেকে জুন ২০০৩ পর্যন্ত সময়ে মাঠ পর্যায়ে সরজমিনে বিভিন্ন স্থান পর্যবেক্ষণ, বিশেষ করে বিকাশমান (semibuilt-up area, মানচিত্র ২ দ্র.) এলাকাসমূহে একাধিকবার পরিদর্শন; খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা শাখায় কর্মরত পরিকল্পনাবিদগণের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকার ও আলোচনা; এবং খুলনা শহরে আবাসিক প্রকল্পের জন্য জমি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ৬টি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের সাথেও সাক্ষাৎ করা হয়েছে। অতঃপর প্রাপ্ত ফলাফল ও নগরের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ভূমিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রবন্ধে খুলনা মহানগরীর বিকাশে ভূমিসংক্রান্ত সমস্যাবলি দুই ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে : (১) ভৌত ও পরিবেশগত যেমন (ভূমিরূপের প্রভাব ও নদী অববাহিকার বিশেষ স্বাতন্ত্র্য, জৈবিক পিট মাটি, লবণাক্ততা, শহরের কাঠামোগত আকার-আকৃতি, এবং (২) আর্থ-সামাজিক ও বিবিধ বিষয়াবলি যেমন: জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যা, প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াবলি, জমির উপর মালিকানা, নগর অপরাধ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি।

খুলনা শহরের গোড়াপত্তন, বিকাশ ও ভূমি নির্বাচন প্রাধিকার

১৮৩৬ সালে নয়াবাদে খুলনা থানা স্থাপিত হয়। ১৮৪২ সালে থানাটি মহকুমায় উন্নীত হয়। ১৮৮২ সালে যশোর জেলার খুলনা ও বাগেরহাট, এবং ২৪ পরগনা জেলার সাতক্ষীরা, কালীগঞ্জ ও বসন্তপুর এলাকাসহ মোট ৪৬৩০ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট খুলনা জেলা আত্মপ্রকাশ করে।[২] খুলনা শহর ১৮৮৪ সালে পৌরসভায় উন্নীত হয়। ১৮৮৫ সালে কলকাতা-যশোর রেললাইন খুলনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। উল্লেখ যে, খুলনা শহরের গোড়া পত্তন নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তা সত্ত্বেও এটা ঠিক যে, খুলনার বিকাশ ত্বরান্বিত হয় প্রশাসনিক দপ্তর স্থাপন ও নৌবন্দর/বাজারের কারণেই।[৩] খুলনা শহরের পুরাতন মানচিত্রসমূহ পর্যালোচনা, ব্রিটিশ আমলের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ইমারতসমূহের (জেলা জর্জকোর্ট, কালেক্টরের বিল্ডিং, সার্কিট হাউস, জেলা কারাগার, নগরভবন ইত্যাদি) অবস্থান এবং ভূমির উচ্চতা বিষয়ক (terrain elevation) মানচিত্র বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, সর্বাপেক্ষা উঁচু জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শহরের গোড়াপত্তন তথা প্রশাসনিক নগর স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হয় (মানচিত্র ২ ও ৩ দ্র.)। বড়বাজার এলাকার পুরাতন ইমারতসমূহ একই সাক্ষ্য বহন করে, যা সন্নিহিত উঁচু ভূমিতেই অবস্থিত।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশসমূহের পরামর্শে ও সহায়তায় প্ররোচিত উন্নয়ন কৌশলসমূহের (শিল্পায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ ও

---

[১] Aqua-Sheltech Consortium, *Structure Plan, Master Plan and Detail Area Plan*, Vol. II, *Structure Plan* (Khulna : Khulna Development Authority, 2001), pp. 7, 42.

[২] Aqua-Sheltech Consortium, *Structure Plan, Master Plan and Detail Area Plan*, Vol. I, *Urban Strategy* (Khulna : Khulna Development Authority, 2001), p. 25.

[৩] *Ibid.*

আঞ্চলিক উন্নয়ন কেন্দ্র ইত্যাদি) প্রয়োগ ও বিস্তার ঘটে।[৪] এর ফলে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ন্যায়, খুলনাতেও ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে শিল্প-কলকারখানা স্থাপিত হতে থাকে। এতে শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য আরো বিকশিত হয়। লক্ষণীয় যে, খুলনা শহর তখন পরবর্তী ফাঁকা উঁচুস্থান খালিশপুর ও দৌলতপুর এলাকায় বিকাশ লাভ করছিলো (মানচিত্র ২ দ্র.)। উল্লেখ্য যে, বার্জারের এককেন্দ্রিক বলয়াকার ধারণা (Concentric Zone Concept), হোমার হোয়েটের বৃত্তকলা ধারণা (Sector Concept) এবং ম্যাকেনজি, হ্যারিস ও উলম্যানের বহুকেন্দ্রিক ধারণা (Multiple Nuclei Concept) বিষয়ক (চিত্র/ডায়াগ্রামসমূহের সাথে খুলনা শহরের বিকাশের ক্ষেত্রে তেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না (মানচিত্র ৫ দ্র.)। কেননা খুলনার চারদিকে নগর সম্প্রসারণ উপযোগী ভূমির স্বল্পতা রয়েছে। প্রাকৃতিক কারণে লম্বালম্বি উঁচু ভূমি বরাবর উন্নত যোগাযোগ থাকায় শহর সরল রৈখিকভাবে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে (মানচিত্র ২ ও ৩ দ্র.)। শহর বিকাশের এরূপ প্রবণতা এবং ভূমির সমস্যাবলি নিম্নে ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করা হলো।

ভৌত ও পরিবেশগত সমস্যাসমূহ

- ***ভৈরব-রূপসা নদীর ঢাল ও তীরবর্তী ভূমিরূপের প্রভাব***

সাধারণত গাঙ্গেয় পলল ভূমি অববাহিকায় নদী তীরবর্তী স্থানসমূহ নদীর দিকে ক্রমাগত ঢালু এবং নদী থেকে বাইরের দুই দিকে ক্রমাগত ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে থাকে। কিন্তু ভৈরব ও রূপসা নদীর জন্য এটা প্রকৃতিগতভাবেই বিপরীত। এদের দুই তীরবর্তী স্থানসমূহ উঁচু, যা ক্রমাগত বাইরের দুই দিকে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে বিভিন্ন নিম্নভূমি বা জলাভূমি যেমন (বিল পাবলা, বিল ডাকাতিয়া প্রভৃতির সাথে মিশেছে (মানচিত্র ৩ ও ৪ দ্র.)। ভৈরব ও রূপসা নদী তীরবর্তী স্থানসমূহের উচ্চতা গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৭ থেকে ১৪ ফুট এবং নদী থেকে ক্রমাগত দূরবর্তী দুই পাশের পলল ভূমির গড় উচ্চতা ৪ থেকে ৫ ফুট। উঁচু ভূভাগের বিস্তার নদীর মাঝ রেখা থেকে পূর্বে ও পশ্চিমে ০.৫ কিলোমিটার থেকে ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।[৫] তাই এরূপ সংকীর্ণ ভূভাগ নগরায়ণের অন্তরায়।

ভৈরব ও রূপসার পূর্ব তীরে এবং দক্ষিণে কিছু উঁচু জমি থাকলেও নদীর খরস্রোত ও তেজি জোয়ারভাটার কারণে শহরের ভূমিভিত্তিক স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। নদী দুটি পূর্বের ও দক্ষিণের শহরতলীকে মূল শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

- ***জৈবিক পিট-মাটি***[৬]

নগরের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিল ডাকাতিয়া ও বিল পাবলা সন্নিহিত এলাকার বিস্তীর্ণ ভূমি থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত নিচু। যা ইমারত নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয় বরং ব্যয়বহুল।[৭] কেননা এই

---

[৪] সিদ্দিকুর রহমান ওসমানী, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যমোচন : এদের সম্পর্কের স্বরূপ নিয়ে কিছু ভাবনা", অন্তর্গত রুশিদান ইসলাম রহমান, *দারিদ্র্য ও উন্নয়ন* (ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৭), পৃ. ১৪-১৭।

[৫] Aqua-Sheltech Consortium. *op.cit.*, Vol. I, p. 27.

[৬] পিট-মাটি কালচে রঙের গাছের গুঁড়ি/কাঠ কয়লাসহ জৈবিক উপাদান সমৃদ্ধ এক প্রকার মাটি। উল্লেখ্য যে, খুলনা এলাকার প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে (দিলিপ দত্ত, সহযোগী অধ্যাপক, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে) সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিলো। কালের আবর্তে প্রাকৃতিক কারণে ঐ বন এলাকা ধ্বংস ও ভূ-নিম্নে চলে যায় এবং তার উপর প্লাবন ভূমি স্তর জমে বর্তমান মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। আরো উল্লেখ্য যে, ঐ ভূ-নিম্নস্থ কালচে মাটি থেকে বাছাইকৃত কাঠ-কয়লা সমৃদ্ধ অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর জন্য স্থানীয়ভাবে ঐ মাটিকে পিট-মাটি বলা হয়।

[৭] মোঃ মোস্তফা সরওয়ার, মাহামুদুল হাসান ও মোঃ গোলাম মরতুজা, "খুলনা মহানগরীর উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা : একটি পর্যালোচনা", *ভূগোল পত্রিকা*, সংখ্যা ১৭, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১০।

সকল স্থানে পিট-মাটি রয়েছে। এতে ভূনিম্নস্থ জৈবিক উপাদান বেশি। গঠন, সংযুক্তি, বুনন ও প্রকৃতি বিচারে এর ভার বহন ক্ষমতা খুবই কম।

লবণাক্ততা

খুলনায় অবস্থান সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় জোয়ারভাটার চলমান প্রক্রিয়ার কারণে ও শুষ্ক মৌসুমে উজানের নদীসমূহে পানি প্রবাহ কম হওয়ায় খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততার মাত্রা বাড়ছে।[৮] খুলনার ইমারতে লবণাক্ততার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যাকে স্থানীয়ভাবে 'লোনা ধরা' বলা হয়। লবণাক্ত স্থানের নির্মাণ-কৌশলে ভিন্নতার কারণে তা ব্যয়বহুল এবং বাড়তি পরিচর্যা/রক্ষণাবেক্ষণের দরকার হয়। যা ইমারত নির্মাণ তথা নগরায়ণকে প্রভাবিত ও বাধাগ্রস্ত করে।

কাঠামোগত আকার আকৃতি

খুলনা শহর নদী ও নদীর তীরের উঁচু জমির উপর ভিত্তি করে এবং পরবর্তীতে এদেরই সমান্তরাল রাস্তা ও রেললাইন ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত। শহরের আকৃতি লম্বা হওয়ায় ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যয় তুলনামূলক বেশি। তাছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নগরকেন্দ্রের দ্বারা সকল স্তরে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা অসুবিধাজনক। আর সেই সাথে লম্বা হওয়ার কারণেও একাধিক উপকেন্দ্রের উপযোগিতা রয়েছে। বর্তমানে খুলনা উত্তরে মহেশ্বরপাশা, শিরোমণি ও নওয়াপাড়ার দিকে বাড়ছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে খুলনা-সাতক্ষীরা সড়ক ও খুলনা-বঠিয়াঘাটা-চালনা সড়ক, এবং দক্ষিণ-পূর্বে খুলনা-রূপসা-সড়ক বরাবর সম্প্রসারিত হচ্ছে। দক্ষিণ প্রান্তে আড়াআড়িভাবে রূপসা সেতুর বাইপাস সড়ক ধরে বসতি উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এর ফলে দক্ষিণাংশের কিছুটা গোলাকার এবং উত্তরের লম্বা অংশ মিলিয়ে একত্রে বেলুনাকৃতির রূপ নিতে পারে, এমনটা ধারণা করছেন খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নগর পরিকল্পনাবিদগণ।

আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যাসমূহ

জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত চাপ ও নগরায়ণ

১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ সময়ে খুলনা শহর প্রতি বছর প্রায় ২৯,০০০ জন হারে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ সহ্য করছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।[৯]. ১৯৯৮ সালের হিসাবে খুলনার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৮,৪২৪ জন।[১০]

খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও মেট্রোপলিটন[১১] এলাকার লোকসংখ্যার বিবরণ পরবর্তী সারণিতে প্রদান করা হলো:

---

[৮] আশরাফ মাহমুদ দেওয়ান ও খন্দকার নিজামুদ্দিন, "বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ : একটি ভৌগোলিক বিশ্লেষণ", *ভূগোল পত্রিকা*, সংখ্যা ১৭, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৯-৫৩।

[৯] Aqua-Sheltech Consortium. *op.cit.*, Vol. I, p. 16.

[১০] মোঃ মোস্তফা সরওয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।

[১১] Khulna Statistical Metropolitan Area (SMA) consist of Khulna City Corporation and whole of Rupsha and Dighalia Thanas/Upazilas [Cited from(Nazrul Islam, *Urbanization, Urban Planning and Development and Urban Governance: A Reader for Students* (Dhaka : Centre for Urban Studies, 2001), p. 231.

সারণি ১

খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও মেট্রোপলিটন এলাকার লোকসংখ্যা

সাল	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকা
১৯৬১	৮০২২০	১২৭৯৯০
১৯৭৪	৪৩৭৩০০	৪৬৭৯৬০
১৯৮১	৫৬১৯৬০	৬৫২০০০
১৯৯১	৬৬৩৩৪০	৯২১৩৬০
১৯৯৮	৮৪৭৫৮০	১১৭৭১৬০
২০২০ (প্রাক্কলিত)	২০৫৩৪৭৩	৩২৫৮০২৭

উৎস : মোঃ মোস্তফা সরওয়ার, মাহামুদুল হাসান ও মোঃ গোলাম মরতুজা, "খুলনা মহানগরীর উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা : একটি পর্যালোচনা", *ভূগোল পত্রিকা*, সংখ্যা ১৭, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৮।

এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা খুলনার ভূমি যোগান তথা ভূমি ব্যবহারের উপর চাপ ফেলছে। বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে কৃষি, কৃষি উপখাত ও নগরায়ণের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। কেননা খুলনাকে ঘিরে আছে উচ্চ ও অমিত সম্ভাবনাময় কৃষি ও কৃষি খাতসমূহ। কৃষিতে মোট জাতীয় মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বৃহত্তর খুলনা জেলার অবস্থান ৪র্থ। দেশে জেলাভিত্তিক আবাদি জমি পরিমাণের ক্রম অনুযায়ী খুলনা জেলার অবস্থান ৬ষ্ঠ। বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি পণ্য চিংড়ি। দেশের মোট চিংড়ি চাষ এলাকার ৭৪ ভাগ জমি বৃহত্তর খুলনায় অবস্থিত এবং এখান থেকেই মোট উৎপাদনের ৮২ ভাগ উৎপন্ন হয়। কৃষির মোট জাতীয় মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে খুলনা জেলার বন উপখাতটি ২য় অবস্থানে রয়েছে।[১২] কাজেই নগরায়ণের বিকাশ অনুভূমিক বরাবর চলতে থাকলে বিভিন্ন খাত ও উপখাতের ভূমি সঙ্কুচিত হবে। এর ফলে ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব অনিবার্য। শুধু শহরের বহির্মুখী বিকাশে নয়, এমনকি খুলনা শহরের অভ্যন্তরেও ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ বিদ্যমান। খুলনা মহানগরীর ভূমির অধিক্রম ও অনুক্রম প্রক্রিয়া (invasion and succession) এখনও সম্পন্ন হয়নি।[১৩] তাই ভূমি ব্যবহার ধরন সর্বদা পরিবর্তনশীল। এই ব্যবহারিক পরিবর্তন নগরের প্রান্তদেশে অনুভূমিক বিকাশে (মানচিত্র ২ দ্র.) এবং নগরকেন্দ্রে বহুতল ভবনের মাধ্যমে লম্বিক বিকাশে লক্ষণীয়। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ভূমির উচ্চ মূল্যই দায়ী। তাছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভূ-প্রাকৃতিক এবং পরিকল্পনার ধারা ইত্যাদি বিভিন্ন নিয়ামকের জটিল সম্পর্কের জন্যই ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন তথা বিরোধ বা দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

- ***সমন্বয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাবলি***

খুলনা শহর বিকাশের পর থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে যায়।[১৪] পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে খুলনা মহানগরীর মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়। শহর এলাকায় সকল প্রকার ভূমি ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র এবং কোনো ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেও ছাড়পত্রের বিধান রয়েছে। কিন্তু আইন থাকলেও বাস্তব প্রয়োগ হয় না। কেননা দাপ্তরিক কাজে দীর্ঘসূত্রিতা, জনসাধারণের অসচেতনতা এবং অনীহাসহ বহুবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার বিঘ্নিত হচ্ছে।[১৫] ফলে পরিকল্পিত নগরায়ণ ও তার বিকাশ সমস্যাসঙ্কুল।

---

[১২] Bangladesh Bureau of Statistics, *Statistical Yearbook of Bangladesh 1995* (Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, 1995), pp. 93-206.

[১৩] Aqua-Sheltech Consortium, *op.cit.*, Vol. II, p. 63.

[১৪] মোঃ মোস্তফা সরওয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।

[১৫] *তদেব*, পৃ. ৯।

পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার ও নগরায়ণের জন্য খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন (খুসিক) মূলত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক) সরাসরি ভূমি সংক্রান্ত পরিকল্পনা, প্রধান প্রধান অবকাঠামো তৈরি এবং নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু খুউক বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পরিকল্পিত এলাকা যেমন: খালিশপুর, সোনাডাঙ্গা, নিরালা, মুজগুন্নি আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা এবং কিছু কিছু অবকাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ছাড়া তেমন কিছু করতে পারছে না। বস্তুত খুউক শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তদের জন্য কিছু ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েছে এবং তা হস্তান্তর করেছে। অথচ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের ভূমিতে প্রবেশ সুবিধা বা নিশ্চিত আবাসন সুবিধা পাচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৮৮ একর ব্যাপী ৫৪টি বস্তিতে ৫৪,০০০ লোক বাস করছে।[১৬] ১৯৯৮ সালেই খুলনায় বস্তি বাসীর সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।[১৭] বস্তিগুলো ফাঁকা জমি, রেললাইন, রাস্তা, বাঁধ, ড্রেন ও খালের কিনারায় পতিত জমিতে গড়ে উঠছে। যদিও খুউক বর্তমান মহাপরিকল্পনার আওতায় ক্ষুদ্র-পুঙ্খানুপুঙ্খ এলাকা পরিকল্পনার মাধ্যমে নিম্নবিত্তদের জন্য একটি আবাসিক প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমি বণ্টনের উদ্যোগ নিয়েছে। খুলনা শহরের কাঠামোগত পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুসারে খুলনা নগরবাসীর উন্নয়ন ও সেবা প্রদানে প্রায় ৩৩ প্রকার প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত।[১৮] এদের সকলের কার্যক্রম এবং নগরের সকল অবয়বই ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানেই নিজ নিজ আলাদা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া রয়েছে। ফলে সমন্বয় সমস্যা প্রকটভাবে দেখা যায় এবং ভূমি ব্যবহারে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

- *বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রণহীন ভূমির ব্যবহার*

দায়িত্বপ্রাপ্ত ঐ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতার কারণেই খুলনা শহরে অপরিকল্পিতভাবে আবাসন ব্যবস্থা প্রদান করা হচ্ছে। নিম্নের সারণিতে আবাসন বণ্টন ব্যবস্থা দেখানো হলো।

সারণি ২

খুলনা মহানগরীর আবাসন বণ্টন ব্যবস্থা

ভূমি উন্নয়নকারী	জমি (%)
ব্যক্তিগত বা বেসরকারি আবাসন উন্নয়নকারী	৯০%
সরকারি আবাসন	১.৫%
উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আবাসন	৪%
স্কোয়ার্টার	৪%
অন্যান্য (ভাসমান)	০.৫%
সর্বমোট	১০০%

উৎস :Aqua-Sheltech Consortium, *Structure Plan, Master Plan and Detail Area Plan*, vol. 2, *Structure Plan* (Khulna : Khulna Development Authority, 2001), p. 71.

ব্যক্তিগত আবাসন উন্নয়নকারীরা ইচ্ছামাফিক, অপরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ভূমি ব্যবহার করে যাচ্ছে। যা সুষ্ঠু নগরায়ণের বিকাশে অন্তরায়। খুউকের সীমিত জনবল দিয়ে অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ। শহরের ৯০ ভাগ আবাসন প্রদানের মাধ্যমে, ব্যক্তিগত/বেসরকারি আবাসন উন্নয়নকারীরাই গৃহায়ন খাত তথা ভূমি বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে।

- *ভূমি মালিকানা, ভূমি বাজার এবং সর্বোচ্চ ভূমি সীমা আইন*

---

[১৬] তদেব, পৃ. ১০।

[১৭] তদেব, পৃ. ৮।

[১৮] Aqua-Sheltech Consortium, *op.cit.*, Vol. II, p. 16.

সর্বসাধারণ সুলভে সুপরিকল্পিত নগরায়ণের আওতায় বাসযোগ্য নিষ্কণ্টক জমি পাচ্ছে না। খুউকের নগর পরিকল্পনাবিদদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, খুলনার শতকরা ১৫ ভাগ মালিক আবাসিক জমির শতকরা ৩৫ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে। যেখানে ঢাকায় ৩০ ভাগ মালিকের কাছেই আবাসিক জমির ৮০ ভাগ এবং পক্ষান্তরে বাকি ৭০ ভাগ মালিকের নিয়ন্ত্রণে আছে শুধুমাত্র ২০ ভাগ জমি।[১৯]

খুলনা শহরের শহরতলী এলাকায় নিচু জমি কাঠা প্রতি কেনা বেচা হচ্ছে ৫০/৬০ হাজার টাকায়। অন্যদিকে শহরের ভিতরে যেখানে কিছু কিছু ঘরবাড়ি নির্মাণ হয়েছে (semibuilt-up area) সেখানে জমি কাঠা প্রতি ২ লক্ষ থেকে ২.৫০ লক্ষ বা অবস্থান ভেদে তার চেয়েও বেশি। এই উচ্চদাম সর্বসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে। কিন্তু খুউকও পারছে না কোনো এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে এনে পরিকল্পিতভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্লট আকারে বণ্টন করতে। কেননা তুলনামূলক ফাঁকা স্থানে খুউকের গড় পড়তা প্লট তৈরি করতে কাঠা প্রতি প্রায় ২.৫ থেকে ৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায়। সর্বোপরি শহর এলাকার মধ্যে অধিগ্রহণ করার মতো জমি নেই। বিচ্ছিন্নভাবে অল্প কিছু জমি থাকলেও পুনর্বাসনসহ উন্নয়ন ব্যয়বহুল হবে এবং পরিকল্পনার দৃষ্টিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। তাছাড়া জনগণও উন্নয়নের জন্য খুউককে জমি দিতে চাচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ খুউকের নিকট আবাসনের জন্য আবেদন করে। কিন্তু জমি স্বল্পতার কারণে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় সন্নিহিত গ্রামীণ এলাকাতেও কোনো প্রকার ব্যবস্থা করা যায়নি।[২০]

একদিকে জমির উচ্চ মূল্য এবং অন্যদিকে কতিপয় সীমিত লোকের ক্রয়ক্ষমতা থাকার কারণে ক্রমে ক্রমে খুলনার জমি সমাজের একটা মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর নিকট চলে যাচ্ছে। এই প্রবণতা সিটি কর্পোরেশন এলাকার তুলনায় শহরতলী এলাকায় বেশি পরিলক্ষিত হয়। পরিকল্পনাবিদগণ আরো জানান, বেসরকারি ভূমি উন্নয়নকারীরা কোনো প্রকার পরিকল্পনার মানদণ্ড/আদর্শ বিবেচনা না করে, খুউকের অনুমোদন ছাড়া অথবা নিয়ম ভঙ্গ করে অপরিকল্পিতভাবে নগরের বিকাশ ঘটাচ্ছে।[২১] বিষয়টি নগরীর পরবর্তী কালের বিকাশে সমস্যা সৃষ্টি করবে।

শহরে একজন ব্যক্তি বা পরিবার কতটুকু জমি রাখতে পারবে এরূপ কোনো আইন নেই। অথচ গ্রামে কৃষি জমির সর্বোচ্চ সীমা আইন রয়েছে। যদিও ১৯৯১ সালের টাস্কফোর্স রিপোর্ট অনুসারে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় জমির সর্ব্বোচ মালিকানা সর্ব্বোচ ১০ কাঠায় সীমিত করা, জেলা সদর পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এ সিলিং ১৫ কাঠা ও অন্যান্য পৌসভার জন্য ২০ কাঠা নির্ধারণ; আগের মালিকদের সর্ব্বোচ ১ বিঘা পর্যন্ত জমি রাখার সুযোগ দিয়ে বাকিটা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা; বেআইনি অধিকৃত সব জমি উদ্ধার করা ও সরকারি জমিতে স্বল্প ব্যয়ে গৃহায়ন; বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন বা প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় ব্যবহার করার কথা থাকলেও এসব বিষয়ের বাস্তবায়ন নেই।[২২]

- *অন্যান্য : নগর অপরাধ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া*

জমি সংক্রান্ত দখল, অপরাধ প্রবণতা, চাঁদাবাজি, প্রতিবেশীর ভূমি বিরোধ, সম্মুখের প্রতিবেশী কর্তৃক ভূমিতে প্রবেশ সমস্যা, অবরোধকারী অস্বাস্থ্যকর অবকাঠামো ইত্যাদি সমস্যা নগরায়ণের অন্তরায়। উল্লেখ্য যে, অপরাধপ্রবণ নগরী হিসেবে পরিচিত খুলনা শহরে ১৯৯৮ সালে এপ্রিল, মে ও জুন

---

[১৯] Nazrul Islam, "The Future of Dhaka", Dhaka: Seminar on Dhaka City Management, Organised by BRAC, 15-17 March, 1998.

[২০] পরিকল্পনা শাখা, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা, ২০০৩।

[২১] *তদেব*।

[২২] আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব?* (ঢাকা : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪), পৃ. ১১।

এই তিন মাসে ১৫০টি অপরাধ সংগঠিত হয়।[২৩] নগর অপরাধ প্রবণতা, চাঁদাবাজি ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা নগর ভূমি উন্নয়নের একটি অন্তরায়। মাঠ পর্যায়ের সরেজমিন পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, নগর অপরাধ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সাথে নগর নির্মাণ কার্যের সম্পর্ক রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে অপরাধী ধরপাকড় এবং সন্ত্রাস দমনে যৌথবাহিনীর কার্যকালে, খুলনার অভিজাত আবাসিক এলাকাসমূহে ব্যাপক নির্মাণ কার্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি সারারাত ধরে তড়িঘড়ি নির্মাণ লক্ষণীয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নগর অপরাধ কমলে সুস্থ, স্বাভাবিক, ধীর-স্থিরভাবে পরিকল্পিত ভূমি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়

১৯৯৭-২০০২ সালের পঞ্চম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশে পাঁচটি কৌশলগত সঞ্চলন করিডোরের পরিকল্পনা করা হয় : (১) ঢাকা-চট্টগ্রাম, (২) ঢাকা-সিলেট, (৩) ঢাকা-উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, (৪) খুলনা-ঢাকা এবং (৫) খুলনা- উত্তর পশ্চিমাঞ্চল।[২৪] সেই অনুযায়ী রূপসা সেতু, পদ্মায় হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পাশে পদ্মা সেতু ও খুলনা মাওয়া ঢাকা সড়কের উন্নয়ন কাজ চলছে। এছাড়াও অপর পদ্মা সেতুর জন্য সমীক্ষা চলছে। খুলনার দক্ষিণে মংলায় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং খুলনার উত্তরে শিরোমণি, ও নওয়াপাড়ার শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশমান। খুলনায় মৎস্য (চিংড়ি) উপখাতসহ কৃষি খাতসমূহ চাঙ্গা রয়েছে। প্রক্রিয়াধীন আছে বিমান বন্দর ও পর্যটন প্রকল্পসমূহ। ফলে খুলনার উপর নগরায়ণের তথা ভূমির চাপ বাড়ছে। নিম্নে নগরায়ণ বিকাশে ভূমিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় আলোচনা করা হলো।

খুউকের ২০০১ সালের মহাপরিকল্পনার হিসেবে ২০১০ সালে খুলনা শহরে আরো ১১ লক্ষ ১০ হাজার এবং ২০২১ সালে ২১ লক্ষ ৬০ হাজার জনসংখ্যা যুক্ত হবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১১২৮০ একর জমি রয়েছে যার প্রায় ১০ ভাগ (১১০০ একর) এখনও শহর হিসেবে গড়ে ওঠেনি। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বাইরে, খুউকের মহাপরিকল্পনার এলাকার মধ্যে প্রায় ৯৪৮৪৫ একর জমি রয়েছে। যার মাত্র ৪২৪৮ একর (প্রায় ৪.৫০%) শহর হিসেবে গড়ে উঠেছে।[২৫] কাজেই ঐ সকল ফাঁকা স্থানে নগরায়ণ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

খুলনার নগরায়ণের বিকাশ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার। সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে ও বাইরের খুউকের পরিকল্পনাধীন স্থানে যথাসম্ভব কৃষি ও কৃষিজ খাতসমূহের ক্ষতি না করে নগরায়ণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, কৃষিক্ষেত্র ও জলাভূমি নগরের জন্য অপরিহার্য মুক্তাঙ্গন হিসেবে কাজ করে। তাই মহানগরের ভিতরে ও বাইরে অনুভূমিক সম্প্রসারণের পরিবর্তে যথাসম্ভব লম্বিক সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা। ভূমি জরিপ ও মৃত্তিকার গুণাগুণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শহরের জেব/পকেট জমি খুঁজে বের করে উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে। নির্মাণ উপযোগী এবং লম্বিক সম্প্রসারণ উপযোগী জমিতে ঘন-বিন্যস্ত (densified and compact) আবাসন তথা পরিকল্পিত ক্ষুদ্র শহর এলাকা গড়ে তোলা জরুরি। এক্ষেত্রে শহরের ভিতরের জমি সর্বাধিক ব্যবহার করাই উত্তম। উল্লেখ্য যে, খুলনার ভূমিসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি খুলনা শহরের ভূমির কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। খুলনা শহর ভূমিকম্পপ্রবণ নয়। ভূ-কম্পন মানচিত্রের তথ্য

---

[২৩] মোঃ মোস্তফা সরওয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. 17.

[২৪] Planning Commission, *Fifth Five-year Plan 1997-2002* (Dhaka : Bangladesh Government, 1997) p. xvii-3.

[২৫] Aqua-Sheltech Consortium, *op.cit.*, Vol. II, p. 59.

অনুযায়ী সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের মধ্যে খুলনা শহর রয়েছে।[২৬] খুলনা শহরের ভূ-ভাগ উঁচু হওয়ায় বন্যামুক্ত। দক্ষিণে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন ধাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকেও তুলনামূলক নিরাপদ। এই সকল সুবিধা ঘন-বিন্যস্ত নগরায়ণের জন্য উপযোগী। সমন্বিত মহানগরীর পরিকল্পনার আওতায় খুলনার চারদিকেই বিশেষ করে নওয়াপাড়া, ভৈরব-রূপসার অপর পারে পরিকল্পিত উপশহর গড়ে তোলা যেতে পারে। কেননা নদীর পূর্ব পারে নগর বিকাশের উপযোগী উঁচু জমি রয়েছে। নিরাপদ ও উন্নত ফেরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করে পরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এছাড়াও নির্মাণাধীন রূপসা সেতুর সাথে প্রয়োজনীয় সংযোগ রাস্তা ও আনুষঙ্গিক ছোট সেতু দ্বারা যোগসূত্র স্থাপন করা জরুরি।

লবণাক্ততা কমানোর জন্য শুষ্ক মৌসুমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীতে পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। দেওয়ান ও নিজামুদ্দিনের গবেষণা থেকে জানা যায় (নিয়মিত ড্রেজিং দ্বারা গড়াই নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি এই অঞ্চলের লবণাক্ততাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করতে সক্ষম।[২৭]

ভূমি সংক্রান্ত বিবিধ জটিলতা কমাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। প্রথম পর্যায়ে বর্তমান সমন্বয় ছাতার (coordination umbrella) আওতা বাড়ানো দরকার। দ্বিতীয় পর্যায়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমন্বয় কমিটি গঠন করে ভূমি উন্নয়ন তথা নগরায়ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। পরবর্তী পর্যায়ে নগর সরকার প্রতিষ্ঠা করে তার আওতায় সকল ভূমি ও নাগরিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় সুষ্ঠু নগরায়ণ তথা ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ভৌত অবকাঠামোগত পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক কম্পিউটার, দূর-অনুধাবন প্রযুক্তি যেমন-ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জি আই এস) অথবা জমি তথ্য ব্যবস্থা (এল আই এস), বিমান/উপগ্রহ থেকে আলোকচিত্র বিশ্লেষণ পদ্ধতি ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটানো যেতে পারে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা দরকার।

মহানগরীর এলাকার জন্য যুগোপযোগী এবং পরিবর্তনশীল নগরায়ণের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম এমনই ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করা জরুরি। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নির্মাণ, জমির সুষ্ঠু ব্যবহার, নগরাঞ্চলের জমির নিয়ন্ত্রণ, অপরিকল্পিত জমি খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ, বেসরকারি পর্যায়ে ইচ্ছা মাফিক ভূমি উন্নয়ন, ভূমি বাজারে কর্তৃত্ব, তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধন, আইনগত জটিলতা সরলীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সুচিন্তিত পদক্ষেপ দরকার। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার আওতায় সরকারি প্রকল্পের পাশাপাশি যৌথ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যথাযথ প্রণোদনা (incentive) দিয়ে ভূমি উন্নয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

উপসংহার

বাংলাদেশের নগরায়ণ বিকাশে ভূমি একটি বড় বিবেচ্য বিষয়। মহানগরসমূহের ভূমিসংক্রান্ত সমস্যার প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায় যে, নগরায়ণের জন্য উপযোগী ভূমির স্বল্পতা রয়েছে। খুলনার ভূমি সমস্যায় (উঁচু ভূমির স্বল্পতা, ভূমি ব্যবহারে দ্বন্দ্ব, ভূমির উচ্চ মূল্য, অসম ভূমি অধিকার তথা বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণহীন ভূমি উন্নয়ন, অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা, অপর্যাপ্ত আইন,

---

[২৬] Disaster Forum, *Disaster Report: Bangladesh 1997* (Dhaka : Disaster Forum, 1997), p. 61.

[২৭] আশরাফ মাহমুদ দেওয়ান ও খন্দকার নিজামুদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।

নগর অপরাধ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। খুলনা নগরায়ণের বিকাশে ভূমি সমস্যার ক্ষেত্রে উল্লিখিত এ সকল সমস্যার পাশাপাশি আরো রয়েছে, জৈবিক পিট-মাটি, লবণাক্ততা, নদী তীরবর্তী ভূমিরূপের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও তার প্রভাব, যা খুলনা নগরায়ণের বিকাশকে আরো বাধাগ্রস্ত করছে।

ভূমি সীমাবদ্ধ সম্পদ ও অবর্ধিষ্ণু। এই সম্পদ নবায়নযোগ্য নয়। তাই সকল শহরের জন্যই ভূমির সুপরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব সর্বোত্তম অনুকূল ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

মানচিত্র ১: গবেষণা এলাকা/খুলনা সিটি কর্পোরেশন

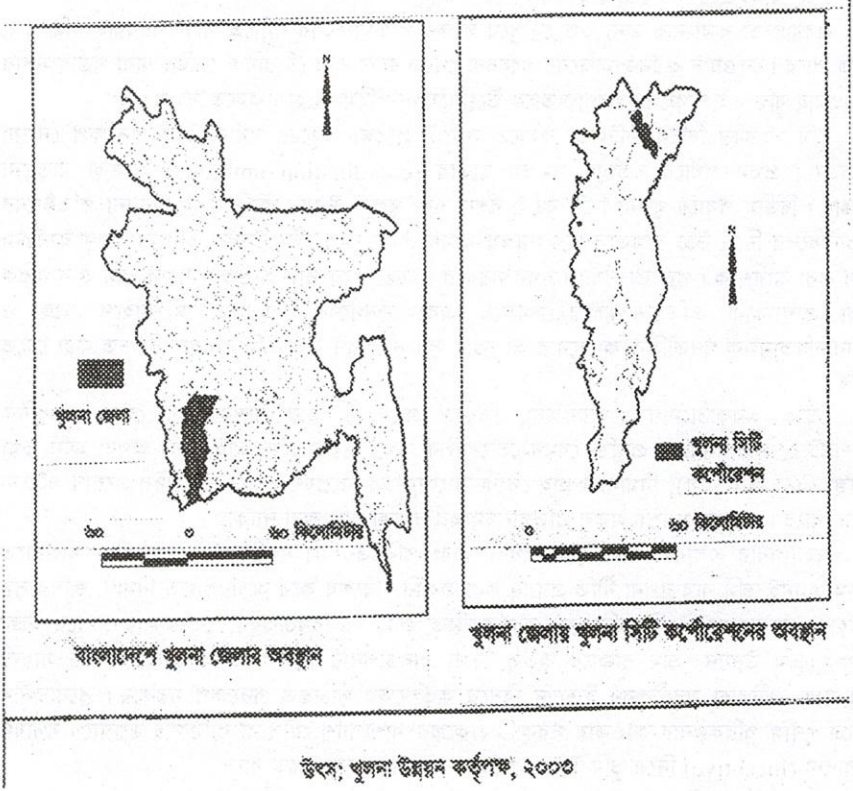

উৎস: খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ২০০৩

মানচিত্র ২: খুলনা শহরের বিকাশ

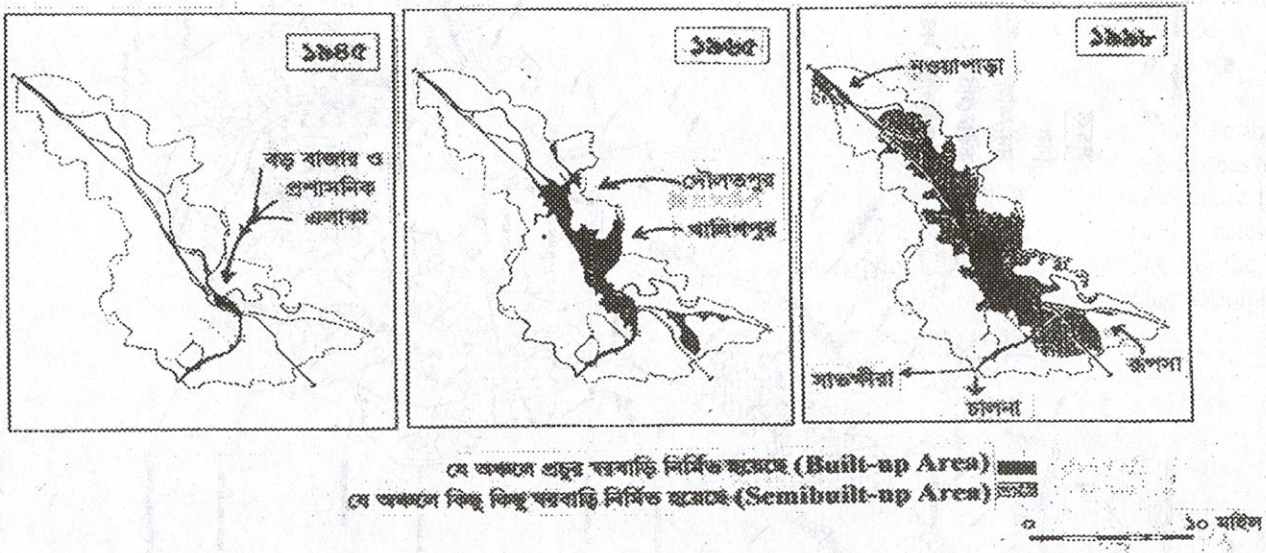

উৎস: Aqua-Sheltech Consortium, *Structure Plan, Master Plan and Detail Area Plan*, vol. 2, *Structure Plan*, (Khulna: Khulna Development Authority, 2001), p. 11.

মানচিত্র ৪: খুলনা শহরের ভূমি ঢালের দিকসহ পানির নির্গমন পথ

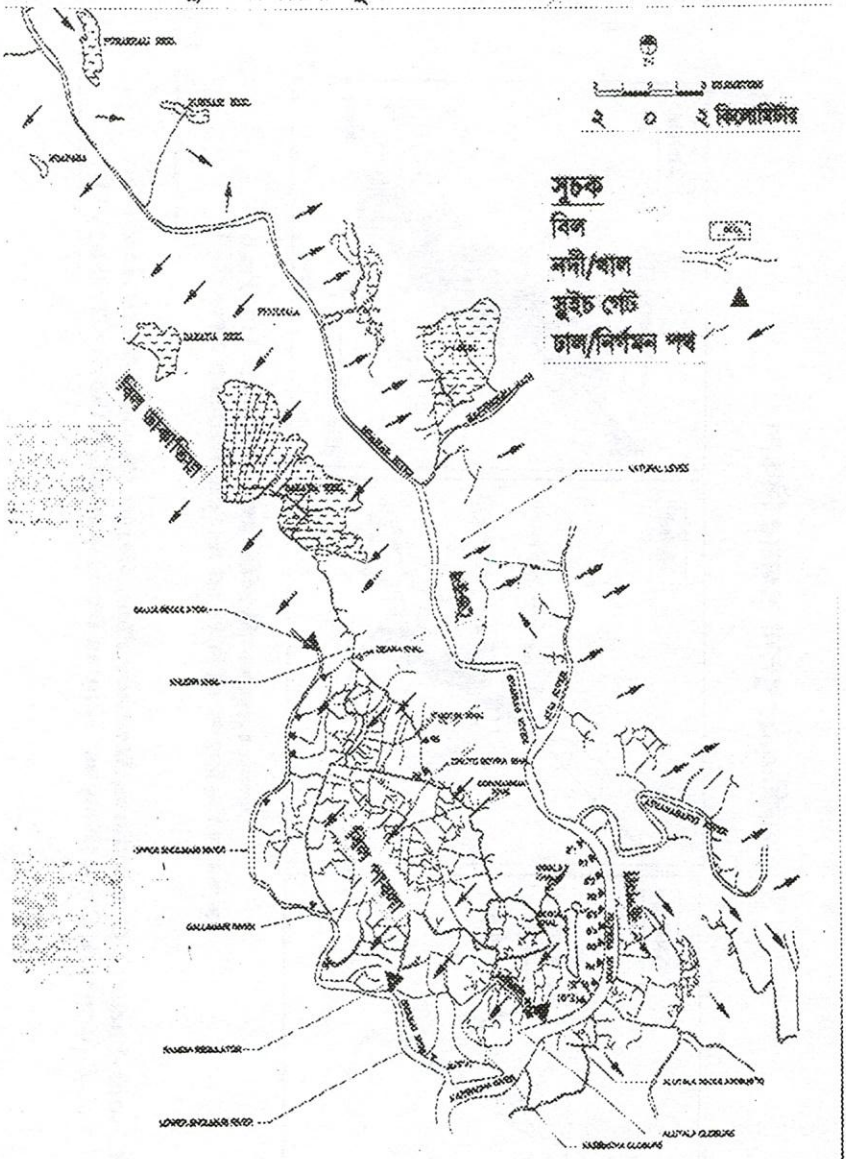

উৎস: Aqua-Sheltech Consortium, *Structure Plan, Master Plan and Detail Area Plan*, vol. 2, *Structure Plan*, (Khulna: Khulna Development Authority, 2001), p. 114.

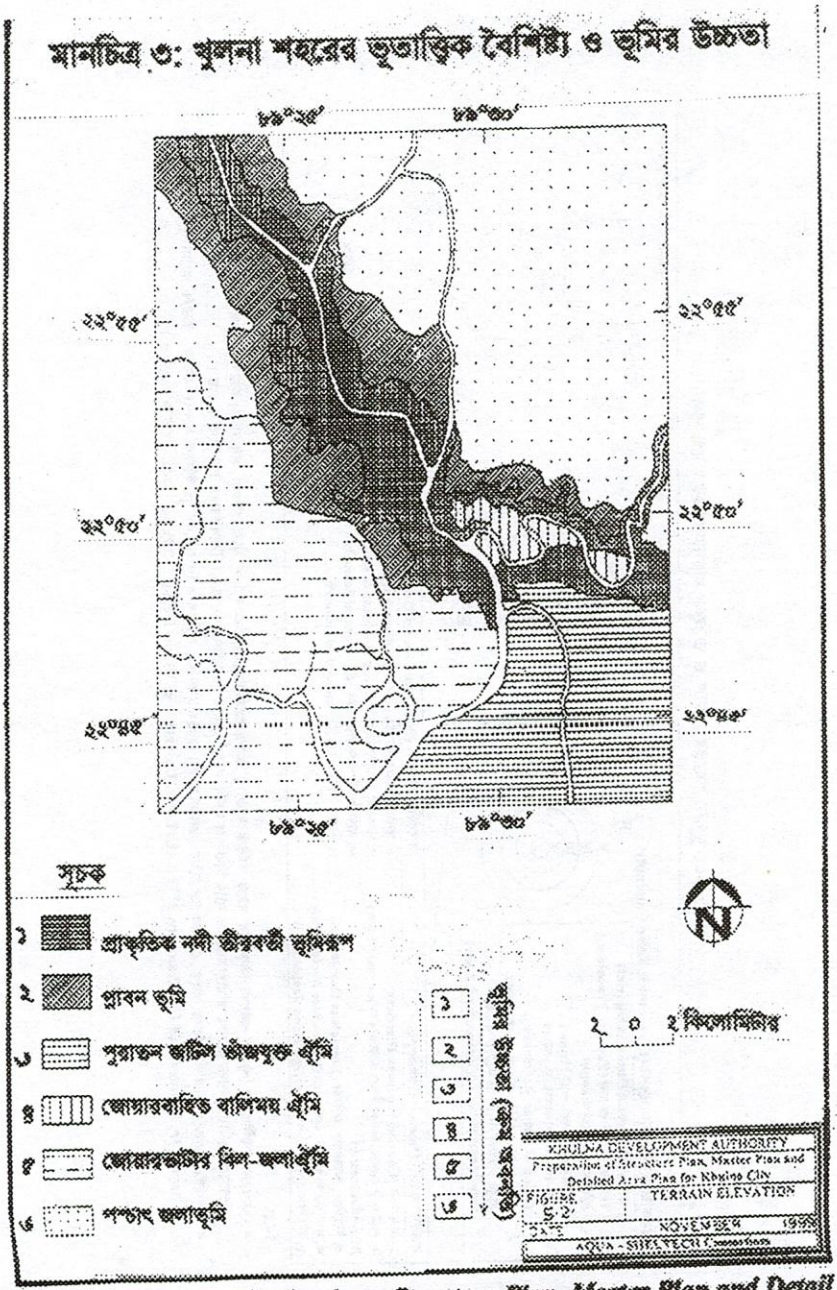

উৎস: Aqua-Sheltech Consortium, *Structure Plan, Master Plan and Detail Area Plan*, vol. 1, *Urban Strategy*, (Khulna: Khulna Development Authority, 2001), p. 28.

মানচিত্র ৫: খুলনা শহরের বিকাশ ও তাত্ত্বিক ধারণাসমূহের সাথে তুলনা

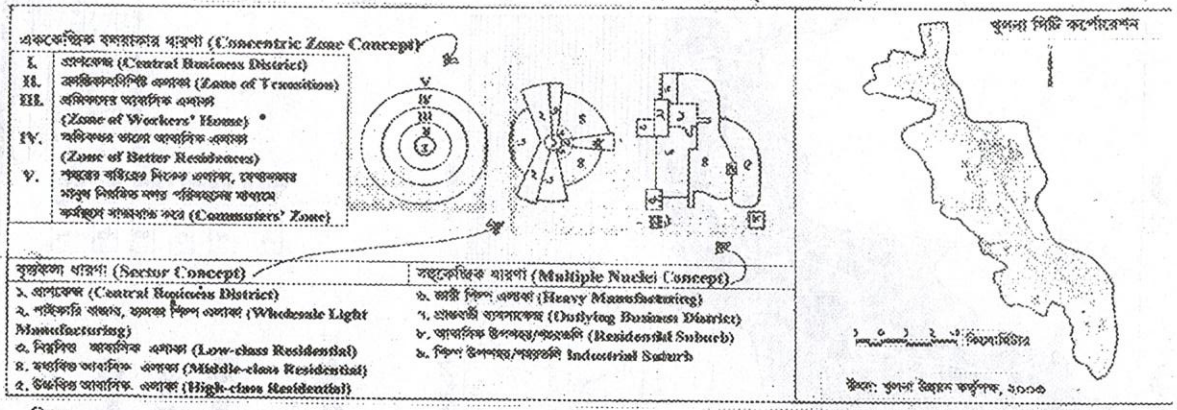

বি.দ্র.:

* এখানে লক্ষণীয় যে, খুলনা শহরের বিকাশের সাথে তাত্ত্বিক ধারণার চিত্র/মানচিত্রসমূহের তেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ খুলনার চারদিকে নগর সম্প্রসারণ উপযোগী ভূমির স্বল্পতা থাকায় তাত্ত্বিক মডেলের ন্যায় বিকশিত হয়নি, বরং প্রকৃতিগত ভূমিরূপের কারণেই রৈখিকভাবে বিকশিত হয়েছে।
* বার্জেসের এককেন্দ্রিক বলয়াকার ধারণা, হোমার হোয়েটের বৃত্তকলা ধারণা এবং হ্যারিস ও উলম্যানের বহুকেন্দ্রিক ধারণা বিষয়ক— চিত্র/মানচিত্রসমূহ F. Stuart Chapin, Jr. *Urban Land Use Planning*, 2nd ed. (Urbana: University of Illinois Press, 1970), pp. 14-23. থেকে সংগৃহীত।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

বাংলাদেশে নগরায়ণ : সাম্প্রতিক প্রবণতা ও গতিপ্রকৃতি

ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু*

Abstact: Urbanization in Bangladesh has undergone tremendous acceleration and change since independence in 1971. Urbanization involves an indepth analysis of the related economic, social and political phenomena as the urbanization process refers to much more than simple population growth. As a third world country the two major components of the urban population growth—migration and natural growth—in Bangladesh draw special attention of the researchers. Since Bangladesh fails to provide necessary services to the rapid growing urban population, the urbanization in Bangladesh virtually becomes a complex problem. The present paper tries to explore and examine the nature, trend and dimensions of urbanization over the last three decades and the days to come.

১.ভূমিকা

বাংলাদেশে নগরীয় লোকসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের কম হলেও ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তনের সিংহভাগেরই সূতিকাগার নগর। সুতরাং বাংলাদেশে নগরায়ণের প্রবণতা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে নগরায়ণকে কেন্দ্র করে সূচিত সামাজিক পরিবর্তন সমূহ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। হংকং ও সিঙ্গাপুরের ন্যায় নগর-রাষ্ট্র বাদ দিলে পৃথিবীর অন্যতম লোকবহুল রাষ্ট্র বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক ঘনবসতি পূর্ণ রাষ্ট্র, যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৯০৪ জন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩)। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ১০ম এবং এশিয়ার ৬ষ্ঠ লোকবহুল রাষ্ট্র।[১] প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের পাশাপাশি সীমিত জমিতে বিপুল লোকসংখ্যা ও লোকসংখ্যার তুলনামূলক দ্রুত বৃদ্ধি বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এক ভয়াবহ প্রতিবন্ধক। ২০০১ সালের হিসেবে বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যার ২৩.৩৯% নগরে ও ৭৬.৬১% গ্রামে বাস করে (BBS, 2001: 6) এবং

---

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১]বিশ্ব ব্যাংক-এর 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৩' অনুযায়ী (পৃ. ২৩৪) ২০০১ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৩৩.৪ মিলিয়ন এবং সে হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ এবং এশিয়ার ৫ম জনবহুল দেশ। বিবিএস রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের দশম জনবহুল দেশ এবং এশিয়ার ৬ষ্ঠ জনবহুল দেশ। ইউএনডিপি-র হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২ অনুযায়ী (পৃ. ১৬২-১৬৪) বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ।

লোকবৃদ্ধির প্রবণতায় নগরীয় লোকবৃদ্ধির হার গ্রামীণ লোকবৃদ্ধির হার অপেক্ষা অনেক বেশি। ২০২০ সালে বাংলাদেশে মোট লোকসংখ্যার ৩৮.২% নগরে বাস করবে (Barakat, 2001: 27)। কিন্তু নগরীয় লোকবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে যাবতীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সহ ভৌত অবকাঠামোর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন না হওয়ায় বাংলাদেশে নগরায়ণ এক অস্বাভাবিক, ছন্দহীন ও অসহনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে।

২. উদ্দেশ্য

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বাংলাদেশে নগরায়ণের সাম্প্রতিক প্রবণতা (Trend) ও গতিপ্রকৃতি (Dimension) বিশ্লেষণ করা হবে এবং পাশাপাশি লোকসংখ্যা অভিক্ষেপ (Population projection) অনুযায়ী ভবিষ্যৎ নগরীয় লোকসংখ্যা ও নগরায়নের প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে। প্রাসঙ্গিকভাবেই বিভিন্ন দেশের নগরায়ণের সাথে বাংলাদেশের নগরায়ণের তুলনা করা হবে। নগরায়ণের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কেও এ প্রবন্ধে আলোকপাত করা হবে।

৩. বিশ্লেষণ পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সেকেন্ডারি উৎস (Secondary Source) হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। সেকেন্ডারি উৎস হিসেবে প্রধানত ব্যবহার করা হয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট সমূহকে। এছাড়াও ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক এবং জাতিসংঘ সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব লোকসংখ্যার যে বিশ্লেষণ সমূহ উপস্থাপন করেছে তা ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থার উপাত্তের মধ্যে কিছু মাত্রায় অসামঞ্জস্যতা রয়েছে, তবে এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য-উপাত্তকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অত্র প্রবন্ধে 'নগর' শব্দটি 'শহর', 'পৌর এলাকা' ও 'মহানগর' সকল অর্থেই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু নগর এলাকা প্রায়শই বিভিন্ন প্রশাসনিক সীমানার মধ্যে বিস্তৃত থাকে তাই কোনো একক সংস্থার পক্ষেই নগর সংক্রান্ত অভ্রান্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু নগরের সংজ্ঞা, উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই নগরায়ণ সংক্রান্ত তুলনা আক্ষরিকভাবেই জটিল। উপরোক্ত সকল বিষয় বিবেচনা করেই বর্তমান প্রবন্ধের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নগরায়ণ

এটা অনস্বীকার্য, উন্নত বিশ্বের নগরায়ণ মাত্রা তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণ মাত্রা হতে অনেক বেশি। এতৎসত্ত্বেও সমসাময়িক তৃতীয় বিশ্বে সামগ্রিক লোকবৃদ্ধির হার অপেক্ষা নগরীয় বৃদ্ধি (Urban growth) অনেক বেশি জটিল সমস্যা হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে ২০০০ সালে উন্নত বিশ্বের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ (৭৯%) অধিবাসী নগরে বাস করে, বিপরীতে তৃতীয় বিশ্বে এই হার মাত্র দুই-পঞ্চমাংশ (৪১%) (World Bank 2002a: 172)। অর্থাৎ ২০০০ সালে তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণ মাত্রা ছিল উন্নত বিশ্বের প্রায় অর্ধেক, যদিও ১৯৮০ সালে উন্নত বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণ মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭৫% ও ৩২% (World Bank 2002a: 172)। দুই দশকে (১৯৮০-২০০০) উন্নত বিশ্বে যেখানে নগরীয় লোকসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৫.৩৩%, সেখানে তৃতীয় বিশ্বে নগরীয় লোকসংখ্যা বেড়েছে ২৮.১২%। জাতিসংঘের হিসেব অনুসরণে ইসলাম বলেন:

> ১৯০০ সনে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রতি ১০ জনে মাত্র একজন শহরে বাস করতো, আর আজ তার অর্ধেকই, অর্থাৎ ৩০০ কোটির মতো মানুষ, শহরবাসী। এই ৩০০ কোটির মধ্যে আবার দুই-

তৃতীয়াংশই উন্নয়নশীল দেশের নগরবাসী। এই বিশাল নগরীয় জনসংখ্যা কিন্তু অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে, বিশ্বব্যাপী এর বৃদ্ধি হার বার্ষিক গড়ে ২ শতাংশ, আর উন্নয়নশীল দেশে এই হার ২.৬ শতাংশ। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সনে বিশ্বের নগরীয় জনসংখ্যার পরিমাণ হবে ৫০০ কোটি এবং ২০৩০ সনে ৭৬৫ কোটি, অর্থাৎ বর্তমান বিশ্ব জনসংখ্যারও অনেক বেশি। বলাবাহুল্য ভবিষ্যতের এই বিপুল পরিমাণ নগরীয় জনসংখ্যার অধিকাংশের উপস্থিতি থাকবে উন্নয়নশীল দেশসমূহে, ২০১৫ সনে সংখ্যাটি দাঁড়াবে ২৮৫ কোটিতে এবং ২০৩০ সালে ৩৮৮ কোটিতে (ইসলাম ২০০৩: ১১)।

নগরায়ণের এই মাত্রা তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আবার বিভিন্ন রকম। যেমন, ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিল, চিলি, ভেনেজুয়েলা বা আর্জেন্টিনার মতো দেশসমূহের নগরায়ণ মাত্রা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ সমূহের সমতুল্য। অধিকন্তু একক মহানগর হিসেবে মেক্সিকো সিটি এবং সাও পাওলো বিশ্বের অন্যতম লোকবহুল নগরী, যেখানে একবিংশ শতকের শুরুতেই লোকসংখ্যা ২ কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে (World Bank, 2002a: 182-83)। পক্ষান্তরে, আফ্রিকার বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই নগরীয় লোকসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ২০%-এরও কম এবং আফ্রিকার রুয়ান্ডা বিশ্বের সর্বনিম্ন নগরায়িত দেশ, যেখানে ২০০০ সালে মাত্র ৬% লোক ছিল নগরের অধিবাসী (World Bank, 2002a: 172)। এশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ৩৫% এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ২৮% লোক নগরে বাস করে। ২০০০ সালে এশিয়ার তিনটি লোকবহুল রাষ্ট্র চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার নগরীয় লোকসংখ্যার হার ছিল যথাক্রমে ৩২%, ২৮% ও ৪১%, যা ১৯৮০ সালে ছিল যথাক্রমে ২০%, ২৩% ও ২২%; যদিও দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০০০ সালে নগরীয় লোকসংখ্যা ছিল ৮২% (World Bank, 2002a: 170-71)।

সারণি ০১

অঞ্চল ভেদে বিশ্বের মোট নগরীয় লোকসংখ্যা ও নগরীয় লোকসংখ্যার শতকরা হার (১৯৮০-২০০০)

	মোট নগরীয় লোকসংখ্যা (মিলিয়ন)		লোকসংখ্যার শতকরা হার	
অঞ্চল	১৯৮০	২০০০	১৯৮০	২০০০
সমগ্র বিশ্ব	১,৭৫৯.৯	২,৮৪৭.৮	৪০	৪৭
নিম্ন-আয়ের দেশ সমূহ	৩৮৮.২	৭৮৫.১	২৪	৩২
মধ্য-আয়ের দেশ সমূহ	৭৭৬.৫	১,৩৫০.৮	৩৮	৫০
নিম্নতর মধ্য-আয়ের দেশ সমূহ	৪৮৬.৯	৮৫৯.৫	৩১	৪২
উচ্চতর মধ্য-আয়ের দেশ সমূহ	২৮৯.৬	৪৯১.৩	৬২	৭৬
নিম্ন ও মধ্য-আয়ের দেশ সমূহ	১,১৬৪.৭	২,১৩৫.৯	৩২	৪১
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল	৩০৯.৮	৬৫২.৪	২২	৩৫
ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া	২৪৯.৩	৩১০.১	৫৯	৬৫
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল	২৩৩.৪	৩৮৮.৭	৬৫	৭৫
মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা	৮৩.৫	১৭২.৯	৪৮	৫৯
দক্ষিণ এশিয়া	২০১.০	৩৮৫.০	২২	২৮
সাব-সাহারান আফ্রিকা	৮৭.৭	২২৬.৯	২৩	৩৪
উচ্চ-আয়ের দেশ সমূহ	৫৯৫.১	৭১১.৯	৭৫	৭৯
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	২১০.১	২৩৫.৩	৭৩	৭৭

উৎস: World Bank, *World Development Indicators-2002*, Washington, 2002, p. 172

এশিয়ার, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার, লোকবসতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বিশাল নগর এবং ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম। দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষত বাংলাদেশে, নগর ও গ্রামের ব্যবধান ও বৈষম্য অত্যন্ত প্রকটভাবে দৃশ্যমান। অর্থাৎ সহজ ভাষায় নগরায়ণ মাত্রার ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের মধ্যে ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় পার্থক্য রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের মাত্রা অপেক্ষা উন্নত বিশ্বের নগরায়ণ মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ হলেও তৃতীয় বিশ্বের নগরীয় লোকসংখ্যার মোট আকার উন্নত বিশ্ব অপেক্ষা অনেক বেশি। নগরীয় লোকসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারের বিবেচনায় তৃতীয় বিশ্বের নগরের বিস্তৃতি উন্নত বিশ্ব অপেক্ষা অনেক দ্রুততর; ১৯৮০-২০০০ এই দুই দশকে তৃতীয় বিশ্বের নগরের বিস্তৃতি উন্নত বিশ্ব অপেক্ষা পাঁচ গুণ বেশি। দৃশ্যত, সে সকল দেশেই নগরীয় লোকসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে, যে সকল দেশ ন্যূনতম নাগরিক সুবিধাদি নিশ্চিত করতে বাস্তবিকই অপারগ। উন্নত বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে নাগরিক সুবিধাদি ভোগ ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। ২০০০ সালে তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নত বিশ্বের মোট নগরীয় লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,১৩৫.৯ মিলিয়ন ও ৭১১.৯ মিলিয়ন (সারণি:০১)। যেখানে ১৯৮০ সালে তৃতীয় বিশ্বের মোট নগরীয় লোকসংখ্যা ছিল উন্নত বিশ্বের মোট নগরীয় লোকসংখ্যার দ্বিগুণ, সেখানে ২০০০ সালে তৃতীয় বিশ্বের মোট নগরীয় লোকসংখ্যা উন্নত বিশ্বের মোট নগরীয় লোকসংখ্যার তিন গুণে উন্নীত হয়। এই দ্রুত নগরায়ণ অনেক জটিল সমস্যার জন্ম দিচ্ছে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই সমস্যা বহুমাত্রিক ও বিচিত্র।

বিশাল নগরীয় লোকসংখ্যা ও এর দ্রুত প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মেগাসিটি বা মেট্রোপলিটান সিটির উদ্ভব। এ কারণে তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের ব্যাখ্যায় Primate City বা Urban Primacy প্রত্যয়টির বিকাশ ঘটেছে। Urban Primacy বলতে বোঝানো হয়, "...the demographic, economic, social and political dominance of one city over all others within an urban system" (Drakakis-Smith: 5)। থাইল্যান্ডে Urban Primacy এতই প্রকট যে ব্যাংকক নগরী থাইল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী অপেক্ষা আয়তনে প্রায় ৫০ গুণ বড় এবং থাইল্যান্ডের মোট নগরীয় লোকসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই ব্যাংককে বসবাস করে (Drakakis-Smith:5)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঢাকা একটি 'প্রাইমেট সিটি'। তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের ধারায় দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নগরীয় লোকসংখ্যার অভিক্ষেপে দেখা যায় ২০১৫ সালে লোকসংখ্যার নিম্নক্রম অনুসারে বিশ্বের সর্বাধিক লোকবহুল দশটি মহানগরী (Mega City) হচ্ছে : টোকিও, মুম্বাই, লাগোস, ঢাকা, সাও পাওলো, করাচি, মেক্সিকো সিটি, নিউ ইয়র্ক, জাকার্তা ও কলকাতা (World Bank 2002a: 173)। এই দশটি মহানগরের মধ্যে উন্নত বিশ্বের নগর মাত্র দু'টি, অথচ দক্ষিণ এশিয়ার নগর চারটি। সহজ কথায় বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের চারটি মহানগর ২০১৫ সালের পৃথিবীতে নগরীয় লোকসংখ্যার বিরাট অংশকে ধারণ করবে। ২০১৫ সালে ঢাকা হবে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম লোকবহুল মহানগরী।

৫. বাংলাদেশে নগরায়ণের সাম্প্রতিক প্রবণতা

বাংলাদেশে ১৯০১ সালের পর হতে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছিল ৬০ বছরেরও বেশি, যদিও পরবর্তীতে উচ্চ প্রজনন হার এবং পাশাপাশি মরণশীলতার নিম্নহারের ফলে মাত্র ৩০ বছরে (১৯৬১-১৯৯১) লোকসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা

১৩.৩৪ মিলিয়ন এবং বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১.৪৮% ছিল। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে ও ২০০১ সালে নগরীয় লোকসংখ্যা ছিল মোট লোকসংখ্যার যথাক্রমে ১৯.৬৩% ও ২৩.৩৯% (BBS, 1992, 2001)। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১০ সালে ও ২০২০ সালে নগরীয় লোকসংখ্যা হবে মোট লোকসংখ্যার যথাক্রমে ৩০.৩% ও ৩৮.২% (Barakat, 28)। বর্তমানে বাংলাদেশের নগরীয় লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি, ২০১৫ সালে হবে প্রায় ৭ কোটি এবং ২০৩০ সালে ১০ কোটিরও বেশি (ইসলাম ২০০৩: ১১)। এই পটভূমিকাতেই বাংলাদেশের নগরায়ণের প্রবণতা ও গতিপ্রকৃতিকে চিহ্নিত করতে হবে।

আহমেদ বাংলাদেশের নগরায়ণকে বলেছেন নির্ভরশীল নগরায়ণ (Dependent Urbanization) (Ahmed 1997: 1)। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বব্যাপী আবহে তৃতীয় বিশ্বের সমাজকাঠামোতে যে ভাঙন দেখা দেয় বাংলাদেশ তা হতে মুক্ত নয়। Castells-কে উদ্ধৃত করে আহমেদ দেখান যে তৃতীয় বিশ্ব ও প্রথম বিশ্বের মধ্যেকার অসম, শোষণমূলক সম্পর্ক অনুন্নয়নকে পরিপোষণ করে যার ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয় 'নির্ভরশীল নগরায়ণ' । নগরীয় লোকসংখ্যার দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং নগরের অপরিকল্পিত ও অসম বিস্তৃতি নগর দারিদ্র্যও বেকারত্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। তৃতীয় বিশ্বে প্রাইমেট নগরের উদ্ভব ও বিকাশ তাই স্বভাবতই ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, under-employment ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিনিয়োজন বৃদ্ধির প্রবণতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আহমেদ মনে করেন বাংলাদেশের নির্ভরশীল নগরায়ণ প্রবণতার মধ্যে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়:

> ...the most striking feature of Bangladesh's dependent urbanization is found in urban underemployment and the development of informal sector of employment. Unlike the West, urban development in Bangladesh is not accompanied by a pronounced shift from agriculture to manufacturing occupations with a subsequent increase in tertiary employment. Rather, it is the result of the process of industrialization in advanced capitalist countries. As a result, urbanization in Bangladesh is accompanied by increased industrial output but not by increased industrial employment. Moreover, the Bangladesh state is more concerned to maximize investment returns rather than expand or generate employment incomes. The reduction of employment opportunities along with a faster growth of urban population has increased the degree of both absolute and relative urban poverty. Thus an enlarged underemployment within informal sector of urban economy has created a class of protoproletariat most conducive for accumulation of capital (Ahmed 1997: 2).

ঢাকা মহানগরের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের (Informal Sector) উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় আহমেদ দাবি করেন যে বাংলাদেশে কর্মসৃজন (Employment Creation) ক্ষেত্রে বিরাজমান মন্দা বা স্থবিরতা বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাব সম্ভূত। তাঁর মতে ঢাকা নগরের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে

বিনিয়োজিত শ্রমিকদের সিংহভাগই মূলত অভিবাসী এবং এই শ্রমিকদের জীবনধারণ ও কাজের শর্তাদি ব্যাখ্যা করে তাদেরকে নির্দ্বিধায় Underclass বা Protoproletariat হিসেবে চিহ্নিত করা যায় (Ahmed. 1997: 3)। এই অভিবাসী শ্রমিকদের প্রকৃত অর্থনৈতিক শোষণের প্রসঙ্গটি যখন জ্ঞাতিসম্পর্কের (Kinship relations) আড়ালে হারিয়ে যায় তখন বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। জ্ঞাতিসম্পর্কের আড়ালে অন্তর্হিত অর্থনৈতিক শোষণের প্রসঙ্গটি শ্রেণী সম্পর্কের বিকাশকে ব্যাহত করে। প্রাইমেট নগরী ঢাকায় লক্ষ লক্ষ Protoproletariat শিল্পকেন্দ্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বাইরে কাজ করে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস খাত শুধু রপ্তানির পরিবৃদ্ধি ঘটায় কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিল্পায়নের মাত্রা বৃদ্ধি অথবা Underclass-কে Class-এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে এ খাতের কোনো ভূমিকা নেই। তাই মাহবুব আহমেদ মনে করেন বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিক সহ নগরের বেশির ভাগ শ্রমিকই Protoproletariat হিসেবে বিশ্বায়ন ও নির্ভরশীল নগরায়ণ দ্বারা নির্ধারিত বাস্তবতার শিকার।

বাংলাদেশে ১৯৭০ হতে ১৯৯৫ পর্যন্ত ২৫ বছরে যেখানে সার্বিক নগরীয় লোকবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৬% -এর বেশি, সেখানে গ্রামীণ লোকবৃদ্ধির গড় হার ছিল ২% -এর সামান্য বেশি। নগরীয় লোকবৃদ্ধির এই দ্রুত হার মূলত তিনটি নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত: (ক) নগরীয় লোকবৃদ্ধির স্বাভাবিক উচ্চ হার বা প্রাকৃতিক বৃদ্ধি; (খ) নগরের সংজ্ঞা পরিবর্তন, পুরাতন নগরের পরিসীমা বৃদ্ধি, নতুন নগর সৃষ্টি বা পুনঃশ্রেণীবিন্যাস (Reclassification); (গ) অভ্যন্তরীণ অভিবাসন (Internal Migration)।

সারণি ০২

বাংলাদেশের লোকসংখ্যার বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার (নগর, গ্রাম ও জাতীয় পর্যায়)

সময়কাল	নগর	গ্রাম	জাতীয়
১৯৭০-১৯৭৫	৬.৭৪	২.৪১	২.৭৭
১৯৭৫-১৯৮০	৬.৭৬	----	২.৮৩
১৯৮০-১৯৮৫	৬.৫৭	২.১৯	২.৭৩
১৯৮৫-১৯৯০	৬.৮৩	----	২.৭৯
১৯৯০-১৯৯৫	৬.১৪	১.৯৩	২.৬৯
২০০০-২০০৫	৫.৩৭	১.৪৮	২.৪৪
২০১০-২০১৫	৪.০৯	০.৫৩	১.৬৭
২০২০-২০২৫	৩.৩১	০.০৩	১.১৩

উৎস: Abul Barakat and Shahida Akhter "A Mushrooming Population: The Threat of Slumization Instead of Urbanization in Bangladesh", *Harvard Asia Pacific Review*, Volume 5, Issue 1, Winter 2001, p. 27.

বাংলাদেশে ১৯৬০ সালে মোট নগরায়ণের ৫৮.৬% সংঘটিত হয়েছিল অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও পুনঃশ্রেণীবিন্যাসের ফলে এবং পরবর্তী দশ বছরে এই হার দাঁড়ায় ৬৬% (Barakat, 27)। ১৯৭০ সালের পর হতে প্রাকৃতিক বৃদ্ধির অংশ বাড়লেও, ২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট নগরীয় লোকবৃদ্ধির তিন-পঞ্চমাংশ নিয়ন্ত্রিত হবে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন দ্বারা (Barakat, 27)। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও পুনঃশ্রেণীবিন্যাসের কারণে বাংলাদেশের সার্বিক নগরীয় লোকবৃদ্ধি গ্রামীণ লোকবৃদ্ধি অপেক্ষা অনেক বেশি, যদিও গ্রামীণ প্রাকৃতিক লোকবৃদ্ধির হার নগরীয় প্রাকৃতিক লোকবৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি। নিম্নের উপাত্ত হতে বিষয়টি স্পষ্ট হবে:

সারণি০৩

লোকসংখ্যার বার্ষিক প্রাকৃতিক বৃদ্ধির হার (নগর, গ্রাম ও জাতীয় পর্যায়)

এলাকা	১৯৯৩	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
নগর	১.৪৯	১.৩৮	১.২৭	১.২৫	১.২০	১.১৮
গ্রাম	১.৯৫	১.৯৮	১.৯৫	১.৮০	১.৮০	১.৭৭
জাতীয় পর্যায়	১.৮৮	১.৮৮	১.৮১	১.৭৫	১.৫৫	১.৫০

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০০০*, পৃ. ১৪০।

সারণি ০৪

গ্রাম ও শহরে লোকবৃদ্ধির তুলনা (১৯৯১-২০০১)

এলাকা	আদমশুমারি- ২০০১	আদমশুমারি- ১৯৯১	পরিবর্তনের হার (%)
নগর	২,৮৮,০৮,৪৭৭	২,০৮,৭২,২০৪	৩৮.০২
গ্রাম	৯,৪৩,৪২,৭৬৯	৮,৫৪,৪২,৭৮৮	১০.৪২
মোট	১২,৩১,৫১,২৪৬	১০,৬৩,১৪,৯৯২	১৫.৮৪

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *প্রাথমিক রিপোর্ট আদমশুমারি ২০০১*, পৃ. ৬

উপরের উপাত্ত হতে স্পষ্ট, নগরীয় প্রাকৃতিক লোকবৃদ্ধির হার গ্রাম ও জাতীয় পর্যায় হতে কম হওয়া সত্ত্বেও মাত্র এক দশকে (১৯৯১-২০০১) নগরীয় লোকসংখ্যা বেড়েছে ৩৮.০২%, যা গ্রামীণ লোকবৃদ্ধির হারের সাড়ে তিন গুণ অপেক্ষা বেশি। পাশ্চাত্যে স্বাভাবিক শিল্পায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে নগরীয় লোকবৃদ্ধি ও নাগরিক সুবিধাদির সম্প্রসারণ ঘটলেও বাংলাদেশে এই নগরীয় লোকবৃদ্ধি স্বাভাবিক নগরায়ণ প্রক্রিয়া প্রসূত নয়। ফলে নগরীয় লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে আনুষঙ্গিক নাগরিক সুবিধাদির সম্প্রসারণ হয়নি। তাই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নগরায়ণ ব্যাপক নগরীয় দারিদ্র্য এবং তার অনুষঙ্গী বস্তির বিস্তার ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশে নগরায়ণের এই বিশেষ ধারাকে বারকাত চিহ্নিত করেছেন Slumization বা Ruralization of Urban Life হিসেবে। বাংলাদেশে গ্রাম হতে নগরে অভিবাসনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ Push Factor ও নগরীয় Pull factor মুখ্য ভূমিকা রাখে এবং এখানে Capital-push Factor কার্যকর নয় যা স্বাভাবিক নিয়মে নগর কাঠামোর পরিবৃদ্ধি ঘটায়।

সারণি ০৫

বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের প্রবণতা

অভিবাসনের প্রবণতা	অভিবাসনের হার (%)
নগর হতে গ্রাম	১.১০
গ্রাম হতে গ্রাম	৩.৪২
মোট গ্রামমুখী স্থানান্তর	**৪.৫২**
গ্রাম হতে নগর	৫১.৮০
নগর হতে নগর	৪.৩৬
মোট নগর মুখী স্থানান্তর	**৫৬.১৬**

উৎস: : Abul Barakat and Shahida Akhter, Op., cit., p-28

উপরের উপাত্তে দেখা যায় বাংলাদেশে গ্রাম হতে নগরমুখী অভিবাসন ৫১.৮০% এবং নগর হতে নগরে অভিবাসন ৪.৩৬% অর্থাৎ মোট নগরমুখী অভিবাসন ৫৬.১৬%। অন্যদিকে মোট গ্রামমুখী

অভিবাসন মাত্র ৪.৫২%। মূলত অর্থনৈতিক কারণেই গ্রাম হতে এই বিপুল জনগোষ্ঠী নগরে অভিবাসী হয়। বারকাত ও আখতার তাঁদের গবেষণায় দেখান যে ২৪% অভিবাসী ভালো চাকুরির জন্য; ২৩% অভিবাসী গ্রামে কাজ না পেয়ে; ১৫% বদলিযোগ্য কাজের সন্ধানে; ১০.৬% আত্মীয়তার সম্পর্কে; ২.৮% পরিবারকে সাহায্য করার মানসে; এবং ১.৭% নদী ভাঙনের কারণে নগরে অভিবাসন করে (Barakat, 28)। স্পষ্টতই, নগরে স্রোতের মতো অভিবাসনের মূল কারণ অর্থনৈতিক এবং এই অভিবাসীদের বেশিরভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিনিয়োজিত হয়। মোদ্দা কথা, নগরে বিশাল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বিকশিত হচ্ছে এবং এ খাতে কর্মরতদের মাহবুব আহমেদ যথার্থই চিত্রিত করেছেন Underclass বা Protoproletariat হিসেবে। বিশ্ব ব্যাংক সম্প্রতি এই Underclass প্রত্যয়টিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। Sanjay Lall এর ভাষায়: "In many poor countries there is also a large underclass of microenterprises that ekes out a bare survival" (World Bank 2002b: 158).

সারণি ০৬

বাংলাদেশে নগরীয় লোকবৃদ্ধি (১৮৯১- ২০০১)

শুমারী বর্ষ	নগরীয় লোকসংখ্যা (হাজারে)	গ্রামীণ লোকসংখ্যা (হাজারে)	মোট লোকসংখ্যা (হাজারে)	নগরীয় লোকসংখ্যার শতকরা হার %
১৮৯১	৫৩৭	২৪১৪৩	২৪৬৬৫	২.১৮
১৯০১	৬২৯	২৫৬৪৪	২৬২৭৩	২.৩৯
১৯১১	৬২৮	২৭৮৮৯	২৮৫১৭	২.২০
১৯২১	৭১৬	২৯১৩৬	২৯৮৪২	২.৩১
১৯৩১	১১২৬	৩৪৮৯২	৩৬৬৯০	৩.০৬
১৯৪১	১৩৪৫	৩৭৪৪০	৩৯৭৮৫	৩.৩৮
১৯৫১	১৮২৬	৪০১১২	৪১৯৩২	৪.৩৪
১৯৬১	২৬৪১	৪৮২০৯	৫০৮৩৯	৫.১৯
১৯৭৪	৬২৭৩	৬৫২০৫	৭১৪৭৮	৮.৭৮
১৯৮১	১৩২২৮	৭৩৮৯২	৮৭১২০	১৫.১৮
১৯৯১	২০৮৭২	৮৫৪৪৩	১০৬৩১৫	১৯.৬৩
২০০১	২৮৮০৮	৯৪৩৪৩	১২৩১৫১	২৩.৩৯

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ*-১৯৯২, পৃ- ৬২-৬৩; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *প্রাথমিক রিপোর্ট* আদমশুমারি ২০০১, পৃ.- ৬।

সারণি ৬ বাংলাদেশে গত ১১০ বছরে মোট জন সংখ্যার মধ্যে নগরীয় লোক সংখ্যার অংশকে স্পষ্ট করে দেখাচ্ছে। যেহেতু অভিবাসী বিপুল জনগোষ্ঠী মূলত গরিব তাই বাংলাদেশের নগর ক্রমশ গ্রামীণ দরিদ্রদের চারণ ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। গ্রামীণ 'পুশ ফ্যাক্টর' আর নগরীয় 'পুল ফ্যাক্টরের' মিথস্ক্রিয়ায় নগর পরিণত হচ্ছে কর্মসন্ধানী কোটি মানুষের আবাসস্থল বস্তির নগরীতে। বস্তির ভয়াবহ বিস্তার ও মানবেতর জীবনাচরণের অপ্রতিহত ধারাকে বুকে ধারণ করে যে নগরায়ণ সাম্প্রতিক বাংলাদেশে দৃশ্যমান হচ্ছে তার বিশ্লেষণে বারকাত ও আখতার ব্যবহার করেছেন বস্তিয়ায়ন (Slumization) প্রত্যয়টি। সহজ ভাষায় গ্রামীণ হতদরিদ্র মানুষের এই ব্যাপক অভিবাসন নগরে গ্রামীণ দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতার বিস্তৃতি ঘটায়। এই প্রক্রিয়াকে বারকাত ও আখতার বলেছেন গ্রামিণীকরণ (Ruralization), যেখানে নগরে আগত নবীন অভিবাসীরা তাদের গ্রামীণ ঐতিহ্য আর কর্মকাণ্ডের

শেকড় উপড়ে ফেলতে পারে না; ফলশ্রুতিতে নাগরিক জীবনের কাঠিন্যের মধ্যে এক ভয়াবহ বঞ্চনার জগতে বাস করতে বাধ্য হয় লাখো অভিবাসী। নগরায়ণের অভিক্ষেপ হতে দেখা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নগরীয় লোকসংখ্যার ৫০%-ই হবে বস্তিবাসী (Barakat, ২৯)। এই বস্তি বাসীদের সিংহভাগেরই কর্মক্ষেত্র শহরের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত যেখানে দীর্ঘ শ্রমঘণ্টা, নিম্ন বেতন, কাজের অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা নিত্যসঙ্গী। নগর জীবনের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত তাই এক অর্থে Un-urbanized খাত এবং এখানে Under-employment-এর আধিক্য রয়েছে। বস্তিবাসীদের জন্য ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বা প্রয়াস অত্যন্ত কম। বস্তিতে বিদ্যমান শিশুমৃত্যু হার, শিক্ষার হার, প্রত্যাশিত গড় আয়ু, স্বাস্থ্য ও পয়ঃসুবিধা, নিরাপত্তা ইত্যাদির নিরিখে বস্তি র জীবন এক ধরনের নারকীয় জীবন। সংগত কারণেই বারকাত মনে করেন বাংলাদেশে নগরায়ণ নয়, বস্তি-আয়ন হচ্ছে। বারকাতের ভাষায়:

> কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে কৃষি নির্ভর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ভিক্ষুকায়ন ও নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। নিঃস্বায়িত কৃষক বাধ্য হয়ে অভিবাসিত হয়েছেন-এসেছেন শহরে, প্রথমে একা, আস্তে আস্তে এনেছেন পরিবার পরিজন। এদিকে শহরে গড়ে ওঠেনি কলকারখানা। অতএব গ্রাম থেকে শহরে আসা নিঃস্ব কৃষককে কাজের সন্ধানে ইনফর্মাল সেক্টরে নিম্ন মজুরীর কাজে যোগ দিতে হয়েছে আর বাসের জন্য বেছে নিতে হয়েছে বস্তি। সুতরাং তথাকথিত নগরায়ণ আসলে কিছুই নয়, এটা আক্ষরিক অর্থেই বস্তি-আয়ন (বারকাত ২০০৩: ৯)।

সারণি ০৭

নগরায়ণের ধারা ও জনসংখ্যার অভিক্ষেপ (১৯৫১-২০১৫)

বৎসর	জাতীয় জনসংখ্যা		নগরীয় জনসংখ্যা		
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)	সংখ্যা (মিলিয়ন)	মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯৫১	৪৪.১৭	০.৫১	১.৮৩	৪.১৪	--
১৯৬১	৫৫.২২	২.২৬	২.৬৪	৪.৭৮	৩.৭৪
১৯৭৪	৭৬.৩৭	২.৫৩	৬.০০	৭.৮৬	৬.৫২
১৯৮১	৮৯.৯১	২.৩৬	১৩.৫৬	১৫.০৮	১০.৯৭
১৯৯১	১১১.৪৫	২.১৭	২২.৪৫	২০.১৪	৫.১৭
২০০৫ (প্রক্ষেপিত)	১৫৫.৮০	২.০৮	৪৬.৪০	২৯.৭৮	৪.৬৭
২০১৫ (প্রক্ষেপিত)	১৮৪.৬০	১.৭১	৬৭.৯০	৩৬.৭৮	৩.৮৮

উৎস: নজরুল ইসলাম ও আবদুল বাকী (সম্পাদিত), *নগরায়ণে বাংলাদেশ*, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢা.বি., ২০০২, পৃ-১৩

বাংলাদেশে নগরীয় লোকবৃদ্ধি, নগরায়ণের ধারা ও জনসংখ্যার অভিক্ষেপ হতে প্রতীয়মান হয় যে একবিংশ শতাব্দীতে নগরায়ণ এবং নগর সংক্রান্ত সমস্যা ও পরিবর্তনসমূহ বাংলাদেশের সামনে ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। নতুন শতাব্দীতে নগরায়ণ বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা, প্রবণতা ও অনুষঙ্গ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। নগরীয় লোকসংখ্যার ঘনত্ব, লোকবসতির মাত্রা, সামাজিক বৈচিত্র্য ইত্যাদির নিরিখে বাংলাদেশে নগরায়ণের নতুন প্রবণতা সুস্পষ্ট। এই নগরায়ণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের বক্তব্য প্রযোজ্য:

> The Growth of urban poverty in many countries, evidenced especially by the increase in populations residing in extremely poor environmental conditions, is partly a reflection of the pressures on limited city resources (World Bank 2003: 114).

৬. বাংলাদেশের নগরীয় জীবনের সমস্যা

বাংলাদেশে নগরায়ণ শিল্পায়ন সম্ভূত নয় এবং এই নগরায়ণ নগরে বেকারত্ব, আবাসন সমস্যা, পয়ঃনিষ্কাশন, পানি সরবরাহ, অতি জনসংখ্যা, যাতায়ত সমস্যা, পরিবেশগত সমস্যা, দারিদ্র্য ইত্যাদি বহুমাত্রিক সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। ঢাকা মহানগরে নতুন একটি সংকট হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রতুলতা ও দুর্যোগের সম্ভাব্য ভয়াবহতা। জাতিসংঘ প্রণীত 'ভূমিকম্প বিপর্যয়ের ঝুঁকি সূচক' (Earth-Quake Disaster Risk Index) অনুযায়ী পৃথিবীর সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিশটি নগরের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ঢাকা (*প্রথম আলো* ১৮ আগস্ট, ২০০৩)। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা কিংবা জরুরি পরিষেবা (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন) প্রদানের ক্ষেত্রে ঢাকার অবস্থান অত্যন্ত নিচু স্তরে।

বাংলাদেশে নগরায়ণের মাত্রা ২৫% এর কম হলেও মোট নগরীয় লোকসংখ্যার আকার বিশাল। সামগ্রিক বাংলাদেশের মতই নগর এলাকার রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে দারিদ্র্যের বিস্তৃতি। বাংলাদেশে নগরীয় দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সম্পদের অসম বণ্টন গ্রাম অপেক্ষা নগরে অনেক বেশি। বাংলাদেশের নগরীয় লোকসংখ্যার নিচের দিকের ৪০% মোট আয়ের সর্বোচ্চ ২০% এর অংশীদার, অন্যদিকে নগরের ১০% উচ্চবিত্ত ১০% অতিদরিদ্র হতে ১০ গুণ বেশি আয় ভোগ করে (Barakat, 28)। নগরে দরিদ্র লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ছে বস্তি এবং এই বস্তি এলাকায় আবাসন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির অবস্থা সার্বিকভাবে গ্রামের চেয়ে খারাপ। বস্তুত বাংলাদেশের বিপুল নগরবাসীই বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা হতে বঞ্চিত; যেমন, ঢাকা মহানগরীর দৈনিক পানি চাহিদা যেখানে ১৬০ কোটি লিটার, সেখানে ঢাকা ওয়াসার উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০ কোটি লিটার (ইসলাম ২০০৩: ১১)। জাতিসংঘের Millennium Development Goals অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের মাত্রা অর্ধেকে নামিয়ে আনা হবে। ২০০০ সালে ক্যালরি গ্রহণ ভিত্তিতে নগরে অনপেক্ষ দারিদ্র্য ছিল ৫২.৫০% এবং চরম দারিদ্র্য ছিল ২৫.০২% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১২৭)। ২০১৫ সালে নগরীয় লোকসংখ্যা ৬৭.৯০ মিলিয়ন (সারণি ৭) হলে এই লোকসংখ্যার ৫২.৫০% অর্থাৎ ৩৫.৬৫ মিলিয়নই হবে অনপেক্ষ দরিদ্র। যদি জাতিসংঘের পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবে নগরীয় দারিদ্র্য অর্ধেক হ্রাস করা সম্ভবও হয়, তবুও ২০১৫ সালে বাংলাদেশে নগরীয় দরিদ্র লোকসংখ্যা হবে প্রায় ১৮ মিলিয়ন।

সারণি ০৮

ক্যালরি গ্রহণ ভিত্তিক অনপেক্ষ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%)

দারিদ্রের ধরন		১৯৮৩-৮৪	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৮-৮৯	১৯৯১-৯২	৯৯৫-৯৬	২০০০
অনপেক্ষ দারিদ্র	জাতীয়	৬২.৬০	৫৫.৬৫	৪৭.৭৫	৪৭.৫২	৪৭.৫৩	৪৪.৩৩
	পল্লী	৬১.৯৪	৫৪.৬৫	৪৭.৭৭	৪৭.৬৪	৪৭.১১	৪২.২৮
	শহর	৬৭.৭০	৬২.৫৫	৪৭.৬৩	৪৬.৭০	৪৯.৬৭	৫২.৫০
চরম দারিদ্র	জাতীয়	৩৬.৭৫	২৬.৮৬	২৮.৩৬	২৮.০০	২৫.০৬	১৯.৯৮
	পল্লী	৩৬.৬৬	২৬.৩১	২৮.৬৪	২৮.২৭	২৪.৬২	১৮.৭২
	শহর	৩৭.৪২	৩০.৬৭	২৬.৩৮	২৬.২৫	২৭.২৭	২৫.০২

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ- ১২৭

সারণি ০৯

মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ

জরিপ বর্ষ	জাতীয়	পল্লী	শহর
২০০০	২২৪০.৩	২২৬৩.২	২১৫০.০
১৯৯৫-৯৬	২২৫৪.০	২২৬৩.১	২২০৮.১
১৯৯১-৯২	২২৬৬	২২৬৭	২২৫৮
১৯৮৮-৮৯	২২১৫	২২১৭	২১৮৩
১৯৮৫-৮৬	২১৯১	২২০৩	২১০৭

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩*,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১২৭

সত্যিকার অর্থে, বাংলাদেশে নগরীয় দারিদ্র্য গ্রামীণ দারিদ্র্য অপেক্ষা ভয়াবহ। অধিকন্তু বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানও উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণের ফলে মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ বা মৌলিক সেবাসমূহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নগরের দরিদ্ররাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। দরিদ্রদের আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় বা ন্যূনতম নাগরিক সুবিধার নিশ্চয়তা না থাকায় নগরীর এই বিপুল অসংগঠিত জনগোষ্ঠী Protoproletariat বা Underclass হিসেবেই টিকে আছে। তাই পরিবেশ দূষণ, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ সর্বক্ষেত্রে নগরীয় দরিদ্ররাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭. উপসংহার

এটা অনস্বীকার্য যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহের নগরায়ণের ধারা এবং পাশ্চাত্যের শিল্পায়িত দেশসমূহের নগরায়ণের ধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশে নগরায়ণের মূলে প্রধানত দুটো কারণ ক্রিয়াশীল: (ক) গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাঙন—'পুশ ফ্যাক্টর'; (খ) নগরের সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণ—'পুল ফ্যাক্টর'। বাংলাদেশে নগরমুখী অভিবাসনের হার গ্রামমুখী অভিবাসনের হার অপেক্ষা বহুগুণ বেশি। ফলে নগর পরিণত হচ্ছে অসংখ্য ঘিঞ্জি বস্তির লোকালয়ে। ২০১৫ সালে বিশ্বের দশটি সর্বাধিক লোকবহুল মহানগরীর আটটিই তৃতীয় বিশ্বে তথা এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে অবস্থান করবে। কারণ এসব অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি আর পূর্বের মতো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারছে না। অধিকন্তু নগরে শিল্পায়নের শ্লথ গতি ও নির্ভরশীল ধারা নগরের নয়া অভিবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছে না। ফলশ্রুতিতে নগরে বেকারত্ব ছদ্মবেকারত্ব ও under-employment বাড়ছে। তাই দেখা যায় বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ঢাকা, মুম্বাই, কলকাতা ও করাচি নগরী ২০১৫ সালের বিশ্ব নগরায়ণ মানচিত্রে আবির্ভূত হচ্ছে কোটি মানুষের মানবেতর নারকীয় জীবনযাত্রাকে বুকে ধারণ করা মেগাসিটি হিসেবে। ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা-বঞ্চিত এই কথিত নগরবাসীদের জন্য রাষ্ট্রের প্রস্তুতি, সম্পদের সঞ্চয়ন, রাজনৈতিক অঙ্গীকার বা সামাজিক প্রণোদনা কোনো কিছুই বাংলাদেশে

দৃশ্যমান নয়। আগামী এক দশকের মধ্যেই এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে চলেছে বাংলাদেশ, যার লক্ষণসমূহ ইতোমধ্যে পরিস্ফুট হতে শুরু করেছে। নগরবাসীদের জন্য আবাসন, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, পয়ঃনিষ্কাশন সহ জরুরি নাগরিক পরিষেবা অব্যাহত রাখা; নিরাপত্তা, পরিবেশ দূষণ রোধ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলেও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কোনো প্রস্তুতি নেই বললেই চলে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে অসম ও বিকৃত নগরায়ণই বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, A I Mahbub Uddin 1997: "Dependent Urbanization and Protoproletariat: A Case Study of Urban Informal Sector of Bangladesh", Presented at the First International Seminar of 'Bangladesh Sociological Association' in Dhaka (November 20, 1997)

Ahmed, A I Mahbub Uddin Undated: "Third World Urbanization and Social Conflicts: A Case Study of Dhaka City", Presented at a Seminar in Dhaka

Barakat, Abul and Akhter, Shahida, 2001: "A Mushrooming Population: The Threat of Slumization Instead of Urbanization in Bangladesh", in *Harvard Asia Pacific Review*, Volume 5, Issue 1 (Winter), pp.27-30

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics) 1993: *Statistical Yearbook of Bangladesh-1992*, Dhaka, Bangladesh

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics) 2001: *Preliminary Report Population Census 2001*, Dhaka, Bangladesh

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics) 2002: *Statistical Pocketbook of Bangladesh-2000*, Dhaka, Bangladesh

Drakakis-Smith, David 1992: *The Third World City*, Routledge, London

World Bank April 2002a: *World Development Indicators-2002*, Washington DC, USA

World Bank June 2002b: *Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region*, Samiha Fawzy (Editor), Washington DC, USA

World Bank 2003: *Sustainable Development in a Dynamic World* (World Development Report 2003), Oxford University Press, New York, USA

ইসলাম, নজরুল ২০০২: "বাংলাদেশে নগরায়ণ: সাম্প্রতিক ধারা", *নগরায়ণে বাংলাদেশ*, ইসলাম, নজরুল ও বাকী, আবদুল (সম্পাদিত), ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম, নজরুল ২০০৩: "শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা", দৈনিক প্রথম আলো, ৬ অক্টোবর, ২০০৩, পৃ- ১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৩: *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩*, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

দৈনিক প্রথম আলো, ১০ জুন ও ১৮ আগস্ট, ২০০৩, ঢাকা

বারকাত, আবুল ২০০৩: "বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চালচিত্র: কোথায় যেতে হবে, কোথায় যাচ্ছি?", ০২ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে এফ বি সি সি আই ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ঢাকা, বাংলাদেশ

সেন, রংগলাল, ২০০৩: *প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান*; নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, [Cited from Queen and Carpenter 1953: *The American City*]

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বাংলার সমাজ-চেতনা

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম*

Abstract: Bengali Press played a unique part in the Bengal Renaissance in the nineteenth century. Indeed, Iswer Chandra Gupta seems to have realized that the best way of reaching the public and influencing public opinion was through a newspaper. This study focuses on Guptas performance in the *Sambad Probhakar* in terms of addressing social, political and economic issues. It can be plainly observed that *Sambad Probhakar* was quite radical in its principles, and in its spirit of criticism, and its editorial department is wealthy in ability, its resources of intelligence are extensive, its correspondents on all public questions numerous and often talented and its costume is highly respectable.

১. ভূমিকা

সাংবাদিকতা এবং জনমত পরস্পর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয় একটি অপরটির পরিপূরক।[১] জনমত গঠনে সংবাদপত্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বলা যেতে পারে, জনমতের উদ্ভব এবং বিকাশের পথানুসরণ করেই গড়ে ওঠে সাংবাদিকতার ইতিহাস।[২] একটি দেশের সমাজ উন্নয়ন ও রাজনীতি অনেকাংশে নির্ভর করে ওই দেশের সংবাদপত্র কি ভূমিকা পালন করছে তার উপর। আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাঁর *অতীত দিনের স্মৃতি* নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন:

> সংবাদ সাহিত্যের প্রচারের ফলে এখন দল ভাঙ্গে গড়ে, নেতৃত্বের হয় উত্থান-পতন, দেশ জাতি-সম্প্রদায়ের প্রবক্তাদের কথা সর্বত্র প্রসার লাভ করে। এমন কি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও এখন এর উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। কাজেই একে যে রাষ্ট্রের চতুর্থ শক্তি বলা হয়, তা অযথার্থ নয়।[৩]

এম ভি চার্নলি বলেছেন, সংবাদ হলো আজকের মোড়কে দেওয়া আগামী দিনের ইতিহাস।[৪] উনিশ শতকে বাংলায় যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল তাতে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সংবাদপত্রের সূচনালগ্নে ইংরেজদের কর্তৃত্ব থাকলেও পরবর্তী সময়ে বাংলার বিদ্বৎসমাজ সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলার সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার আলোকে মূল্যায়ন করেছে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের চেতনা নিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুসারীরা। তাঁরা শ্রীরামপুরের ইউরোপীয় মিশনারীদের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত *দিগ্‌দর্শন* পত্রিকার অব্যবহিত পর পরই *বঙ্গাল গেজেটি* প্রকাশের উদ্যোগ নেন। বাংলা ভাষায়

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (রাজশাহী: মিত্র সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৮), পৃ. ৪।

[২] *তদেব*, পৃ. ৪-৫।

[৩] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৬৮), পৃ. ৩৯-৪০।

[৪] উদ্ধৃত: পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *সংবাদবিদ্যা* (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৪),পৃ. ১৮৩।

দিগ্‌দর্শন প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এবং এর পর পরই *বঙ্গাল গেজেটি* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়ের অনুপ্রেরণায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য *বঙ্গাল গেজেটি* পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। তবে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার সদস্য ও তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হরচন্দ্র রায়। *বঙ্গাল গেজেটি* প্রতি শুক্রবার নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকলেও পত্রিকাটি এক বছরের বেশি সময় প্রকাশিত হতে পারেনি। অবশ্য *সমাচার দর্পণ* ও *বঙ্গাল গেজেটি* পত্রিকার মধ্যে কোনটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সে বিষয়ে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করে থাকেন।[৫] একথা অনস্বীকার্য যে, উনিশ শতকের প্রথম পর্বে বাংলায় রামমোহনের ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং একই সময়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন বাংলার সমাজ জীবনে লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকে যাঁরা বাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে প্রজ্ঞা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭- ১৮৪৮), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২ -১৮৫৯), কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-১৮৯৬) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সংবাদ প্রভাকর

উনিশ শতকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও সমাজ পুনর্গঠনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের কাঁচড়াপাড়ার শিয়ালডাঙায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ না হলেও সংস্কৃত বেদান্ত দর্শন, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের (১৮০৬ -৬৭) আনুকূল্যে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি তারিখে সাপ্তাহিক *সংবাদ প্রভাকর* প্রকাশ করেন।[৬] ব্রিটিশ সরকারের কাছে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি চেয়ে যে আবেদন করেছিলেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

To
G. A. Bushby Esq.
Officiating Secretary to Government in the General Department.

Sir,
I have the honour to enclose in original an affidait by me on a solemn declaration before Mr. A.S.L. McMohan one of the Magistrates for the Town of Calcutta and to request that I may be permitted under the authority of the Right Hon'ble the Governor General in Council with a Licence authorizing me to print in the Bengallee Languages entitled the *Sambad Provakur*.

I have the honour to be
Sir
Yours most obedient Servant
Iser Chunder Gooptoo

Calcutta
The 7 Jan 1831

[তথ্যসূত্র: বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১৮৪০-১৯০৫*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২) পৃ. ২১।]

---

[৫] A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas & Social Change in Bengal (1818-1835)* (Leiden: E.J. Bril, 1965), pp. 84-85.

[৬] শামসুজ্জামান খান প্রমুখ সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৪৯।

সংবাদ প্রভাকর প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, পরে বারত্রয়িক, সবশেষে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন তারিখে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। ক্রমান্বয়ে এটি পাঠক মহলে নন্দিত হয়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় এর গ্রাহক সংখ্যার তালিকা থেকে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে *সংবাদ প্রভাকরের* গ্রাহক সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশি। ওই সময়ে *সংবাদ প্রভাকরের* বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রতিমাসে মাসিক সংখ্যা প্রকাশিত হতো। এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল মাসের সমস্ত ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হতো। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মাসের সমস্ত ঘটনা বা সংবাদের সারমর্ম সংকলিত হয়ে *সংবাদ প্রভাকর* আত্মপ্রকাশ করে, যাকে মাসিক *প্রভাকর* বললেও ভুল হবে না।[৭] *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর। বলা বাহুল্য, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে ঈশ্বরচন্দ্র সাময়িক অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং *সংবাদ প্রভাকর* প্রকাশে বিঘ্ন ঘটে।[৮] এ ছাড়াও অক্ষয় কুমার দত্ত *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন । পরে তিনি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* সম্পাদক নিযুক্ত হন। সম্ভবত *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা ছিল ভারতীয় পরিচালিত দ্বিতীয় দৈনিক সংবাদপত্র।[৯] ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে নবীন ও প্রবীণ ব্যক্তিদের লেখার কারণে *সংবাদ প্রভাকর* খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম বয়সের অনেক রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১০] *সংবাদ প্রভাকরের* সাথে মীর মশাররফ হোসেনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল । *সংবাদ প্রভাকরে* স্থানীয় সংবাদ লিখে বাংলা রচনায় মীর মশাররফের হাতেখড়ি হয়।[১১] এ ছাড়াও *সংবাদ প্রভাকরের* সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন কবিদের অনেক অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত পত্রিকার মাসিক সংখ্যাতে প্রকাশ করতেন। তিনি এ কাজে অগ্রসর না হলে বোধ হয় এ সকল কবিদের রচনার কোন অস্তিত্বই থাকত না।[১২]

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা অবশ্য তরুণ প্রগতিবাদীদের মনে নতুন কোনো আশার সঞ্চার করতে পারেনি। বিনয় ঘোষের মতে, 'ধর্ম সভার মুখপত্র *সমাচার চন্দ্রিকার* ঠিক প্রতিধ্বনি *প্রভাকর* না হলেও, কার্যক্ষেত্রে কিছুটা তারই সহযাত্রীর ভূমিকায় তাকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। সমাজের সমস্ত গতিপ্রকৃতি বিচার করে কোন স্থির মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা গুপ্ত কবির পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি।'[১৩] তবে উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে *প্রভাকর* স্বতন্ত্র উদারপন্থী হিন্দু মধ্যবিত্তের মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিনয় ঘোষ বলেছেন, 'সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে *প্রভাকরকে* উদার মধ্যপন্থী বলা যেতে পারে।'[১৪] ভবতোষ দত্তও প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, 'সেকালে *সংবাদ প্রভাকরের* মতো উদারপন্থী পত্রিকাই সাধারণ লোক সমাজের কাছে আধুনিক মত ও আদর্শকে সহজবোধ্য রূপে পরিবেশন করেছিল।'[১৫] *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকাতে বঙ্গভাষা অনুশীলনের

---

[৭] কৃষ্ণ ধর ও মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *বাংলার কজন সেরা সাংবাদিক* (কলিকাতা: গণ মাধ্যম কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩), পৃ. ৪৫।

[৮] *তদেব*, পৃ. ৪৪।

[৯] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স, ১৯৯৬), পৃ. ৪৫৯।

[১০] *তদেব*, পৃ. ৪৫৯।

[১১] ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২২২।

[১২] মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৯।

[১৩] বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১৮৪০-১৯০৫*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২), পৃ. ২৭।

[১৪] *তদেব*, পৃ. ২৮।

[১৫] ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিতা* (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা,১৯৬৮), পৃ. ৬৯।

প্রয়োজনীয়তা, বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উপায় নির্ধারণ, নীলকরদের অত্যাচারের সংবাদ পরিবেশন, বাঙালিকে স্বাধীন বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান, শিক্ষিত বাঙালির চাকরি সমস্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলো নিয়মিত আলোচিত হয়েছিল। বস্তুত এর মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে।[১৬] *সংবাদ প্রভাকর* কতটা জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ২৩ তারিখের সংখ্যা থেকে। ওই সংখ্যায় *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার উপর এক পর্যালোচনামূলক চিঠি প্রকাশিত হয়। 'কস্যচিৎ প্রভাকর হিতেচ্ছু জনস্য' নামে প্রকাশিত ওই ব্যক্তির চিঠিতে বলা হয়েছিল:

> অদ্যাবধি এদেশে যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আপনকার পত্রের ন্যায় আদর ও গৌরব অন্য কোন পত্রেরই হয় নাই তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে, আপনার দৈব শক্তির বিলক্ষণ আছে এবং আপনকার পাঠক ও বিজ্ঞ লেখক মণ্ডলীও আহলাদ ও উৎসাহপূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধাদি দ্বারা পত্রভূষিত করেন, কাযেই সকল দিক বজায় ছিল।[১৭]

১.০. নারী শিক্ষা ও *সংবাদ প্রভাকর*

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ড্রিংকওয়াটার বেথুন কর্তৃক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল বাংলার নারী শিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বেথুন কলেজকে কেন্দ্র করে বাংলায় নারী শিক্ষার বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ছিল ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর ত্রিশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। তদানীন্তন ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন সচিব জন ইলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন (১৮৩০-৫১) এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি কয়েকজন নারী শিক্ষানুরাগীর সহযোগিতাও পেয়েছিলেন। লর্ড ডালহৌসিকে লেখা চিঠিতে এঁদের সহযোগিতার কথা বেথুন উল্লেখ করেন:

> The three natives to whom I desire especially to record my gratitude for their assistance are Baboo Ram Gopal Ghose, the well-known merchant who was my principal adviser in the first instance and who procured me first pupils. Baboo Dukkhhina Runjan Mookerje, a Jamindar... and Pandit Madan Mohan Turkalunkar, one of the Pundits of the Sanskrit College[18]

তিনি কলকাতার ৫৬ সুকিয়া স্ট্রীটে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে বিদ্যালয়টি চালু করেছিলেন। মাত্র ২১ জন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টি শুরু হলেও প্রতিষ্ঠালগ্নে এর উল্লেখযোগ্য ছাত্রী ছিলেন মদন মোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা। ভিত্তি প্রস্তরে বিদ্যালয়টিকে 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' নামে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু শুরুতে এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল একাধিক অর্থাৎ ক্যালকাটা হিন্দু ফিমেল স্কুল, ভিক্টোরিয়া ফিমেল স্কুল, নেটিভ ফিমেল স্কুল ইত্যাদি। তবে বেথুন স্কুল নামটি পরিচিত লাভ করে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর। এরপর ১৮৬২ - ৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার জনশিক্ষা রিপোর্টে প্রথম বেথুন স্কুল নামটি সরকারিভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। *সংবাদ প্রভাকরের* একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বেথুনের প্রয়াসকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রশংসা করেছেন।

---

[১৬] ধর ও ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

[১৭] *সংবাদ প্রভাকর*, ২৩ মে ১৮৫৭ উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।

[১৮] Bethune's letter to Dalhousie on 29 March, 1850, উদ্ধৃত: শ্যামলী সরকার, "নারী শিক্ষা ও জন ইলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার বেথুন: কিছু উপলব্ধি, কিছু ভাবনা", *বিশেষ ক্রোড়পত্র: ইতিহাসের আলোকে বাংলার নারী শিক্ষা* (কলিকাতা: বেথুন কলেজ, ২০০০), পৃ. ৪৩।

বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের ৬ তারিখের *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল:

> গত দিবস পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১০ ঘটিকার সময় শুকেস স্টীটে ৮ নম্বর বাটীতে শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রমানাথ লাহা প্রণীত বাঙ্গালা পাঠশালার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, ওই সময় আমরা উপস্থিত থাকিয়া দেখিলাম, মান্যবর মেং বেথুন সাহেব ও রেবরেন্ড মেং লাং সাহেব ও শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র শাহা প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক বিদ্যার্থিদিগ্যে গ্রহণ করেন,... শিক্ষা কৌন্সেলের বিচক্ষণ অধিপতি শ্রীযুত অনরেবেল জে ই ডি. বেথুন সাহেব এই নবীন পাঠশালার সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন,... অতএব কলিকাতা নগরে বঙ্গ ভাষার অনুশীলন নিমিত্ত এই প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, ইহার প্রতি দেশ হিতেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই বিহিত মনোযোগ ও যত্ন করা অতি আবশ্যক হইয়াছে।[১৯]

কিন্তু নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ওই সময় স্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের নিকট থেকে প্রচণ্ড বাধা আসে। এ ব্যাপারে একাধিক পত্রপত্রিকায় বাদানুবাদ চলতে থাকে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসের *লিটারারি ক্রনিক্‌ল* ও *সমাচার চন্দ্রিকা* পত্রিকাতে নারী শিক্ষার বিপক্ষে মত প্রচার করা হয়। এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকারের কথা স্বীকার করে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। *সংবাদ প্রভাকরের* ওই সম্পাদকীয়তে সুফল হয়েছিল। *সংবাদ প্রভাকর* বেথুনের উদ্যোগ যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করেন এবং নারী শিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকারও করেন। *লিটারারি ক্রনিক্‌লের* প্রত্যুত্তরে *সংবাদ প্রভাকর* লিখেছিল:

> ক্রোনিকেল সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষা হইলেই দেশের মঙ্গল দর্শে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাতে কোন দেশই সুন্দর অবস্থায় স্থাপিত হয় নাই, সহযোগী মহাশয়ের এই কথা স্বীকার করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষার যে মহতি গুণ তাহা হানি হইবার সম্ভাবনা, কারণ বিদ্যাশিক্ষা সমূহপ্রকারে উপকার দায়ক হইয়া থাকে বিদ্যা কদাচ অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হয় না, ...সহযোগী মহাশয়ের প্রবোধার্থ সারমাত্র লিখিয়াা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি কি অবলাদিগকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত রাখিয়া কেবল পুরুষদিগ্যে জ্ঞানালোক দেখাইবার অভিপ্রায় করেন? হায়! একি পক্ষপাত, কি অবিবেচনা ? এ কি প্রকার অযৌক্তিক পাঠক মহাশয়েরাই ইহার বিবেচনা করিবেন।[২০]

বাংলায় নারী শিক্ষা বিস্তারে বেথুন স্কুলের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই । তবে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ত্রিশ বছর পর অর্থাৎ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বেথুন কলেজের সূচনা হয়েছিল। এর ফলে বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতপক্ষে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কলেজের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৯-১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলেজ পরিদর্শকদের নিয়মিত যে প্রতিবেদনগুলি পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় যে কলেজ পরিসরে হোস্টেলের জন্য অতিরিক্ত স্থান সংকুলানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে বেথুন কলেজের ছাত্রী সংখ্যা প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রী সংখ্যা কমে যেতে থাকে। তবে এই দুঃসময় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । ১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বেথুন কলেজের ছাত্রী সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, এবং চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন বিষয়ে উচ্চতর পাঠক্রমও তৈরি হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুসারে সরকারি কলেজগুলির মধ্যে বেথুন কলেজের স্থান ছিল দ্বিতীয় এবং প্রথম স্থানে ছিল

---

[১৯] *সংবাদ প্রভাকর*, ৬ অগাস্ট ১৮৫০, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯।

[২০] *সংবাদ প্রভাকর*, ৭ অগাস্ট ১৮৫০, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০-২১।

প্রেসিডেন্সি কলেজ।[২১] অথচ বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্নে *সমাচার চন্দ্রিকা* পত্রিকার সম্পাদক বেথুন স্কুল সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। *সমাচার চন্দ্রিকার* মন্তব্যের কিছু কিছু অংশ সবিস্তারে *সংবাদপ্রভাকর* পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে উল্লেখ করা হয়:

> বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টি পথে পড়িলে অসৎ পুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা কি ছাগাদির শাবককে পশু বলিয়া দয়া করে, ধনবানদিগের কন্যারা পথিমধ্যে ভৃত্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া গমন করিলে তথাপি কৌমার হরণের ভয় আছে কেননা রক্ষকেরাই স্বয়ং ভক্ষক হইবেক ইত্যাদি... যাহারা উক্ত বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করেন তাঁহারা মান্য ও পবিত্র হিন্দু কুলোদ্ভব না হইবেন।[২২]

এর প্রতিবাদে *সংবাদ প্রভাকর* মন্তব্য করেছিল:

> যাহা হউক, এমত প্রাচীন পুরুষের কৌতুক রঙ্গ দেখিয়া আমাদেরও কৌতুক হইল, কিন্তু কালের ধর্ম্মেও সংপূর্ণ লয় হওয়া অসম্ভব। দাদা মহাশয় বয়সের বৈগুণ্যে অথবা রঙ্গরসের মত্ততাতে বিলক্ষণ হতচেতা হইয়াছেন, গত সংখ্যক পত্রেতে লেখেন যে "কএকজন নব্য হিন্দু স্বজাতীয় রীতিনীতি পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন" ফলে বালিকারদিগকে উপদেশ করিলে "স্বজাতীয় রীতিনীতি পরিবর্ত্তন " হয় না, বরঞ্চ প্রাচীন রীতিনীতি সংস্থাপনই হয়। পূর্ব্বতন মহর্ষিরা বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে নিষেধ করেন নাই, বরং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই দিয়াছেন। যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে। কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।[২৩]

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। বাংলায় নবজাগরণের ইতিহাসে হিন্দু কলেজের দান অবিস্মরণীয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজটি ছিল প্রাইভেট কলেজ এবং কতিপয় সমৃদ্ধিশালী হিন্দু তাঁদের স্বশ্রেণীর ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষালাভের সুবিধার্থে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে কলেজটির উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তদানীন্তন সরকার হিন্দু কলেজকে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ছাত্রের শিক্ষাদানের জন্য সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব করেন।[২৪] ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ কমিটির সর্বশেষ সভায় হিন্দু কলেজের পরিচালনারভার সরকারের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং হিন্দু কলেজের নতুন নামকরণ করা হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ।[২৫] কিন্তু *সংবাদ প্রভাকর* সহ অন্যান্য পত্রিকা এই বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের ২১ তারিখে 'হিন্দু কালেজ ও এজুইকসন্ কৌন্সলশীর্ষক' সম্পাদকীয় ছাপা হয়। ধর্মীয় উত্তেজনার আবেগে মিশ্রিত এই সম্পাদকীয়তে *সংবাদ প্রভাকর* লিখেছিল:

> হিন্দুকালেজে বেশ্যানন্দন ও যবন এবং খ্রীষ্টান বালকরা অধ্যায়ার্থ নিয়োজিত হইয়াছে। এজুইকেসন কৌন্সল কি বিশেষ কারণে, কোন্ নিয়মে ও কোন্ ক্ষমতায় এতদ্রূপ কার্য্য সকল ধার্য্য করিয়াছেন অবিলম্বেই তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া শ্রী শ্রী যুতের নিকট প্রেরণ করিবেন। ...যখন ব্রাহ্মে আসিয়া গোরা হোরা মারিয়া টেবিল পাতিয়া ডেভিল প্রভুর পূজা করিতেছে। যখন দাড়ুধারি নাড়ুর পোলা আসিয়া "ইয়া হুসেন্, ইয়া হুসেন" বলিয়া বুক চাপড়াইয়া দুপুরে মাতন করিতেছে, তখন

---

[২১] রচনা চক্রবর্তী, "ঔপনিবেশিক কালপর্বে নারী শিক্ষা: একটি আলেখ্য", *বিশেষ ক্রোড়পত্র: ইতিহাসের আলোকে বাংলার নারী শিক্ষা* (কলিকাতা: বেথুন কলেজ, ২০০০), পৃ. ৬০।

[২২] *সংবাদ প্রভাকর*, ১২ মে ১৮৪৯ উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১-১২।

[২৩] *সংবাদ প্রভাকর*,১২ মে ১৮৪৯ উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১।

[২৪] *ভারতকোষ*, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬৪৮।

[২৫] *তদেব*, পৃ. ৬৪৮।

হিন্দু কালেজের হিন্দুত্বনাশের আর কি অপেক্ষা রহিল ? ...এজুইকেসন কৌন্সলের স্কন্ধ হইতে দুষ্ট সরস্বতী বিদায় হউন।[২৬]

২.০. কৃষকদের সমস্যা ও *সংবাদ প্রভাকরের* ভূমিকা

৪.১. জমিদার প্রসঙ্গ

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জনসংখ্যা রিপোর্টে দেখা যায় বাংলার বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই বসবাস করতো গ্রামাঞ্চলে এবং তারা ছিল দরিদ্র কৃষিজীবী। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে বাংলায় ঔপনিবেশিক সরকারের ভ্রান্তনীতির কারণে কৃষির কোনো উন্নতি হয়নি। উপরন্তু কৃষকের ভোগান্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তদুপরি দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি, নীলকরদের অত্যাচার ইত্যাদির কারণেও অনেকে দীর্ঘদিনের পেশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ কৃষির প্রতি কৃষকের আকর্ষণ কমতে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয় যে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় বাংলার কৃষকদের প্রতিও সহানুভূতির দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। জমিদার-কৃষক সম্পর্ক অথবা নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কোনটাই *সংবাদ প্রভাকরের* দৃষ্টি থেকে বাদ যায়নি। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ বাংলার কৃষকদের অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ চাষীদের নিকট থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করে। এমন কি জমিদারগণ প্রজাদের উপর অত্যাচার করে খাজনা আদায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অনেকে আবার কলকাতায় বাস করেই কর্মচারী দ্বারা কাজ চালিয়ে নিতেন।[২৭] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসের ২০ তারিখের *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে কৃষকদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছিল। এতে বলা হয়:

> বঙ্গদেশীয় কৃষক সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও মোটা অন্ন আহার করে, তাহার কঠোরোপার্জ্জিত অল্প আয়ের গ্রাহক বিস্তর, একারণ তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা দূরে থাকুক সে অধিক সুদে কর্জ্জ লইয়া মহাজনের নিকটে নিয়ত বদ্ধ রহিয়াছে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বঙ্গদেশের ভূমিতে প্রচুর শস্য ফলাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু কি পরিতাপ! কৃষকের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ তুল্য কঠিনান্তকরণও করুণায় আর্দ্র হইয়া যায়।[২৮]

জমিদাররা সরকারের কাছে থেকে জমির ইজারা নেয়, কিন্তু দরিদ্র কৃষকের স্বার্থে কিছুই করে না। কৃষকদের প্রতি জমিদারদের এই মনোভাবের সমালোচনা করে *সংবাদ প্রভাকর* বলেছিল:

> জমিদার, পত্তনিয়াদার, তালুকদার, দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগির সংখ্যা রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা সহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্য্য কিছুই করে না, অথচ কৃষকের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, গবর্ণমেন্ট যদ্যপি কৃষকের দুর্দ্দশা সমস্ত সন্দর্শন পূর্ব্বক যদ্যপি রাজনিয়মাদির সংশোধন করেন, তবে কৃষকের দুঃখ অনেক মোচন হইতে পারে।[২৯]

৪.১.নীলকর প্রসঙ্গ

উনিশ শতকে বাংলায় অনেকগুলি বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও নীল বিদ্রোহ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলার রেশম, আফিম, বস্ত্র, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের

---

[২৬] *সংবাদ প্রভাকর*, ২১ জুলাই ১৮৫৩।

[২৭] Bankim Chandra Ray, *The Bengal Zamindars* (Calcutta: Sarveswar Bhattacharyya, 1904), p. 23.

[২৮] *সংবাদ প্রভাকর*, ২০ অগাস্ট ১৮৫৭, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

[২৯] *সংবাদ প্রভাকর*, ২০ অগাস্ট ১৮৫৭, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।

মতই নীলের চাষ কৃষকদের শোষণের একটি প্রধান উপায় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, বাংলায় নীল চাষের সূত্রপাতের সঙ্গেই নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, নদীয়া, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি সব জেলাতেই নীলকরের অত্যাচার প্রবল হয়েছিল। *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকাতে নীলকরের অত্যাচার সম্পর্কে মূল্যবান মতামত পেশ করা হয়েছিল। নীলকরদের অত্যাচার কতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার সম্পাদককে লেখা চিঠি থেকে ধারণা পাওয়া যায়। *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকাতে প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২ জুন তারিখে 'কস্যচিৎ স্বদেশ হিতৈষি জনস্য' ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন তারিখে 'কস্যচিৎ কাঞ্চন পল্লী নিবাসনঃ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নীলচাষীদের অবস্থা সম্পর্কে *সংবাদ প্রভাকর* এরূপ মন্তব্য করেছিলেন যে, ' তাহারদিগের অবস্থা আমেরিকার ক্রীতদাসিদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হইবেক।'[৩০] উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় কোম্পানির আইনকে উপেক্ষা করে নীলকরেরা নীলচাষীদের উপর লোভমত্ত ও বিবেকবর্জিত অত্যাচার ও অবিচার চালাতে থাকে। 'নীলকরদের দৌরাত্ম্যে রাইয়ৎ লোকদের সর্ব্বনাশ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *সংবাদ প্রভাকর* লিখেছিল:

> নীলকর দিগের দৌরাত্ম্যে জেলার প্রজারা আর কতকাল যন্ত্রণা ভোগ করিবেক ? ...পল্লীগ্রামে কুটিয়াল দিগের অত্যাচার দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বোধ হইবেক, যে, এদেশে অদ্যাপি কোন রাজশক্তির অধীন হয় নাই, অর্থাৎ প্রকৃত অরাজক হইয়াছে। নীলকর সাহেবেরা যাহা মনে করেন তাহাই করিতেছেন, ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করেন, যে তাঁহারা উত্তমরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, কতকগুলি দুর্ব্বল ইতর চোর ডাকাত ধরিলেই কি রাজ্য শাসিত হয়? আমরা এই বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ প্রায় সমস্ত স্থানেই নীলকুঠীর সমান দৌরাত্ম্যই দেখিতে পাই।[৩১]

নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় 'কস্যচিৎ কাঞ্চনপল্লী নিবাসনঃ' নামে জনৈক প্রজা একটি পত্র লেখেন। অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় লেখা এই পত্র থেকে নীলকরদের অত্যাচারের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী:

> এ স্থলে ইংরাজ নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় আর কি লিখিব, যাঁহাদিগের অত্যাচার উত্তর পূর্বাঞ্চলের কত কত ভদ্র সন্তান আপনারদিগের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং যাঁহারদিগের উপদ্রবে কত কত দীন দরিদ্র ব্যক্তি স্বাভাবিক হীনবল প্রযুক্ত অগত্যা তাঁহারদিগের অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মনের দুঃখে কালহরণ করিতেছে, তাঁহারদিগের গুণের কথা আর অধিক কি লিখিব! যাহা হউক আমারদিগের সুবিচারক রাজ কর্ম্মচারিগণ এ দেশের কাঙ্গালি বাঙ্গালি প্রজাপুঞ্জের উপর দয়া প্রকাশ করিয়া ইহারদিগের মনে হর্ষ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ না হয়েন, কারণ "দুব্বলস্য বলং রাজা" তাহারা ব্যতীত ইহারদিগের আর কেহই নাই।[৩২]

নীলচাষীদের উপর এ ধরনের অমানুষিক অত্যাচার ও বেআইনি কার্যকলাপ যে নীলকরেরা অবাধে চালিয়ে যেতে পেরেছিল, তার কারণ, কোম্পানির আইন ও আদালতগুলি ছিল নীলকরদের পক্ষে। নিরপেক্ষতা শব্দটি ছিল সেখানে নিতান্তই অবাস্তব ও অবাঞ্ছিত। নীলকুঠি স্থাপনের পর থেকেই নীলকরেরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে রায়তের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল। নীলকরেরা যখন বাংলায় নীলচাষ আরম্ভ করে তখন থেকেই আইন অমান্য করলে মফস্বলের আদালতে তাদের বিচার হত না। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের বিধি অনুযায়ী মফস্বলের আদালতগুলো শুধু স্থানীয় অপরাধীদের বিচার করত। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের বিধি অনুযায়ী নীলকরদের মফস্বল আদালতের আওতায় আনা হয়। এই

---

[৩০] *সংবাদ প্রভাকর*, ৩০ মার্চ ১৮৬৪, উদ্ধৃতঃ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

[৩১] *সংবাদ প্রভাকর*, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৯, উদ্ধৃতঃ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-০৩।

[৩২] *সংবাদ প্রভাকর*, ৪ জুন১৮৫৯, উদ্ধৃতঃ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

বিধির ২৩ নম্বর ধারা অনুসারে নীলকরদের অনূর্ধ্ব ৫০ বিঘা জমিতে নীলচাষেরও অনুমতি প্রদান করে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের অষ্টম আইনে জমিদারদের পত্তনি তালুক বন্দোবস্ত দেওয়ার অধিকার থাকায় নীলকররা বড় বড় পত্তনি নেওয়ার সুযোগ পায় এবং এরপর ক্রমাগতভাবে তাদের সপক্ষে নিয়ম কানুন করে নীলকরদের জন্য অনেক সুযোগ করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ষষ্ঠ আইন দ্বারা তারা জমির উপর বিশেষ স্বত্ব এবং অধিকার ও আদালতেও তারা কতগুলো সুবিধা লাভ করে।[৩৩] ফলে নীলচাষীরা বরাবরই উপেক্ষিত ছিল। কারণ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ সাহেবেরা নীলকুঠিতে অবসর যাপন করতে বেশ পছন্দ করতেন।[৩৪] নীলচাষীদের অদৃষ্টের পরিহাস, এই কুঠিগুলি ছিল অভিযুক্ত নীলকরদেরই। কোম্পানির আইন আদালতের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক উদাহরণটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা অগাস্ট থেকে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারির মধ্যবর্তী সময়ে। এ সময়ের মধ্যে বাংলার ছোট লাট স্যার ফেডারিক হ্যালিডে ২৯ জন নীলকর ইংরেজকে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে নীল কমিশনের রিপোর্ট থেকে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। সেটি হলো, একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একজন নীলকরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারের ভার যে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি নিজেই ছিলেন সেই অভিযুক্ত নীলকর।[৩৫] এমনি অবিশ্বাস্য ছিল কোম্পানির আদালত কাহিনী। বাস্তবিক পক্ষে নীলকরদের অত্যাচার থেকে দরিদ্র কৃষক প্রজাদের প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কোনো কোনো সময়ে তারা নীলকরের অবিচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করেছে, কিন্তু প্রতিপত্তিশালী নীলকরের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব হত না। নীলকরগণ ইংরেজ ছিল। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটগণ নীলকরকে খাতির সমাদর করে। এ সম্পর্কে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছিল:

> এই নীলকুঠী সংক্রান্ত নিষ্ঠুরতা ও হত্যাঘটিত মোকদ্দমা কতবার সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইল, সদর নিজামতের ঘর এবিষয়ে নথিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে এ পর্যন্ত কোন উপকার হইল না। ...কয়েক জিলায় কয়েকজন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন, তথাচ অত্যাচারের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইল না, ইহার তাৎপর্য্য এক সাদা বর্ণের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট হইলে কি হইবে, ঝাঁকের পায়রা ঝাঁকে মিশিয়া যান।[৩৬]

এ থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকাতে জনৈক পাঠক চিঠিপত্র কলামে লিখেছিলেন "এইক্ষণে অত্যন্ত দুঃখিত ও হতাশ হইয়া লেখনীধারণকরত আমারদিগের সু বিচারক রাজপুরুষদিগের সমক্ষে আবেদন করিতেছি, যে, তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে অত্র প্রদেশের প্রতি কৃপাবলোকনদ্বারা আমারদিগের সকল সন্তাপ হরণ করুন, এবং শান্তিরস প্রদানদ্বারা আমারদিগের মনে শান্তিও সংস্থাপন করুন, যদ্বারা আমরা অত্যাচারি নীলকরদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখে জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহ করিব।"[৩৭] এভাবেই *সংবাদ প্রভাকর* উনিশ শতকে সংবাদপত্রের উন্মেষ ও বিকাশ পর্বে তথ্যানুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

---

[৩৩] মুসা আনসারী, *ইতিহাস: সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ১৯৪-৯৫।

[৩৪] B.B. Kling, *The Blue Mutiny: The Indigo Disturbances in Bengal, 1859-1862* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1966), p. 50.

[৩৫] *Report of the Indigo Commission, Appointed under Act XI of 1860*, Minutes of Evidence, Calcutta, 1860, p.141.

[৩৬] *সংবাদ প্রভাকর*, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৯, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।

[৩৭] *সংবাদ প্রভাকর*, ৪ জুন ১৮৫৯, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

৩.০. উপসংহার

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সাংবাদিকতার মাধ্যমে শুধু বিদেশি সরকারের বা শাসকশোষকদের বিরুদ্ধে নয়, দেশীয় শাসকশোষক জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে, ধর্ম ও রাজনীতি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, পুরোহিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে একই সঙ্গে সত্য ও সাহসী উক্তি করেছেন নিজের সম্ভাব্য ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা আদৌ না ভেবে। বলা বাহুল্য, *সংবাদ প্রভাকরে* শুধু সাহিত্যধর্মী রচনাই কেবল প্রকাশিত হত না; কলকাতার নগরকেন্দ্রিক সমাজ ও জীবন থেকে শুরু করে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের অধিবাসীদের অভাব অভিযোগ, দাবি প্রত্যাশা সবই তুলে ধরা হতো। এ ধরনের প্রতিবেদনগুলি খুবই মর্মস্পর্শী। প্রকৃত সাংবাদিকতা যে কতটা সততা ও সাহসিকতার উপর নির্ভর করে তা *সংবাদপ্রভাকর* পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর দৃষ্টান্তে দেখিয়েছেন বলে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল: পত্রিকার মাধ্যমে দেশ সেবা, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, মানুষকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলা । রাজনীতির সাথে সাংবাদিকতার এই ক্রমপ্রসরমাণ ফলে দেশাত্মবোধের চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার এই প্রচেষ্টা বাংলায় সাড়া জাগিয়েছিল।

আইবিএস প্রকাশনা

পত্রিকা ও গ্রন্থ (বাংলায়)

আইবিএস জার্নাল (বাংলা), ১৪০০:১–১৪০৭:৮

ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য (সেমিনার ভল্যুম ৩), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা (সেমিনার ভল্যুম ৬), আমানুল্লাহ আহমদ (১৯৮৫)

বাঙালীর আত্মপরিচয় (সেমিনার ভল্যুম ৭), সম্পাদক : এস.এ. আকন্দ (১৯৯১)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা (সেমিনার ভল্যুম ৯), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৯৭)

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড, আবদুল করিম (১৯৯২)

Journals and Books (in English)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vols. I–XXIV (1976-2001)

Reflections on Bengal Renaissance (Seminar Volume 1), edited by David Kopf & S. Joarder (1977)

Studies in Modern Bengal (Seminar Volume 2), edited by S. A. Akanda (1984)

The New Province of Eastern Bengal And Assam *(1905-1911)* by M.K.U.Mollah (1981)

Provincial Autonomy in Bengal *(1937-1943)* by Enayetur Rahim (1981)

The District of Rajshahi: Its Past and Present (Seminar Volume 4) edited by S.A. Akanda (1983)

Tribal Cultures in Bangladesh (Seminar Volume 5), edited by M.S. Qureshi (1984)

Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh (Seminar Volume 8) edited by S.A. Akanda & M. Aminul Islam (1991)

History of Bengal: Mughal Period, Vol. 1 & 2 by Abdul Karim (1992, 1995)

***The* Institute of Bangladesh Studies: An Introduction** (2000)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies: An Up-to-date Index by Md. Shahjahan Rarhi (1993)

Socio-Economic Development of a Bengal District: A Study of Jessore (1883-1925) by Muhammad Muhibullah Siddiquee (1997)

Research Resources of IBS: Abstracts of PhD Theses Compiled by M. Shahjahan Rarhi (2002)

Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm edited by Priti Kumar Mitra & Jakir Hossain (2004)

১০ম সংখ্যার সূচিপত্র

মোঃ মনিরুল হক ॥	মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত মুসলিম পুরাকীর্তি : একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা	১
কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ॥	পুঠিয়ার দোচালা মন্দির	১৭
মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম ॥	বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলিম প্রতিক্রিয়া ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	২৫
মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার ॥	স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি : জাসদের ভূমিকা	৪১
স্বরোচিষ সরকার ॥	মাইকেল মধুসূদন দত্তের আভিধানিকতা	৫১
আবদুল মতিন তালুকদার ॥	বরেন্দ্র অঞ্চলের পোড়ামাটি ফলকে জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি	৬১
ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু ॥	তৃতীয় বিশ্বের ভূ-রাজনীতি এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ	৬৭
মোঃ খাদেমুল ইসলাম ॥	জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ	৭৯
মোঃ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী ॥	বরেন্দ্র অঞ্চলের বিন্ধ জাতিগোষ্ঠী: সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন	৯১
রেজা হাসান মাহমুদ ও রায়হানা আখতার জাহান ॥	ধানকল চাতালে কর্মরত শ্রমজীবী মহিলাদের জীবন ও জীবিকা	১০১
শর্ম্মিষ্ঠা রায় ॥	গ্রামীণ বাংলাদেশে বয়োবৃদ্ধদের সেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ধরন	১১৩
এস. এম. এক্রাম উল্যাহ ॥	বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি : বর্তমান ধারা বিশ্লেষণ	১২১
সুব্রত কুমার দে ॥	হস্তচালিত তাঁতশিল্পে উৎপাদন ব্যয়ের নির্ধারকসমূহের গুরুত্ব নির্ণয়	১৩৫
খবির উদ্দীন আহম্মদ ॥	বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	১৪৭